আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

আধুনিক নারী
ও
ইসলামী শরীয়ত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
সংকলন ও সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

শ: প্র: ৩৬

আধুনিক নারী ও ইসলামী শরীয়ত

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
সংকলন ও সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম
প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন ৮৩১১২৯২
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০১
শব্দ বিন্যাস
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪২২৪৯
মুদ্রণে
আল্ ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : নির্ধারিত ৭০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Adhunik Nari O Islami Shariat by Sayyed Abul A'la Maudoodi, Compiled & Edited by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashani, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Elephant Raod, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Phone : 8311292, 1st Edition: December 2001, Fixed Price : Tk. 70.00 Only.

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

❖❖❖

১

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

প্রশ্ন ঃ লোকেরা মনে করে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মহিলাদেরকে সমান অধিকার ও সমমর্যাদা প্রদান করা হবেনা। তাদেরকে শুধু পুরুষদের অধীন করে রাখা হবে। এই প্রগতির যুগে নারীদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখার ধারণা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? বোরকা পরিধান করলে তো নারীরা দেশের উন্নয়নে সহযোগী হবার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। বড় বড় ঘরের নারীরা মনে করে, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে তাদেরকে জোর-জবরদস্তি করে ধরে ধরে বোরকা পরিয়ে দেয়া হবে। পুরুষদের দাঁড়ি রাখতে বাধ্য করা হবে। এসব ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? বিশেষ করে উচুঁ শ্রেণীর নারীদের মধ্যে এখন প্রোপাগান্ডা শুরু হয়েছে যে, এরা চারচারটি বিয়ে করবে।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের জন্যে দীর্ঘ জবাব প্রয়োজন। তবে, আমি সংক্ষিপ্ত ক'টি কথাই বলবো। এই সমাজের অনেক কিছুই আমি দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছি। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছি। সেগুলোর পূর্ণ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে অনেক কিছু লিখেছি। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো মহিলাদের সমস্যা। এ প্রসংগে আমার 'পর্দা ও ইসলাম' এবং 'স্বামী-স্ত্রীর অধিকার' গ্রন্থ দু'টি অনেক আগেই প্রকাশ হয়েছে। পাঠাগার ও বাজারে গ্রন্থ দু'টি সহজলভ্য। শিক্ষিতদের প্রতি আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে গ্রন্থ দু'টি পড়ে দেখুন। শিক্ষিত লোকদের ব্যাপারে আমি এ আশা করিনা যে, তারা পড়ালেখা না করে এবং না জেনে-শুনেই কোনো বিষয়ে মত প্রতিষ্ঠা করতে পছন্দ করবেন। অশিক্ষিত লোকেরা এমনটি করলে আফসোসের কিছু ছিলনা। কিন্তু শিক্ষিত লোকদের এমনটি করা খুবই দুঃখজনক।

মহিলাদের সম্মান ও অধিকার

এ প্রশ্নের জবাব হলো, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে নারীরা ঠিক সেই অধিকার এবং মর্যাদাই লাভ করবে, ইসলাম তাদের জন্যে যে অধিকার এবং মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি চিন্তা করে থাকে

যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল নারীদের অধিকার ও মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবিচার করেছেন, আর সুবিচার করেছে পাশ্চাত্যবাসী, তবে প্রথমে তার ঈমানের ব্যাপারেই তাকে পূর্ণ চিন্তা করে দেখতে হবে।

আপনাদের জানা দরকার, পাশ্চাত্যবাসী নারীদের যে 'সমমর্যাদা' দিয়েছে তা তাদেরকে নারীর অবস্থানে রেখে দেয়নি, দিয়েছে অর্ধ পুরুষ বানিয়ে। তারা চায় পুরুষরা যতো কাজ করে, নারীদেরকেও সেসব কাজ করতে হবে। কিন্তু একথা সবারই জানা, নারীরা যেসব কাজ সম্পাদন করে, পুরুষরা সেগুলো করতে সক্ষম নয়।

সুতরাং এই 'সম' দাবির অর্থ হলো, প্রকৃতি নারীদের উপর যেসব বাড়তি দায়িত্ব অর্পণ করেছে, একদিকে তাদেরকে সেগুলোও সম্পাদন করতে হবে- যা পুরুষরা সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। অপরদিকে, পুরুষদের সাথে সমভাবে ঐসব দায়িত্বও তাদের পালন করতে হবে, প্রকৃতি যেগুলোর দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেনো এমন যে, তারা নারীদের দ্বারা দেড়গুণ বেশি কাজ করিয়ে নিতে চায়, আর নিজেরা করতে চায় অর্ধেক। এরি নাম দিয়েছে তারা নারী-পুরুষের সমতার বিধান।

নারীদের প্রকৃতিগত মর্যাদা

সমতার দাবি করে পাশ্চাত্যে নারীরা প্রতারিত হয়েছে। এর ফলে তারা তাদের অনেক অধিকার ও মর্যাদা খুইয়ে বসেছে। Ladies first এর সেই কাহিনী এখন সেখানে অচল। আমি স্বচোখে ইংল্যান্ডে দেখেছি, যানবাহনে নারীরা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সীটে বসে থাকা পুরুষরা তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র পরোয়া করেনা। অথচ আমাদের দেশে এখনো নারীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে পুরুষরা তাদের জন্যে সীট ছেড়ে দেয়। বলে, আপনি বসুন। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুরুষরা বলে, তোমরা আমরা সমান। সুতরাং যে আগে সুযোগ পায় সে বসবে, নতুবা দাঁড়িয়ে থাকবে। এভাবে নারীরা সর্বত্র বঞ্চিত ও প্রতারিত হচ্ছে। কেউ তাদের জিজ্ঞেসও করেনা। তবে বিশেষ কোনো কারণ থাকলে সেটা আলাদা কথা।

সমতার দাবি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের নারীরা পুরুষদের সাথে একই ধরনের কাজ করে সমান বেতন পায়না। এজন্য নারীরা হৈ-চৈও করে যাচ্ছে। তাছাড়া যেসব কর্মক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়কে একই সমতলে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিগত ভাবেই নারীদেরকে পুরুষদের সমকক্ষ বানাননি, তাই লাখো চেষ্টা করেও সেসব ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারেনা। পাশ্চাত্য হোক কিংবা প্রাচ্য, কোথাও সাধারণ নারীদেরকে তেমন একটা উচ্চ প্রশাসনিক নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়না, বরং পুরুষদেরকেই করা হয়।

নরীদেরকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করা উচিত কিনা? - এ ব্যাপারে কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে জনমত যাচাই করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না করার পক্ষে রায় দেয়।

আসল কথা হলো, প্রকৃতিগতভাবে নারীদের যে মর্যাদা হওয়া উচিত আপনি যদি তাদেরকে সেখান থেকে বিচ্যুত করে দেন আর যে ময়দান তাদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় সেখানে নিয়ে তাদের বসিয়ে দেন, তবে তো তারা পুরুষদের পিছে পড়ে যেতে বাধ্য। একই ময়দানের প্রতিযোগিতায় পুরুষরা অবশ্যি তাদের ছাড়িয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কিছুতেই সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ২য় খন্ড)

সন্তান পালনে নারীর অধিকার

প্রশ্ন ঃ কাওসার পত্রিকার ৩০ জুলাই ১৯৫২ সংখ্যার ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, "শরীয়তের বিধান অনুসারে তালাক সংঘটিত হলে সকল সন্তানকে নিজের কাছে রেখে দেয়া পিতার শুধু অধিকার নয়, বরং তার জন্য অপরিহার্য। মায়ের কোনো অধিকার নেই সন্তান কাছে রাখার।" অথচ হাদীসে এর বিপরীত কথা বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

১. জনৈক মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো ঃ "এ আমার ছেলে। একে আমি পেটে ধারণ করেছি, দুধ খাইয়েছি এবং কোলে পিঠে করে লালন পালন করেছি। এখন ওর বাপ আমাকে তালাক দিয়েছে এবং একে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যতোদিন তুমি অন্য কোথাও বিয়ে না করবে, ততোদিন শিশুর উপর তোমার অধিকার বেশি।" (মিশকাত, শিশুর লালন পালন ও বয়োপ্রাপ্তি অধ্যায়)

২. একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ছেলেকে বললেন, তুমি ইচ্ছে করলে পিতার কাছে থাকতে পারো আবার ইচ্ছে করলে মাতার কাছে থাকতে পারো।" (ঐ)

৩. এক মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হয়ে বললো ঃ আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ এই ছেলে আমাকে পানি এনে দেয় এবং আমার অনেক কাজে লাগে।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম ছেলেটিকে বললেন ঃ এই তোমার পিতা আর এই তোমার মাতা। যার হাত ধরতে চাও, ধর।" ছেলেটি মায়ের হাত ধরলো এবং সে তাকে নিয়ে গেলো। (ঐ)

৪. হযরত আবু হুরাইরার রা. কাছে জনৈক ইরানী মহিলা এলো। তার

সাথে ছিলো তার ছেলে। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী হযরত আবু হুরাইরার নিকট নিজেদের ঘটনা বর্ণনা করলো! স্ত্রী বললো, "আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়" হযরত আবু হুরাইরা বললেন ঃ "সন্তানের ব্যাপারে লটারী করো।" স্বামী এসে বললো ঃ "আমার ছেলের ওপর আমার অগ্রাধিকার নিয়ে কে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে?" তিনি বললেন ঃ "আমি কথাটি বলেছি এই জন্য, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক মহিলা এসেছিল। সে বললো, আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়! অথচ ছেলেটি আমার অনেক কাজ করে দেয় এবং পানি এনে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বললেন ঃ তোমরা লটারী দ্বারা নিস্পত্তি করে নাও। পিতা বললো ঃ আমার ছেলেকে নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে বললেন ঃ তোমার পিতা মাতা উভয়ে এখানে রয়েছে। যার হাত ধরতে চাও ধরো। ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরলো।" (ঐ)

৫. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর ও তার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।

অনুগ্রহপূর্বক উল্লিখিত হাদীস কয়টির আলোকে কাওসারের উক্তিটি শুধরে নেবেন।

জবাব ঃ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আলোচ্য প্রশ্নোত্তরটি যেভাবে কাওসারে ছাপা হয়েছে, তাতে আপনার মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। প্রশ্নকর্তা নিজের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেও জানিয়েছিলেন, আবার মুখেও বলেছিলেন। তিনি বিশদ বিবরণ ও যুক্তিপ্রমাণের উল্লেখ ছাড়াই একটা সংক্ষিপ্ত ও অকাট্য জবাব দেয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। এই প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিলোনা। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে তিনি প্রশ্নের একটা খাপছাড়া সারসংক্ষেপ এবং আমার সংক্ষিপ্ত জবাব ছাপানোর ব্যবস্থা করে ফেলেন। যেভাবেই হোক, ছাপা যখন হয়েই গেছে এবং আপনি তার ওপর আপত্তি তুলেছেন, তখন আমি পুনরায় নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি।

আপনি যে পাঁচটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন তার পঞ্চম হাদীসটিতো স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ও শিশু সন্তান পালনের সাথে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়। ঐ হাদীসে মা ও সন্তান বলতে মূলত দাসী ও তার সন্তানকে বুঝানো হয়েছে। সেখানে মা ও সন্তানের বিচ্ছেদ দ্বারা সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে পিতার কাছে সমর্পণ করা বুঝানো হয়নি, বরং দাসী ও তার সন্তানকে

আলাদা আলাদা দুই ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা বা বিক্রি করা বুঝানো হয়েছে। এ কাজটা যে নিষিদ্ধ, তা আরো বহু হাদীস থেকেও প্রমাণিত। আর প্রথম চারটি হাদীস থেকে শরীয়তের নিম্নোক্ত বিধিসমূহ রচিত হয় ঃ

১. শিশু সন্তানধারী দম্পতির বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটলে দেখতে হবে সন্তান একেবারে অবোধ ও মাতৃস্নেহের মুখাপেক্ষী কিনা? যদি তাই হয়, তবে সন্তানকে লালন পালনে মায়ের অধিকার অগ্রগণ্য, যদি সে পুনরায় স্বামী গ্রহণে বিরত থাকে।

২. শিশুর যদি মা বাবার একজনকে বেছে নেয়ার মতো বয়স হয়ে থাকে, তাহলে লটারী করা হবে। আর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে অথবা কোনো একজন লটারী মানতে অসম্মত হয়, তাহলে শিশুকে স্বাধীনতা দেয়া হবে পিতামাতার মধ্যে যার সাথে সে থাকতে চায় তাকে বেছে নিতে।

উপরোক্ত বিধিসমূহ স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এতে দ্বিমত পোষণ কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আলোচ্য হাদীসগুচ্ছ এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীসের পটভূমি ও প্রেক্ষিত বিবেচনা করে এবং পিতামাতা ও সন্তানদের পারস্পারিক শরীয়তসম্মত অধিকার ও দায় দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিতে রেখে প্রাচীন ইমামগণ মায়ের সন্তান পালনের আগ্রাধিকারের ওপর আরো কতিপয় শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, চার মযহাবের আলেমগণ নিম্নলিখিত দোষগুলোর উল্লেখ করে বলেছেন যে, এগুলো যদি মায়ের মধ্যে বর্তমান থাকে এবং পিতা এগুলো থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে মায়ের সন্তান পালনের অগ্রাধিকার রহিত হয়ে যাবে ঃ

দোষগুলো হলো ঃ

ক. ইসলাম পরিত্যাগ করা।

খ. পাগল হয়ে যাওয়া।

গ. নামায রোযা ত্যাগ করা বা অনুরূপ কোনো প্রকাশ্য গুনাহে লিপ্ত হওয়া।

ঘ. চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে এমন পরিবেশে সন্তানকে নিয়ে বাস করা বা এতো দূরবর্তী স্থানে বসবাস করা, যেখানে সন্তানের লেখাপড়া তদারক করা পিতার পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে।

ঙ. পিতার অক্ষমতা সত্ত্বেও তার কাছে সন্তানের ভরণপোষণের অর্থ দাবি করা,

চ. সন্তানের লালন পালনে চরম উদাসীনতা।

অনুরূপভাবে ফেকাহবিদগণের মতে শিশু সন্তানের মায়ের কাছে লালিত পালিত হওয়ার সর্বোচ্চ মেয়াদ ৭ থেকে ৯ বছর। এরপর পিতার অধিকার

থাকবে সন্তানকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে আশা।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, উল্লেখিত শর্তগুলোর কোনো একটিও উপরোক্ত হাদীসসমূহ বা শরীয়তের সাধারণ নীতিমালার পরিপন্থী নয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, সন্তানদের ভরণপোষণ, বৈষয়িক ও নৈতিক লালন, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং তাদের বিয়ে শাদী ইত্যাদির আসল দায়িত্ব পিতার ওপরই বর্তে, মাতার উপর নয়। পরিবারের প্রধান হিসেবে "নিজেদেরকে ও পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার" যে নির্দেশ কুরআনে রয়েছে, সে নির্দেশ প্রাথমিকভাবে পুরুষকেই দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, মাতাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বোতভাবে ও শর্তহীনভাবে সন্তান লালন পালনের অধিকার দেয়া হবে, পিতার ইচ্ছের তোয়াক্কা না করে সে সন্তানকে যেভাবে ইচ্ছে গড়ে তুলবে, অতঃপর তার পরিণাম ভোগ করার জন্য সন্তানদেরকে পিতার হাতে সোপর্দ করা হবে?

এ জন্য সন্তান লালন পালনের মেয়াদ যৌবন প্রাপ্তিরকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার পক্ষে মত দেয়া সঠিক বলে মনে হয়না। কারণ সন্তানরা যৌবনে পদার্পণ করা ও স্বনির্ভর হয়ে যাওয়ার পর পিতার অভিভাবকত্বে আসার কোনো অর্থ থাকেনা। তখন আপন লাভক্ষতি ও ভালোমন্দের দায়দায়িত্ব অনেকটা তাদের নিজেদের ঘাড়েই এসে পড়ে। তাই শরীয়তের অন্তর্নিহিত সুগভীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দাবি হলো, একদিকে লালন পালনের মেয়াদের একটা যুক্তিসঙ্গত সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে, অপরদিকে লালন পালনে মায়ের অধিকারের উপরও যুক্তিসঙ্গত শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। মায়ের ইসলাম থেকে খারিজ না হওয়া এবং পুনরায় বিয়ে না করার শর্ত হাদীসেই উল্লিখিত হয়েছে। এই বিধিনিষেধ ও শর্তারোপের আলোকে আরো নতুন শর্ত ও বিধিনিষেধ উদ্ভাবন করা যেতে পারে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উল্লিখিত দুটো শর্তের অতিরিক্ত আর কোনো শর্তের উল্লেখ না করে থাকেন, তবে তার কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁর কাছে যেসব বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এসেছিল, তাতে মায়ের দিক থেকে এসব আশংকা দেখা দেয়ার কোনো অবকাশ ছিলোনা। নচেত পিতা চুপ থাকতোনা, বরং মায়ের কাছে লালতি পালিত হলে সন্তানের সম্ভাব্য ক্ষতির কথা ব্যক্ত করতো। সেক্ষেত্রে নিজের অগ্রাধিকার প্রমাণ করার জন্য পিতা শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত থাকতোনা যে, পুত্রের ব্যাপারে পিতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এমন কে আছে? বরং সেই সাথে এটাও বলতো যে, সন্তানের মা ওর লালন পালন সুস্পষ্টভাবে করতে পারবেনা। হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে মনে হয়, এসব ঘটনায় পিতা মাতার কোনো একজনের যোগ্যতা ও অপর জনের

অযোগ্যতা নিরূপণের প্রশ্নই ওঠেনি। কেননা যোগ্যতা ও আন্তরিকতার দিক দিয়ে পিতা মাতা উভয়েই সমান। আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল মাতৃস্নেহ ও তার মুখাপেক্ষিতার সাথে পিতৃস্নেহের। এক্ষেত্রে মাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, আর তা নিশ্চতভাবে এখনও দেয়া হবে। কিন্তু তা দ্বারা একথা প্রমাণ করা যায়না যে, মা যদি সন্তান পালনের গুরুদায়িত্ব পালনে একেবারেই অযোগ্য ও অক্ষম হয়, তবুও তার সন্তান পালনের অগ্রাধিকার বহাল থাকবে এবং সন্তানকে তার কাছেই রাখা হবে।

আমার পূর্ববর্তী জবাবে কোনো ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এখানেও আমি বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি। আমার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি সচেতন এবং তা যে নির্ভুল, সে দাবিও আমি করিনা। প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞানের আধার একমাত্র আল্লাহ। (জাস্টিস মালিক গোলাম আলী, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড)

●

২

নারী স্বাধীনতা ও ইসলাম

প্রশ্ন ঃ ইসলামে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ কি? ইসলামী সমাজে নারীকে কি মর্যাদা দেয়া হয়েছে? জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে নারীকে কি মর্যাদা প্রদান করবে এবং তাদের চাকরির ব্যাপারে কি নীতি অবলম্বন করবে?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি ছোট হলেও বিস্তারিত জবাবের দাবি রাখে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে প্রশ্নটির বিভিন্ন দিকের জবাব দিচ্ছি ঃ

ইসলামে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ

প্রথমত নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আজ পর্যন্ত কোনো সমাজেই কোনো প্রকার বন্ধনহীন স্বাধীনতা দেখা যায়নি। যে মানুষ কোনো সমাজে বাস করে, সে বন্ধনহীন ও লাগামহীন স্বাধীন থাকতে পারেনা। তাকে অবশ্যি সমাজের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। সমাজের অর্থইতো হলো - এর সদস্যদের কর্মকান্ডের স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং তাদের কর্মকান্ড কিছু নিয়ম-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজই মানুষের কর্মকান্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। আফ্রিকার জংলী সমাজ আর পাশ্চাত্যের বস্তুপূজারী সমাজ নিজ নিজ লোকদের উপর যে ভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তার কথা আলাদা।

ইসলামী সমাজ মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তার জন্মগত স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পুরুষ ও নারীর উপর কেবল সেসব নিয়ন্ত্রণই আরোপ করে, যেগুলো তাদের সত্তার জন্য কল্যাণকর এবং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবতার জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি। ইসলামী সমাজ পুরুষ ও নারী উভয়কেই সর্বাধিক মানবাধিকার প্রদান করে এবং কোনো প্রকার অমানবোচিত নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর আরোপ করেনা। এই আলোচনা থেকে ইসলামে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে আশা করি।

নারীর মর্যাদা

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে। ইসলামী সমাজ নারীকে ঠিক সেই মর্যাদাই প্রদান করে, যা তার প্রকৃতি

(ফিতরাত) তাকে প্রদান করেছে। পৃথিবীতে পূর্বেও এমন সমাজের অস্তিত্ব ছিলো এবং বর্তমানেও আছে, যেখানে নারীর মর্যাদা দাসী কিংবা চাকরাণীর চেয়ে বেশি নয়। কোনো কোনো সমাজে তাকে ঘটিবাটির চাইতে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এমন সমাজও আছে, যেখানে নারীকে সম্পূর্ণ পশু মনে করা হয়। সেখানে তাদের সাথে সেই আচরণই করা হয়, যা করা হয়ে থাকে পশুর সাথে। তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজে ততোক্ষণ পর্যন্ত নারীর গুরুত্ব স্বীকারই করা হয়না, যতোক্ষণ না সে নিজেকে পুরুষ বানিয়ে দেখায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তার উপর যে প্রকৃতিগত দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তা পালন করা যেহেতু পুরুষের জন্য অসম্ভব, সে জন্য তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজের পুরুষরা চাচ্ছে, নারী নিজের প্রকৃতিগত দায়িত্বও পালন করুক, আবার পুরুষেরও অর্ধেক দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিক। এটা নারীর উপর একটা বিরাট নির্যাতন ও যুল্‌ম। এটা নারীর জন্য প্রগতি নয়, প্রবঞ্চনা। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারীকে ঐ মর্যাদাই প্রদান করে, যা তার প্রকৃতিই তার জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম পুরুষের দায়িত্ব নারীর উপর চাপায়না। আবার নারীর দায়িত্বও পুরুষের উপর চাপায়না।

আপনি এ সম্পর্কে জামায়াতের নীতি জানতে চেয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী তো প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে আল্লাহর যমীনে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। আল্লাহ্ তায়ালা যদি জামায়াতে ইসলামীকে দেশ পরিচালনার পরিক্ষায় ফেলেন, তবে জামায়াত সমাজে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদাই প্রদান করবে, যা ইসলাম তাকে প্রদান করেছে।

নারী ও চাকরি

আপনি নারীদের চাকরির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন। আপনার প্রশ্নের এই অংশের সরাসরি জবাব দেবার পরিবর্তে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, সত্যিই কি ঐ মহিলার অবস্থা ঈর্ষা করার যোগ্য, যাকে স্বামীর সেবাও করতে হয়, ঘরের দায়িত্বও পালন করতে হয়, সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্বও পালন করতে হয়, আবার রুটি-রুজির ধান্দায়ও বেরুতে হয়? যে ঘরে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই উপার্জনের জন্য বের হয়ে যায়, সন্তানদেরকে রাস্তা-ঘাটে ভবঘুরে অবস্থায় রেখে যায়, কিংবা কোনো বেবী কেয়ার বা নার্সারীতে সঁপে যায়, অতপর সন্ধ্যায় যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় ঘরে ফেরে, তখন তাদেরকে আদর করা এবং তাদের দুঃখ-সুখ শোনার পরিবর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, আর রাত শেষ হবার সাথে সাথেই পুনরায় ডিউটিতে হাজিরা দিতে চলে যায়, সে সংসারকে কি সুখের স্বর্গ বলা যেতে পারে? খোদা না করুন, নারীদের উপর কখনো এ বিপদ চেপে বসলে, সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর এসে পড়লে ইসলামী সমাজ তাকে এমনি অসহায় ফেলে রাখবেনা, তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে

এবং প্রয়োজন হলে সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেবে।

আমরা কখনো নারীদের চাকরির বিরোধী নই। যেসব বিভাগ নারীরাই চালানোর উপযুক্ত, সেগুলো তাদের উপরই ন্যস্ত করা হবে। যেমন, নারীদের চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তারদের প্রয়োজন হবে, নিচ থেকে উপর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। এসব বিভাগে কেবল নারীদের নিকট থেকেই সেবা গ্রহণ করা হবে। আর এ সেবা তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভেরও মাধ্যম হবে। তবে একথা মনে রাখবেন, আমরা সকল প্রকার চাকরির ময়দানেই নারীদেরকে নিয়োগ করতে চাইনা। ঐ সমাজকে বেহেশতী সমাজই মনে করা উচিত, যেখানে নারীদের উপর তাদের প্রকৃতি বিরোধী বোঝা চাপানো হবেনা এবং তাদেরকে সংসারে রাণীর মর্যাদা প্রদান করা হবে।

পাশ্চাত্য সমাজের রেখাচিত্র

আমাদের দেশে নারী স্বাধীনতা এবং নারীর চাকরির ধারণা পাশ্চাত্য থেকে আমদানী হয়েছে। যারা স্বচক্ষে পাশ্চাত্যের সমাজ জীবন অবলোকন করেছেন, তারা জানেন, সেখানকার নারীরা কতোটা করুণার পাত্রী।

জনৈক লেখক তার বইতে একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি প্যারিসে একজন স্থানীয় লোকের সাথে সাক্ষাত করতে যান। সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় দেখেন, সিঁড়িতে বসে একটি মহিলা কাঁদছে। তিনি যখন লোকটির সাথে সাক্ষাত করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন, তখনো দেখেন সে বসে বসে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি কাঁদছো? সে জবাব দিলো, আপনি যার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন, তিনি আমার বাপ। তার ঘরের একটি কক্ষ ভাড়া নেয়ার জন্য আমি তার কাছে এসেছি। কিন্তু তিনি আমাকে ভাড়া দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, অন্য জায়গায় ভাড়া দিলে তিনি বেশি ভাড়া পাবেন। সুতরাং আমার কাছে ভাড়া দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি বরদাস্ত করতে পারবেননা। সে কাঁদতে কাঁদতে লোকটিকে বললো, এখন আমি কোথায় মাথা গুঁজবো?

এই হচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র। যেখানে পিতা-মাতা নিজ সন্তানদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং তাদের কোনো খোঁজ খবরও নেয়না। সেখানে কতোটা বিপদে নিমজ্জিত হয়ে নারীরা উপার্জনের পথ ধরে, তা সহজেই অনুমেয়।

আপনারা কেন চাচ্ছেন যে, আমাদের দেশের নারীদের উপরও সেই বিপদ চেপে বসুক। ঐ সমাজকে তো বিরাট অনুগ্রহই মনে করা উচিত, যেখানে পিতা-মাতা সন্তানের লালন পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে

এবং ততোক্ষণ পর্যন্ত কন্যা সন্তানের দায়িত্ব বহন করে, যতোক্ষণ না একটি উপযুক্ত ছেলে খুঁজে বের করে মেয়েকে তার দায়িত্বে ন্যস্ত করতে পারে; যেখানে স্বামীরা স্ত্রীদের যাবতীয় বোঝা বহন করে তাদেরকে রুটি-রুজির চিন্তা থেকে মুক্ত করে তাদের উপর সংসারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সমাজই আপনাদের জন্য জান্নাত সমতুল্য। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী প্রগতির লোভে নিজেদের হাতে এ জান্নাতকে খুইয়ে বসবেন না।

ইসলামী সমাজ ও পশ্চিমা সমাজ

ইসলাম নারীদের উপর কেবল সেসব দায়িত্ব-কর্তব্যই ন্যস্ত করে, যা প্রকৃতিই তাদের উপর ন্যস্ত করেছে। অতপর ইসলাম পুরুষদের সাথে তাদের সম্পূর্ণ সাম্যের মর্যাদা প্রদান করেছে। উভয়ের অধিকারের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য রাখেনি। সম্মানের দিক থেকে তাদেরকে সেই মর্যাদাই প্রদান করেছে, যা প্রদান করেছে পুরুষদেরকে। আমি উপরন্তু একথাও বলতে চাই, মুসলিম মহিলাদের উচিত, আল্লাহর শোকর আদায় করা যে, তারা মুসলিম সমাজে জন্ম নিয়েছে। কারণ পৃথিবীর অন্য কোনো সমাজ নারীদেরকে ইসলামী সমাজের সমতুল্য মর্যাদা প্রদান করে না। আমেরিকায় গিয়ে দেখুন, নারীদের কি দশা! বৃটেনে নারীদের অবস্থা দেখে আসুন! কী যে আপদের জীবন তারা যাপন করে! পিতা তাদের দায়িত্ব বহন করেনা। তাদের ব্যাপারে ভাইদের কোনো দায়িত্ব নেই, সন্তানরাও তাদের দায়িত্ব বহন করেনা। পরিবার ও বংশের কারো উপর তাদের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই। বয়স হলেই তাদের বাপ তাদেরকে বিদায় করে দেয়। বলে, নিজে গিয়ে কামাই করে খাও। অতপর সে কিভাবে কামাই করে খাবে, কিভাবে জীবন যাপন করবে, সে সম্পর্কে বার্গেনিং করার কোনো অবকাশ থাকেনা।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ এতোই অসহায় জীবন যাপন করছে যে, তাদের জন্যে দুঃখ করবারও কেউ নেই। আমাদের দেশের যারা সেসব দেশে থাকে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সেখানে নারীদের কি দুর্দশা! অথচ আমাদের সমাজে বাপ উপযুক্ত পাত্র খুঁজে নিজেই নিজ দায়িত্বে কন্যাকে বিয়ে দেয়। এমনকি বিয়ে দেয়ার পরও পিতা সন্তানের কল্যাণ চিন্তায় ব্যাকুল থাকেন। ভাই বোনদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। ছেলে মায়ের সেবায় নিরত থাকে। স্বামী স্ত্রীকে ঘরের রাণী বানিয়ে রাখে। এখানে আপনাদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ প্রেম ও ভালোবাসা পোষণ করা হয়। আপনাদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। আপনাদের সম্মান প্রদান করা হয়। অথচ পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের অর্ধ উলংগ করে পুরুষের সামনে নাচানো হয়। সেখানে সম্মান ও মর্যাদার কোনো স্থান নারীদের

জন্যে নেই।

এখন আমাদের দেশের নারীরা যদি সেসব অধিকারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে না চায়, যা ইসলাম তাদের প্রদান করেছে, বরং সেই করুণ পরিণতি দেখতে চায়, যা ঘটছে পাশ্চাত্য দেশের নারী সমাজের, তবে তা দেখার স্বাধীনতা তাদের আছে। কিন্তু তাদেরকে একথা মনে রাখতে হবে, একবার সেই করুণ পরিণতির দিকে এগুলে সেখান থেকে ফিরে আসার সুযোগ খুব সহজে হবেনা। কোনো সমাজ যখন বিকৃতির দিকে এগিয়ে যায়, তখন সে বিকৃতির শেষ সীমায় পৌছে থাকে। আর বিকৃতির শেষ সীমায় পৌছলে প্রত্যাবর্তন করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ২য় খন্ড)

মহিলাদের পবিত্রতা ও সতীত্বের ভবিষ্যত

প্রশ্ন ঃ (করাচীর) মর্নিং নিউজের একটি কাটিং আপনার খিদমতে প্রেরণ করছি। ইংল্যান্ডের তালাক বিভাগীয় আদালতের প্রাক্তন জজ স্যার হার্বার্ট ওয়েলিংটন সেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীর কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সে কাটিং এর অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"রোমান ক্যাথলিক তালাক বিভাগীয় আদালতের প্রাক্তন জজ স্যার হার্বার্ট ওয়েলিংটন তার প্রদত্ত এক রায়ে একজন স্ত্রীর চৌদ্দটি গুণ বর্ণনা করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেয়া হলো ঃ

১. আকর্ষণীয় চেহারা,
২. বুদ্ধিমত্তা,
৩. ভালবাসা,
৪. বিনয় নম্রতা,
৫. স্নেহপরায়ণতা,
৬. সুন্দর ব্যবহার,
৭. সহযোগিতা করার আবেগ,
৮. সবর ও সহিষ্ণুতা,
৯. চিন্তা ভাবনা,
১০. নিঃস্বার্থপরতা,
১১. হাসিমুখে থাকা,
১২. ত্যাগ তিতিক্ষা,
১৩. কর্মপ্রেরণা,
১৪. বিশ্বস্ততা।

স্যার হার্বার্ট তার বিবরণীতে বলেন, তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর মধ্যে উপরের সবগুলো গুণই বর্তমান ছিলো। তাকে তিনি বিয়ে করেন ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর। শত শত অকৃতকার্য বিবাহ বিচ্ছেদের তিনি রায় দিয়েছেন। অতঃপর ৮৬ বছর বয়সে স্যার হার্বার্ট ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

এ কাটিং দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, স্যার হার্বার্ট উক্ত চৌদ্দটি গুণের মধ্যে 'সতীত্বকে' নামেমাত্র অন্তর্ভুক্ত করাও জরুরি মনে করেননি। এতে মনে হয় সতীত্ব গুণটি এখন আর নারীদের বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়না। একজন মহিলা সতীত্ব ও ব্যক্তিত্ব ব্যতীত কেমন করে স্বামীর নিকট বিশ্বস্ত হতে পারে, তা আমি বুঝতে অক্ষম।

জবাব ঃ আপনার চিঠি পেলাম, যার মধ্যে আপনি ইংল্যান্ডের তালাক বিভাগীয় আদালতের এক জজ সাহেবের অসিয়তনামা লিখে পাঠিয়েছেন এবং সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন। আসল ব্যাপার এই যে, পাশ্চাত্যবাসীদের নিকটে আজকাল এ ধ্যান ধারণা প্রায় খতম হয়ে গেছে যে, নারীদের বিভিন্ন বৈশিষ্টের মধ্যে সতীত্বও একটি অন্যতম গুণ। নারী পুরুষের খোলাখুলি এবং অবাধ মেলামেশার অনিবার্য ফলস্বরূপ সেখানে ব্যভিচার এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত প্রচলিত রেওয়াজের সাথে আপোষ করতে তথাকার সমাজ বাধ্য হয়। এখন সেখানে কোনো ব্যক্তি এটা আশাই করেনা যে, বিয়ের দিন সে একজন কুমারী স্ত্রী পাবে এবং বিয়ের পরে সে সতী ও বিশ্বস্তই থাকবে। ওখানে তো পুরুষলোক নিজের ভাবী স্ত্রীর সাথে কোর্টশীপ চলাকালে ব্যভিচার করেই থাকে এবং অধিকাংশ বিবাহই মেয়েরা অন্তঃসত্তা হওয়ার পরই সম্পাদিত হয়। এমতাবস্থায় আপনি কিভাবে আশা করতে পারেন যে, সেখানে সতীত্ব মেয়েদের জন্য একটি সৎ গুণ বলে বিবেচিত হবে এবং স্ত্রীর জন্য একটি অনিবার্য বৈশিষ্ট হিসেবে মনে করা হবে।

আমি বলি, তাদের কথা উল্লেখ করে লাভ কি, আমাদের শাসকবর্গ এবং অভিজাত মহলের লোকদের কল্যাণে এখন যে হারে আমাদের নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রসার লাভ করেছে এবং পরিবার পরিকল্পনার নামে জন্ম রোধের পদ্ধতিগুলোকে যেভাবে সর্বসাধারণে প্রচার করা হচ্ছে, সে অবস্থা দেখে আমাদের নিজেদের সমাজেও একই ব্যাধি সংক্রমিত হওয়ার আশংকা অমূলক মনে হয়না। হয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়াত করুন, নয়তো আমাদের জাতিকে ঐসব লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিন, যারা নিজেরা তো ডুবেছে এবং সমগ্র জাতিকেও ডুবানোর কাজে উঠে পড়ে লেগে আছে। (তরজমানুল কুরআন, খন্ড ৫৮, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর ১৯৬২ খৃঃ, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৪র্থ খন্ড)

৩

নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সমাজের বিকৃতি রোধে নারীর দায়িত্ব

প্রিয় ভগ্নি ও কন্যাগণ!

আপনারা জানেন, ইদানিং আমার স্বাস্থ্য বেশ খারাপ যাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরিক্ষা করানোর জন্যই করাচি এসেছি। এ সময় দীর্ঘ বক্তৃতা করা আমার জন্য কষ্টকর। সংক্ষেপে আপনাদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা আরয করতে চাই। বক্তব্যের পরই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবো।

উপমহাদেশে ইংরেজদের গোলামী এবং হিন্দুদের প্রাধান্যের কারণে মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। তাই এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যেই মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ভারত থেকে আলাদা করে এ দেশটি প্রতিষ্ঠার পেছনে এ উদ্দেশ্যও ছিলো যে, এখানে মুসলমান, পুরুষ ও নারীরা সেই বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সা. তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বিগত বছরগুলোতে সে সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরঞ্চ তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যেই চেষ্টা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এতোটা বলিষ্ঠ প্রচলন করা হয়েছে, যতোটা ইংরেজদের আমলেও ছিলোনা। তাদের সংস্কৃতির এ প্রচলন আমাদের পারিবারিক জীবনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সামাজিক জীবনে রীতিমতো অগ্রগতি লাভ করেছে এবং দেশবাসী দিন দিন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আফসোস! এই সভ্যতা এখন মুসলমান নারীদেরকেও ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। এই প্রভাব এতোই মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে যে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের নারী সমাজ থেকে এমনসব বালিকা ও মহিলা বের হয়ে আসছে, যাদের মন-মস্তিষ্কে নাস্তিকতা চেপে বসেছে। তারা প্রকাশ্যে ইসলামী সভ্যতা, ইসলামের মাহাত্ম্য এবং ইসলামী আদর্শ ও দৃষ্টিভংগির সাথে বিদ্রূপ করছে।

নারীরাই সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় রক্ষক

পৃথিবীতে নারীরাই নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় রক্ষক হয়ে থাকে। তারা নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে সেই সভ্যতা সংস্কৃতিকেই প্রতিষ্ঠিত রাখে, যাতে তারা নিজেরা বড় হয়েছে। পুরুষরা খুব দ্রুত ভিনদেশী আদর্শ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু নারীরা হিমাচলের মতো সে ঝড়ের প্রতিরোধ করে। পরিবারে ভিনদেশী আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তারা লৌহদূর্গ বলে প্রমাণিত হয়। মুসলিম নারীরা সবসময়ই নিজেদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে এরূপ অনমনীয় নীতি প্রদর্শন করেছে এবং নিজের পরিবার ও সন্তানদের ভিনদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিরাম আক্রমণ এবং ভ্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে তাদের মধ্যে এমনকিছু নারী সৃষ্টি হয়েছে, যারা নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে অপরিচিত থেকে যাচ্ছে। নাস্তিকতার স্তরে এসে পৌঁছার চাইতে বড় অধপতন মুসলিম নারীর জন্য আর কি হতে পারে? তারা এখন বিচারদিনকে প্রতারণা বলে অভিহিত করছে এবং ইসলামী নৈতিকতা ও সভ্যতাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে আখ্যায়িত করে লজ্জা শরমের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত খুইয়েছে।

যতোদিন কেবল পুরুষদের মধ্যে এই বিকৃতি সীমাবদ্ধ ছিলো, ততোদিন জাতির ধ্বংস এতোটা কঠিন বিপদজ্জনক ছিলনা। সন্তানরা মায়ের কাছ থেকে কালেমা শিখতো, কুরআন শিখতো, ইসলামের রীতিনীতি ও বিধি-বিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং তারা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো যে, তারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। এর প্রভাব এতোটা কার্যকর ছিলো যে, ইউরোপ-আমেরিকার চরম বস্তুবাদী পরিবেশে থেকেও তাদের সে চেতনা নিবৃত্ত হতোনা, যা প্রথম দিন থেকে তাদের মা তাদের মন-মগজে অংকিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন নারীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং নাস্তিক্যবাদী বস্তুপূজা ছড়িয়ে পড়ার ফলে মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের অধপতনের বিপদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন আমাদের জন্য এটা বড়ই ভাবনার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে যে, মায়ের কোলও যদি মুসলমান না থাকে, তবে শিশুরা ইসলামী নৈতিক চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পাঠ কোথা থেকে গ্রহণ করবে?

বিকৃতি রোধ করা নারীদেরই দায়িত্ব

নারীদের মধ্যে যে মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে, তা প্রতিরোধ করা মুসলিম নারীদেরই কাজ। নারীদের মধ্যে কাজ করা পুরুষদের জন্য কঠিন। তাছাড়া একটি বিকৃতি দূর করার জন্য আরেকটি

বিকৃত পথে অগ্রসর হবার অনুমতিও ইসলাম প্রদান করেনা। যেসব নারী ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে চাননা, তারা যদি জেগে উঠেন এবং অটলভাবে প্রতিরোধ করতে শুরু করেন, তবেই এ বিকৃতি ঠেকানো সম্ভব। নারীদের মধ্যে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে, আল্লাহর শোকর, তাদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক নারী দীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়নি। তারা আল্লাহ এবং রসূলকে মানে এবং ইসলামী বিধি-বিধান পালন করা নিজেদের কর্তব্য মনে করে। এরা যদি ইসলামী আন্দোলনে এগিয়ে আসে এবং ভ্রান্ত সভ্যতা সংস্কৃতি দ্বারা যেসব নারী প্রভাবিত হচ্ছে, তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তবে অতি শীঘ্রই নারীদের মধ্যে একটি সংস্কার বিপ্লব বা রেনেসাঁ সাধন হতে পারে।

পুরুষদের মধ্যে কাজ করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, খুব কম লোকই বিকৃতিকে বিকৃতি হিসেবে পছন্দ করে। বিরাট সংখ্যক লোক বিকৃতিকে গ্রহণ করেছে ফ্যাশন হিসেবে। এ সংখ্যা পুরুষদের চাইতে নারীদের মধ্যে কম। বিকৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে, এরূপ সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে অনেক কম। নারীদের মধ্যে যতোটা বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে, তা ছড়িয়েছে কেবল অজ্ঞতা, মূর্খতা, শিক্ষার অভাব এবং ফ্যাশনের অন্তরালে। নতুবা তারা ধর্ম বিরোধী নয়।

যেসব নারী নারীমহলে কাজ করছেন, তারা বলছেন, বুদ্ধিমত্তার সাথে নারীদের সামনে কুরআন হাদীসের বিধান উপস্থাপন করতে পারলে এবং ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে, তা বুঝিয়ে দিতে পারলে খুব দ্রুত তারা তা গ্রহণ করে এবং নিজ পরিবেশে তা প্রচার ও কার্যকর করার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করে। তাই নারীদের মধ্যে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে, তার জন্য হতাশ হবার কারণ নেই। প্রয়োজন হলো দীনের কাজ করতে আগ্রহী নারীদের এগিয়ে আসা এবং বিকৃতির গতি সুকৃতির দিকে ঘুরিয়ে দেয়া।

কিন্তু এ কাজ যারা করবেন, তাদের পহেলা কাজ হচ্ছে, দীন সম্পর্কে নিজেদের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা। তাদের উচিত, মনোনিবেশের সাথে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা। তারপর নারীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা, তাদের জন্য সামষ্টিক পাঠের ব্যবস্থা করা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও সহজ সহজ ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা। একইভাবে স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত নারীদেরও উচিত, নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং সহপাঠিনীদের মধ্যে দীনি কাজের সূচনা করা। কিছুসংখ্যক নারী সংশোধনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় সহসাই এ কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

নির্বাচনে নারীদের কর্তব্য

আরেকটি কথা আপনাদের বলতে চাই। সহসাই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা জানেন, নির্বাচনে নারীদেরও সেরূপই মতামত প্রদানের অধিকার রয়েছে, যেমনটি রয়েছে পুরুষদের। আর যেহেতু আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, সে কারণে যতোক্ষণ না নারী-পুরুষ উভয়ই সমভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার জন্য কাজ করবে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দেবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারবেনা। ইসলামের হিতাকাংখী পুরুষরা যেমন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ ব্যয় করে কাজ করছেন, তেমনি ইসলামের হিতাকাংখী মহিলাদেরকেও নিজেদের শক্তি-সামর্থ কাজে লাগাতে হবে এবং জনসংখ্যার এ অর্ধেক নারীকে ইসলামের পক্ষে ভোটদানের জন্য মানসিকভাবে তৈরী করতে হবে। পুরুষদের জন্য নারী মহলে গিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়, এটা নারীদেরই কাজ। তাই এ দায়িত্ব তাদেরকেই পালন করতে হবে।

এমনসব নারী কর্মী তৈরী করা আপনাদের কর্তব্য, যারা ঘরে ঘরে গিয়ে সাধারণ নারী সমাজকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে রায় দিতে রাজী করাতে সক্ষম হবে। এ কাজের জন্য প্রয়োজন বিরাট চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। তাদের মধ্যে যদি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জযবা সৃষ্টি হয়, তবে দেশে ইসলামী বিপ্লবের মঞ্জিল খুব সন্নিকটে।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী ও বাপ-মায়ের অধিকার

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখা বইগুলো পড়েছি। ফলে মনের অনেক জটিল দ্বন্দ্বের সুরাহা হয়ে গেছে। কিন্তু একটা খটকা মনের মধ্যে প্রথম থেকে ছিলো এবং এখনো রয়ে গেছে। খটকাটা হচ্ছে, ইসলাম একদিকে মেয়েদের মর্যাদা যথেষ্ট উন্নত করেছে, কিন্তু অন্যদিকে স্ত্রী হিসেবে কোনো কোনো বিষয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। যেমন, তিনজন সতীনের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া জায়েয গণ্য করেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নারী প্রকৃতির সাথে হিংসাও মিশিয়ে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে যেখানে স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্বের অধীন করা হয়েছে, সেখানে স্বামীকে আবার করে রাখা হয়েছে তার বাপ-মায়ের কর্তৃত্বের অধীন। এভাবে বাপ-মায়ের কথায় স্বামী তার স্ত্রীর একটি বৈধ আকাংখারও বিনাশ সাধন করতে পারে। এসব ব্যাপারে বাহ্যত স্ত্রীকে তো চার পয়সার একটি পুতুলের চাইতে বেশি কিছু মনে হয়না। আমি একটি মেয়ে। স্বাভাবিকভাবে আমি মেয়েদের আবেগ ও অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করছি। মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে যুক্তিসংগত জবাব দিয়ে আমার মনের দ্বন্দ্ব দূর করতে সহায়তা করবেন।

জবাব ঃ সংসার জীবনে মেয়েদের স্থান অপেক্ষাকৃত নীচে বলে আপনি যে ধারণা প্রকাশ করেছেন, তার পেছনে আপনার যুক্তি দু'টি। একটি হচ্ছে পুরুষ চারটি বিয়ে করার অনুমতি পেয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, স্বামীকে বাপ-মায়ের কর্তৃত্বের অধীনে রাখা হয়েছে। এর ফলে সে অনেক সময় বাপ-মায়ের সন্তুষ্টির জন্য নিজের স্ত্রীর আশা আকাংখাকে জলাঞ্জলি দেয়।

এর মধ্যে প্রথম কারণটি নিয়ে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন, তিনজন সতীনের ঝামেলা বরদাশত করা মেয়েদের জন্য যতোটা কষ্টকর, তার চাইতে অনেক বেশি কষ্টকর হবে যখন সে দেখবে, তার স্বামীর কয়েকটি প্রেয়সী ও উপ-পত্নী রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য ইসলাম পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি করার ব্যাপারে একজন পুরুষ যতো বেশি নির্ভীক হয়, বিয়ে করার ব্যাপারে ততোটা হতে পারেনা। কারণ বিয়ে করলে স্বামীর দায়িত্ব বেড়ে যায় এবং নানা ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। আসলে এটা মেয়েদের জন্য একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পুরুষদের জন্য নয়। পুরুষদের অবাধ সুযোগ সুবিধা দেবার পদ্ধতির পরিক্ষা নিরিক্ষা তো আজকাল পাশ্চাত্যের সমাজে চলছে। সেখানে একদিকে বৈধ সতীনদের পথ রোধ করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে অবৈধ সতীনদের হাত থেকে স্ত্রীকে বাঁচাবার কোনো পথই করা হয়নি। তবে অবৈধ সতীনদের চাপ সইতে না পারলে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেবার জন্য স্ত্রী আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে। এছাড়া স্ত্রীর জন্য আর দ্বিতীয় কোনো পথ সেখানে খোলা নেই। আপনি কি মনে করেন এর ফলে স্ত্রীর বিপদ কিছু কমে গেছে? যেসব স্ত্রীর কোল খালি আছে, ছেলেপিলে হয়নি, তারা হয়তো সতীনদের জ্বালা থেকে বাঁচার জন্য তালাককে সহজ পথ মনে করতে পারে, কিন্তু সন্তানের মায়ের জন্যও কি এ পথ এতোই সহজ?

দ্বিতীয় যে অভিযোগটি আপনি করেছেন, তার জবাবে সংক্ষেপে বলতে চাই ঃ সম্ভবত এখনো আপনার কোনো সন্তান হয়নি অথবা হয়ে থাকলেও আপনার কোনো ছেলের এখনো বিয়ে হয়নি। এ বিষয়টিকে আপনি এখনো শুধুমাত্র বধূর দৃষ্টিতে বিচার করছেন। যখন আপনি নিজের ঘরে পুত্র বউ আনবেন এবং ছেলের মা ও বউয়ের শ্বাশুড়ীর দৃষ্টিতে এ বিষয়টা বিচার করবেন, তখন ব্যাপারটা আপনি ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন। তখন স্ত্রীর অধিকার কতোটুকু এবং মা-বাপের অধিকার কতোটুকু হওয়া উচিত তা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। বরং আজ আপনি যেসব অধিকার নিয়ে আপত্তি তুলেছেন, সেদিন হয়তো আপনি নিজেই সেগুলো চাইবেন। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৪র্থ খন্ড)

স্বামীর বিরোধিতা

প্রশ্ন ঃ আমি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক। কিন্তু আমার স্বামী জামায়াত বিরোধী। আমাকে বলুন, তাকে কিভাবে সঠিক পথে আনবো?

জবাব ঃ এ ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে যতোটা প্রচেষ্টা চালানো যায়, তা চালিয়ে যান। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই ঘরের পরিবেশ যেন বিষাক্ত না হয়। আপনার স্বামী যদি ইসলামকেই সত্য মনে করেন আর জামায়াতে ইসলামী যে পন্থায় কাজ করছে তা পছন্দ না করেন, তবে তাকে তার অনুসৃত পথেই চলতে দিন। দাম্পত্য জীবনকে তিক্ত ও বিরক্তিকর করার প্রয়োজন নেই। আর তিনি যদি ইসলামের পরিবর্তে কুফরী সমাজকে সঠিক মনে করেন, তবে আপনাকে আপনার মতের উপর অটলতা প্রদর্শন করা উচিত এবং এমতাবস্থায় তার মত মেনে নেয়া ঠিক হবেনা।

ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রীরা ঈমান এনেছেন আর স্বামীরা থেকেছেন কাফির। এমতাবস্থায় তারা স্বামীদের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু আল্লাহর পথ ত্যাগ করা পছন্দ করেননি।* (সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ২৮ জুন, ১৯৭০)

●

---

* ১৯৭০ সালের ১৪ জুন বাদ মাগরিব মাওলানা করাচীতে এক মহিলা সমাবেশে ভাষণ দেন এবং ভাষণের পর মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এটি সেই ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরের সার সংক্ষেপ।

৪

জাতীয় উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

দেশের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ

অভিযোগ করা হয়েছে, পর্দা প্রথার অনুবর্তন করলে নারীরা দেশের উন্নয়নে সহযোগী হবার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক প্রতিপন্ন হবে। এ প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন হলো, দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের প্রতিপালন এবং প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত আছে, না নেই? সেই দেশ কেমন করে উন্নতি লাভ করতে পারে, যেখানে শিশুরা প্রথম দিন থেকেই পিতা মাতার স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়? যেখানে জন্ম হতেই শিশুরা পিতা মাতার পরিবর্তে ভাড়াটে লোকদের হাতে প্রতিপালিত হয়? বাপও চাকরিতে চলে যায়, মাও চাকরিতে চলে যায়, আর সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয় এমনসব প্রতিষ্ঠান, যেগুলো কোনো অবস্থাতেই পিতা-মাতার বিকল্প হতে পারেনা। শিশুকাল থেকেই এসব শিশুরা স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। আর শিশুকাল থেকে যেসব বাচ্চা বাবা মায়ের আদর স্নেহ বঞ্চিত হয়ে বড় হয়, তারা আসলে সত্যিকার মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারেনা।

আজ বিশ্বময় যে অন্যায়, অবিচার, পশুত্ব, বর্বরতা এবং কিশোর অপরাধ বিরাট সমস্যা হয়ে দঁড়িয়েছে, তার কারণও এটাই যে, বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার দন্ড সেসব লোকদের হাতে আসছে, যারা ছোটবেলা থেকেই বাবা মা'র স্নেহ মমতা থেকে বঞ্চিত। এসব শিশু যখন বড় হয়, তখন পিতা মাতার প্রতিও তাদের কোনো মমত্ববোধ থাকেনা। আর যেখানে রক্তের বাঁধনের প্রতিই কোনো মমত্ববোধ থাকেনা, সেখানে মানবতার প্রতি মমত্ববোধের তো প্রশ্নই ওঠেনা।

শেষ পর্যন্ত এই ধরনের লোকেরা তো স্বার্থের দাস হতে বাধ্য। মানুষের কল্যাণ চিন্তা থেকে মুক্ত হতে বাধ্য। ইংল্যান্ড সফরের সময় এমন অনেক পাকিস্তানী লোকের সংগে আমার সাক্ষাত হয়েছে, যারা বহু বছর থেকে সেখানে বসবাস করে আসছেন। তাদের কাছ থেকে ইংরেজ সমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার চেষ্টা করেছি। কারণ, তারা সে মসাজের রগরেষা সম্পর্কে অবহিত। তারা আমাকে এমনসব ঘটনা শুনিয়েছেন, যা সত্যিই বেদনাদায়ক। এক কক্ষে এক বৃদ্ধা মা থাকেন। পেনশন দিয়ে চলেন। তার ছেলেমেয়েরা সবাই বিলাসী জীবন যাপন করে। বস্তুবাদী দৃষ্টিতে তাদের

জীবন সুখের জীবন। কিন্তু এই বৃদ্ধার খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ নেই। তার দুঃখে দুঃখী হওয়ার কেউ নেই। তাকে একটু সাহায্য করবার কেউ নেই। একদিন বৃদ্ধা মারা যায়। কেউ তার খোঁজ নিতে আসেনি। দুধওয়ালা প্রতিদিন দুধ দিয়ে যায়। সে যখন দেখল দুই তিন দিনকার দুধের বোতল দরজায় পড়ে আছে, ভিতরে ঢুকানো হচ্ছে না, তখন সে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখে, বৃদ্ধার লাশে পঁচন ধরেছে। এই হচ্ছে সেসব নারীর অবস্থা, যাদের পুত্র কন্যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত।

ওখানে বসবাসকারীরা ওখানকার যে চিত্র তুলে ধরে, তাতে জানা যায়, সেখানে পারিবারিক বন্ধন নিঃশেষ হয়ে গেছে। পুত্রের সাথে পিতার, কন্যার সাথে মা'র এবং ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। এই করুণ পরিণতির কারণ হলো অর্থনৈতিক উৎপাদনের উন্নয়নকেই দেশ ও জাতির উন্নয়ন মনে করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই নারী পুরুষ সবাইকে নিয়ে অর্থনৈতিক ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। বেপরোয়াভাবে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। অথচ কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির নামই উন্নয়ন নয়। নারীরা যদি ঘরে নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়, মানবতা শিখায় এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য পয়দা করার চেষ্টা করে, তবে এটাও উন্নয়নের একটি বিরাট মাধ্যম। পুরুষরাও কলে কারখানায় কাজ করবে, নারীরাও কলে কারখানায় কাজ করবে, দেশের উন্নয়নের কেবল এটাই একমাত্র উপায় নয়। বরঞ্চ এটাও উন্নয়নের একটা বড় উপায় যে, ঘরে শিশুদেরকে মানবতা শিক্ষা দিয়ে তৈরী করা হবে এবং এতোটা যোগ্য করা হবে যে, তারা পৃথিবীতে মানবতার নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করবে, হিংস্র পশুপাখি হয়ে গড়ে উঠবেনা। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ২য় খন্ড)

সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যখন এই দাবীতেই সোচ্চার যে, সে চরম নাজুক মুহূর্তেও নারীকে একটা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, তখন এ যুগের ইসলামী সরকার কি তাকে পুরুষদের সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দেবে? এ যুগে নারীকে কি পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেয়া যাবে? তাদেরকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা অথবা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধিশালী করার অনুমতি দেয়া হবে কি? মনে করুন, ইসলামী সরকার যদি নারীদেরকে ভোটাধিকার দেয় এবং তারা মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়, তাহলে এই বিংশ শতাব্দীতেও কি তারা ইসলামী নীতি মোতাবেক সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারবেনা? মহিলাদের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করার দৃষ্টান্ত তো আজকাল ভুরি ভুরি।

শ্রীলংকায় বর্তমানে মহিলা প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। নেদারল্যান্ডের সর্বোচ্চ শাসকও একজন মহিলা। বৃটেনের রাজমুকুটও একজন মহিলার মাথায় শোভা পাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ভূপালের নবাবের বোন আবেদা সুলতানা দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে বেগম রানা লিয়াকত আলী নেদারল্যান্ডে পাকিস্তানের রাস্ট্রদূত, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত বৃটেনে ভারতের বর্তমান হাই কমিশনার রয়েছেন। এর আগে তিনি জাতিসংঘের সভাপতিও ছিলেন। মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এবং ঝাঁসীর রানী রাজিয়া সুলতানার নজীরও লক্ষণীয়। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের মহিয়ষী হযরত মহল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন।

এভাবে নারীরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য প্রমাণ করেছেন। এই পটভূমিতে মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ যদি আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন, তাহলে ইসলামী বিধানের আলোকে পাকিস্তানের ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় তা কি অনুমোদিত হবে? মহিলারা কি এখনো ডাক্তার, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, সামরিক কর্মকর্তা, অথবা বৈমানিক হতে পারবেননা? নার্স হিসেবে মহিলারা রোগীদের কিরূপ পরিচর্যা করে সেটাও দেখার মতো। স্বয়ং ইসলামের প্রথম যুদ্ধে নারীরা যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা করেছেন, পানি খাইয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমতাবস্থায় আজও কি ইসলামী রাষ্ট্রে অর্ধেক দেশবাসীকে বাড়ির চৌহদ্দিতে বন্দিনী করে রাখা হবে?

জবাব ঃ ইসলামী সরকার দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির বিরুদ্ধে কাজ করার অধিকারী নয়। এমনটি ইচ্ছা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি তার পরিচালনায় প্রকৃত ইসলামী আদর্শের নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ও বাস্তব অনুসারী লোকেরা নিয়োজিত থেকে থাকে। নারীর ব্যাপারে ইসলামের নীতি এইযে, তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষের সমান, নৈতিক মানের বিচারেও সমান, আখিরাতে কর্মফলেও সমান, কিন্তু উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক নয়। রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সামরিক কর্মকান্ড এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ পুরুষের কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কর্মক্ষেত্রে নারীকে টেনে আনার অনিবার্য পরিণাম এই হবে যে, হয় আমাদের পারিবারিক জীবন একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে যা প্রধানত নারীর কর্মক্ষেত্র, অথবা নারীর ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব বর্তাবে। এক দিকে তাকে তার স্বভাবসুলভ দায়িত্বও পালন করতে হবে, যাতে পুরুষ কোনোক্রমেই অংশীদার হতে পারেনা। তদুপরি পুরুষের দায়িত্বেরও অর্ধেক নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন তো কার্যত সম্ভব নয়। কাজেই অনিবার্যভাবে প্রথম পরিণতিটাই দেখা দেবে। পাশ্চাত্য জগতের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, সেখানে তা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং

তাদের পারিবারিক জীবনে ধ্বস নেমেছে। অন্যের নির্বুদ্ধিতাকে চোখ বুজে অনুকরণ করা কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।

ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের সমান হবার কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের অকাট্য বিধান এ ব্যাপারে অন্তরায়। উভয়ের অংশ সমান হওয়া ইনসাফেরও পরিপন্থী। কারণ ইসলামী বিধানে পরিবারের লালন পালনের সমস্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব পুরুষের ওপর চাপানো হয়েছে। স্ত্রীর মোহরানা এবং ভরণপোষণও তারই দায়িত্ব। অপরদিকে স্ত্রীর ওপর কোনো দায়দায়িত্বই ন্যস্ত হয়নি। এমতাবস্থায় কোন্ যুক্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা যেতে পারে।

নীতিগতভাবেই ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিপক্ষে। পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা চায় এমন কোনো সমাজ ব্যবস্থা অবাধ মেলামেশার পরিবেশ কামনা করেনা। পাশ্চাত্য জগতে এর শোচনীয় পরিণতি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের যদি সেই পরিণতি ভোগ করার সাধ জেগে থাকে তবে সানন্দে তা ভোগ করুক। তাই বলে ইসলাম যে কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করে, তা জোরপূর্বক বৈধ প্রমাণ করার কি দরকার পড়ছে?

ইসলামে যদি যুদ্ধের সময় নারীকে আহতদের পরিচর্যার কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এটা হয়না যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও নারীকে অফিস আদালতে, কল কারখানায়, ক্লাবে এবং রাষ্ট্রীয় সামাজিক নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসে নারীরা কখনো পুরুষের মুকাবিলায় সফল হতে পারেনা। কেননা তাদেরকে এসব কাজের জন্য তৈরীই করা হয়নি। এসব কাজের জন্য যে ধরনের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীর প্রয়োজন, তা মূলত পুরুষের মধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

নারী যদি কৃত্রিমভাবে এসব গুণ কিছু কিছু অর্জনের চেষ্টাও করে তবে তার উল্টো ক্ষতি তার নিজের এবং সমাজের ওপর সমভাবে বর্তে। তার নিজের ক্ষতি এই যে, সে পুরোপুরি স্ত্রীও থাকে না পুরোপুরি পুরুষও হতে সক্ষম হয়না। ফলে নিজের সহজাত কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি এই যে, যোগ্য কর্মীর বদলে সে অযোগ্য কর্মীকে কাজে নিয়োগ করে। নারীর আধা মেয়েলী ও আধা পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্থ করে তোলে। এ ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রাচীন মহিলার অবদান উল্লেখ করে লাভ কি? দেখতে হবে যে, যেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সেখানে সকল নারী মানানসই হবে কি? সম্প্রতি মিসরের সরকারী ও বাণিজ্যিক মহল অভিযোগ তুলেছে যে, সেখানে কর্মরত সর্বমোট এক লক্ষ দশ হাজার মহিলা কর্মোপযোগী প্রমাণিত হচ্ছেনা। পুরুষের তুলনায় তাদের তৎপরতা শতকরা ৫৫ বাগের বেশি নয়। মিসরের

বাণিজ্যি মহলের সর্বব্যাপী অভিযোগ এই যে, নারীদের কাছে কোনো কিছুর গোপনীয়তা রক্ষিত হয়না। পাশ্চাত্য জগতে গোয়েন্দাগিরি ফাঁস হবার যেসব ঘটনা ঘটে, তাতে সাধারণত কোনো না কোনোভাবে মহিলারা জড়িত থাকে।

ইসলাম নারী শিক্ষায় বাধা দেয়না। যতো উচ্চ শিক্ষা সম্ভব তাদের দেয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, তবে কয়েকটা শর্ত আছে। প্রথমত, তারা নিজেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পারে, এমন শিক্ষাই তাদেরকে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষা চলবেনা। নারীদেরকে নারীদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকা দ্বারাই শিক্ষা দিতে হবে। সহশিক্ষার সর্বনাশা কুফল পাশ্চাত্য জগতে এমন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে যে, এখন যাদের জ্ঞানচক্ষু একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, তারা ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকায় ১৭ বছর পর্যন্ত বয়সের যে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়ে, সহশিক্ষার কারণে প্রতি বছর তাদের মধ্য থেকে গড়ে এক হাজার জন গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যদিও এ পরিস্থিতি এখনো আমাদের দেশে দেখা দেয়নি তবে সহশিক্ষার কিছু কিছু কুফল আমাদের এখানেও দেখা দিতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত, উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদেরকে এমন প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগ করতে হবে, যা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহিলা হাসপাতাল ইত্যাদি। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৪র্থ খন্ড)

সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষা কার্যক্রম

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সরকার কি নারী স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে শক্তি প্রয়োগে দমন করবে? বিচিত্র সাজসজ্জা, অর্ধ নগ্ন পোশাক ও নিত্য নতুন ফ্যাশনের প্রবণতায় যেভাবে আধুনিকা নারীরা মেতে উঠছে, বিশেষত যুবতী মেয়েরা অত্যন্ত আঁটসাঁট ও মনমাতানো সুরভিত পোশাকে ভূষিত হয়ে রঙ বেরঙের প্রসাধনী শোভিত হয়ে এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উঁচুনীচুর প্রদর্শনী করে যেভাবে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং আজকাল উঠতি বয়সের ছেলেরাও হলিউডের ছায়াছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেভাবে টেডি বয় সেজে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি প্রত্যেক মুসলিম ও অমুসলিম তরুণ তরুণীর লাগামহীন বেলেল্লাপনা রোধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবে? আইন লংঘনে তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং অভিভাবকদেরকে জরিমানা করবে? এটা করলে আবার তাদের নাগরিক অধিকার কি ক্ষুণ্ন হবেনা? গার্লস গাইড, মহিলা সমিতি, ওয়াই এম সি এ (খৃস্টান যুব সমিতি) ওয়াই ডব্লিও সি এ (খৃস্টান যুবতি সমিতি) ইত্যাকার প্রতিষ্ঠান কি ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় বরদাশত করা হবে? নারীরা কি

আদালত থেকে নিজেই তালাক নিতে পারবে এবং পুরুষদের একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হবে? ইসলামী আদালতের সামনে কি যুবক যুবতীরা কোর্ট ম্যারেজ (civil marriage) করার অধিকারী হবে? নারীদের যুব উৎসব খেলাধুলা, প্রদর্শনী, নাটক, নৃত্য, ছায়াছবি অথবা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কিংবা বিমানবালা হওয়ার ওপর কি ইসলামী সরকার নিসেধাজ্ঞা আরোপ করবে? জাতীয় চরিত্র বিধ্বংসী সিনেমা, টেলিভিশন ও রেডিওতে অশ্লীল গান, অশ্লীল বইপুস্তক, বাজনা, নাচ ও ঢলাঢলিতে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কি বন্ধ করে দেয়া হবে, না এগুলোকে কল্যাণমূলক খাতে প্রবাহিত করা হবে?

জবাব ঃ ইসলাম সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষার সকল কার্যক্রম কেবল আইনের ডান্ডার জোরে চালায়না। শিক্ষা, প্রচার ও জনমতের চাপ ইসলামের সংস্কার কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এসকল উপায় উপকরণ প্রয়োগের পরও যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে ইসলাম আইনগত ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয়না। নারীদের নগ্নতা ও বেহায়াপনা আসলেই একটা মারাত্মক ব্যাধি। কোনো যথার্থ ইসলামী সরকার এটা সহ্য করতে পারেনা। সংশোধনের অন্যান্য পন্থা প্রয়োগে যদি এ ব্যাধি দূর না হয়, কিংবা তার কিছুটা অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলে আইনের সাহায্যে তা রোধ করতেই হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এর নাম যদি 'নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা' হয়, তাহলে জুয়াড়িদের ধরপাকড় করা এবং পকেটমারদের শাস্তি দেয়াও নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতেই হয়। ব্যক্তি নিজের স্বভাবগত অসৎ প্রবণতা এবং অন্যদের কাছ থেকে শেখা অপকর্ম দ্বারা সমাজকে দূষিত করবে-এজন্যে তাকে বলগাহীন ছেড়ে দেয়া যেতে পারেনা।

গার্লস গাইডের স্থান ইসলামে নেই। মহিলাদের সমিতি থাকতে পারে। তবে শর্ত এই যে, মহিলাদের মধ্যেই তার তৎপরতা সীমিত রাখতে হবে এবং মুখে কুরআনের বুলি কপচানো আর কাজে কুরআনাবিরোধী দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। খৃস্টান যুবতী সমিতি খৃস্টান তরুণীদের জন্য থাকতে পারে। কিন্তু কোনো মুসলিম নারীকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা। মুসলিম নারীরা যদি ইসলামী বিধানের আওতায় থেকে মুসলিম তরুণী সমিতি বানাতে চায় তবে বানাতে পারে।

মুসলিম নারী ইসলামী আদালতের মাধ্যমে 'খুলা' বিধির আওতায় বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। বিয়ে বাতিলকরণ (Nullificatioin) এবং চির বিচ্ছেদ (Judicial seperation) এর ঘোষণাও আদালত থেকে লাভ করতে পারে। তবে শর্ত হলো, শরীয়তের বিধি মোতাবেক এ ধরনের

কোনো ঘোষণা অর্জনের যোগ্যতা তার মধ্যে থাকা চাই। কিন্তু তালাক (Divorce) এর ক্ষমতা কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শুধু পুরুষকেই দেয়া হয়েছে। পুরুষের এই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো আইনের নেই। কুরআনের নাম ভাঙ্গিয়ে যদি কুরআন বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা। তালাক দেয়ার ক্ষমতা পুরুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কোনো আদালত বা পঞ্চায়েত তাতে নাক গলাবে, এমন ধারণা রসূল সা.-এর যুগ থেকে শুরু হয়ে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত গোটা ইসলামের ইতিহাসে অপরিচত। এ ধারণা সরাসরি ইউরোপ থেকে আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। যারা এটা আমদানি করেছে তারা একটিবারও চোখ মেলে দেখেনি যে, ইউরোপে তালাকের এ আইনের পটভূমি কি ছিলো এবং সেখানে এর কি কি কুফল দেখা দিয়েছে। ঘরোয়া কেলেংকারীর হাড়ি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে হাটে বাজারে গিয়ে ভাঙবে, তখন আল্লাহর আইন সংশোধন করতে যাওয়ার পরিণতি কি হয় তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

পুরুষদের একাধিক বিয়ের ওপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ বা তা রোধ করার ধারণাও একটা বিদেশী পণ্য, যাকে কুরআনের ভুয়া লাইসেন্স দেখিয়ে আমদানি করা হয়েছে। এটা এসেছে এমন সমাজ থেকে, যেখানে কোনো মহিলাকে যদি বিবাহিত স্ত্রীর উপস্থিতিতে রক্ষিতা করে রাখা হয়, তাহলে সেটা শুধু সহনীয়ই নয়, বরং তার অবৈধ সন্তানের অধিকার সংরক্ষণের কথাও ভাবা হয় (ফ্রান্সের উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে)। অথচ সেই মহিলাকেই যদি বিয়ে করা হয় তাহলে সেটা হয়ে যায় অপরাধ। যেনো যতো কড়াকড়ি কেবল হালালের বিরুদ্ধে, হারামের বিরুদ্ধে কিছুই নয়। আমার প্রশ্ন হলো, কেউ যদি কুরআনের 'ক'ও জানে তবে সে কি এই মূল্যবোধ (value) গ্রহণ করতে পারে? ব্যভিচার আইনত বৈধ হবে আর বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ হবে, এমন উদ্ভট দর্শন কি তার কাছে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে? এ ধরনের আইন প্রণয়নের একমাত্র পরিণাম এই হবে যে, মুসলমানদের সমাজে ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হবে, বান্ধবী ও রক্ষিতার সংখ্যা বাড়বে, কেবল দ্বিতীয় স্ত্রীর অস্তিত্ব থাকবে না। এ ধরনের সমাজ কাঠামোগত দিক দিয়ে ইসলামের আসল সমাজ থেকে অনেক দূরে এবং পাশ্চাত্য সমাজের অনেক কাছাকাছি হবে। এ ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে করো ভালো লাগে তো লাগুক, কোনো মুসলমানের কাছে এটা ভালো লাগতে পারেনা।

কোর্ট ম্যারেজের প্রশ্ন কোনো মুসলিম নারীর বেলায় যে ওঠেইনা, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এ প্রশ্ন ওঠে কেবল কোনো মোশরেক, খৃস্টান কিংবা ইহুদী নারীকে বিয়ে করার বেলায়। এ ধরনের বিধর্মী মহিলা ইসলামী আইনমতে

ইসলাম গ্রহণপূর্বক কোনো মুসলমানকে বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকেনা। অথচ মুসলমান পুরুষ তার প্রেমে মজে গিয়ে কোনো ধর্মের কড়াকড়ি তাকে মানতে হবেনা, এই অঙ্গীকার দিয়ে তাকে বিয়ে করে। এ ধরনের কাজ কারোর যদি করতেই হয় তবে তার ইসলামের ফতোয়া নেয়ার প্রয়োজন পড়ে কিসে? ইসলাম তার অনুগত লোককে এ কাজের অনুমতি কেন দেবে? মুসলমানদের এ ধরনের বিয়ে দেয়াটা ইসালামী আদালতের দায়িত্ব হলোই বা কবে থেকে?

একটা ইসলামী সরকারও যদি যুব উৎসব (Youth festival), খেলাধুলা, নাটক, নচগান ও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মুসলিম নারীদের টেনে আনে অথবা বিমানবালা নিয়োগ করে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের কাজ নেয়, তাহলে আমি জানতে চাই যে, ইসলামী সরকারের আর প্রয়োজন কি? এসব কাজ তো কুফুরি সমাজে এবং কাফের শাসিত রাষ্ট্রে সহজেই হতে পারে। সেখানে বরং এ কাজ আরো অবাধে হওয়া সম্ভব।

সিনেমা, ফিল্ম, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টি করা জাগতিক শক্তি ছাড়া কিছু নয়। এগুলোতে সৃষ্টিগতভাবে দোষের কিছু নেই। এগুলোর চরিত্র বিধ্বংসী ব্যবহারটাই শুধু দূষণীয়। এগুলোকে মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা এবং নৈতিক বিচ্যুতির কাজে ব্যবহরের পথ বন্ধ করাই ইসলামী সরকারের কাজ। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৬২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৪র্থ খন্ড)

৫

বিয়ে-শাদী ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

নিকাহ্ শব্দের অর্থ

প্রশ্ন ঃ ১৯৬২ সালের মার্চ সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে লিখিত তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে আপনি যেসব শরয়ী হুকুম আহ্কাম উদ্ভাবন করেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই নিকাহ্ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, কুরআন নিকাহ্ শব্দের অর্থ শুধু আক্দকেই বুঝিয়েছে অথবা পারিভাষিক অর্থে নিকাহ্কে শুধুমাত্র আক্দের জন্য ব্যবহার করেছে। এই মতামত আমাদের এখানকার বহুল প্রচলিত ফিক্হী মতবাদ অর্থাৎ হানাফী আলেমদের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়, আর অধিকাংশ মুফাস্সিরদের ব্যাখ্যারও খেলাফ। আশ্চর্য, আপনি এমন একটি কথাকে "সামগ্রিক বিধি" হিসেবে ব্যক্ত করেছেন, যার পক্ষে এ পর্যন্ত অন্য কেউ মত প্রকাশ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়না।

জবাব ঃ নিকাহের আভিধানিক অর্থ কি, সে বিষয়ের আলোচনা বেশ দীর্ঘ। এ বিষয়ে আরবি ভাষাবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। নিকাহের আসল অর্থ সম্পর্কে আলেমদের একদলের মত হচ্ছে, এ শব্দটি শাব্দিক দিক দিয়ে সহবাস এবং আক্দ উভয়ের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত। আর এক দলের অভিমত, অর্থের দিক দিয়ে শব্দটি উভয় অর্থে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তৃতীয় দল বলেন, এর আসল অর্থ বিবাহ বন্ধন (আক্দ), আর সহবাস হলো এর রূপক ব্যবহার। চতুর্থ দলের কথা হলো, এর আসল অর্থ সহবাস করা, আর আক্দ রূপক অর্থে ব্যবহার। কিন্তু রাগেব ইসফাহানী পরিপূর্ণ জোর দিয়েই এ দাবি করেছেন যে, 'আক্দ'ই নিকাহ্ শব্দের মূল অর্থ। তারপর ব্যবহারিক অর্থে একে সহবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সহবাসের অর্থে যতোগুলো শব্দ আরবি এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে সবগুলোই অশ্লীল। কোনো শরীফ লোক কোনো ভদ্রমণ্ডলীর বৈঠকে এ শব্দটিকে মুখে উচ্চারণ করাই পছন্দ করবেনা। এখন এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, যে শব্দটি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ এক কাজের জন্য সৃষ্ট সেটাকে সমাজের বিয়ে-শাদীর জন্য রূপকভাবে কিংবা অপ্রকৃতভাবে ব্যবহার করা হবে। এ অর্থ বুঝার জন্য দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষায় শালীন শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে, অশ্লীল শব্দাবলী নয়।

সাধারণত হানাফী আলেমগণ এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ বলেন, সহবাস আর রূপক অর্থ বলেন 'আক্‌দ'। কিন্তু এটাও হানাফীদের ঐক্যমত নয়, হানাফী শায়খদের কেউ কেউ এ শব্দের অর্থ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, এটা সহবাস ও আক্‌দ দুই অর্থেই মৌলিকভাবে গণ্য। তারপর তাদের মতে নিকাহের 'শরয়ী' পরিচয় হচ্ছে ঃ

هُوَعَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا অথবা عَقْدٌ وَضَعَ لِتَمْلِيْكِ مَنَافِعُ الْبُضْعِ

(অর্থাৎ, বিয়ে এমন এক পারস্পারিক 'বাঁধন' বা 'চুক্তি', যার অন্তরালে মিলন তথা সহবাসের অধিকার অর্জিত হয়। কিংবা বিয়ে এমন এক আক্‌দ বা বন্ধন, যাকে সহবাসের অধিকার বর্তানোর বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে)।

আমার মতে নিকাহ্ কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বর্ণিত একটি পারিভাষিক শব্দ। বিবাহ বন্ধনই এর অনিবার্য অর্থ এবং একে সাধারণভাবে ব্যবহার করতে গেলে, এর এই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। তবে এর মধ্যে যদি এমন কোনো ইঙ্গিত থাকে, যদ্বারা সহবাস অথবা আক্‌দ্ ও সহবাস দু'টিই বুঝানো হয়েছে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এখন রইলো এর আভিধানিক অর্থ। আক্‌দ্ ছাড়াই আভিধানিক অর্থে যদিও নিকাহের অর্থ সহবাস বলা যেতে পারে, কিন্তু আক্‌দ্ না করেই 'সহবাস' করাকে কুরআন হাদীস নিকাহ্ বলে স্বীকার করে নিয়েছে, এমন উদাহরণ আমার জানা নেই। আপনার জানা থাকলে পেশ করতে পারেন।

(এর জবাবে প্রশ্নকারী বিভিন্ন ফিকাহ্‌র কিতাব থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি লিখে পাঠান। তার জবাব নিম্নলিখিতরূপে দেয়া হয়)।

আফসোস, কোনো বিষয়ের দীর্ঘ জবাব দানের অবসর আমার নেই। তা সত্ত্বেও আরেকবার আমার দাবিকৃত কথাটি সংক্ষিপ্তভাবে স্পষ্ট করে দিচ্ছি। এর পরেও আপনার মনে প্রশান্তি না আসলে আমার আর কিছুই করার নেই। আপনি নিজের মতের উপর কায়েম থাকতে পারেন আর আমি আমার মতের উপর।

নিকাহের দ্বারা 'আক্‌দ্' এবং 'আকদের পর সহবাস' অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনার কোনো মতভেদ নেই। মতবিরোধ শুধু এই ব্যাপারে যে, বিনা আকদে সহবাস অর্থে কি নিকাহ্ শব্দ ব্যবহার করা যাবে? এ অর্থ গ্রহণ করতে আমার আপত্তি আছে। সে অবস্থায় সহবাসের জন্য জেনা ও সাফাহ্ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। আর সে অশ্লীল কাজের জন্য নিকাহ্ শব্দটি ব্যবহার জায়েয স্বীকার করার জন্যে আপনি যে দলীলগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার থেকে আরও মজবুত দলীল প্রয়োজন।

এটাও গ্রহণযোগ্য কথা নয় যে, নিকাহ্ শব্দটি মূলত সহবাসের জন্যই গঠন

করা হয়েছিল, পরে মূল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। সঙ্গম কাজের জন্য দুনিয়ার সব ভাষাতেই যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (অর্থাৎ, যার দ্বারা পরোক্ষ বা আকারে ইঙ্গিতে না বুঝিয়ে অবিকল ঐ কাজটিকেই বুঝায়), তা শ্রুতিকটু ও অশ্লীল এবং কোনো ভাষাতেই তা 'আক্‌দ' এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। উর্দূ ও বাংলা ভাষায় সে কাজের জন্য যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, বিয়ের অর্থে সে শব্দ কেউ ব্যবহার করবে কি?

আপনার উদ্ধৃত বরাতগুলোর মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, নিকাহ্ শব্দের প্রকৃত অর্থ মিলন। এখন একথা কি গ্রহণযোগ্য যে, শব্দটি (আক্‌দ হোক বা না হোক) শুধুমাত্র সঙ্গমক্রিয়ার জন্যই চালু হয়েছিল?

নিঃসন্দেহে অভিধানে এ ধরনের উদাহরণ পাওয়া যাবে, যার দ্বারা এ শব্দটির অর্থ শুধু সঙ্গমই বুঝানো হয়েছে, কিন্তু তা এ কথার দলীল হতে পারেনা যে, এ শব্দটির আসল তাৎপর্য হচ্ছে সঙ্গম এবং 'আক্‌দ'-এর জন্য এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কুরআন ও হাদীস থেকে আপনি যে উদাহরণগুলো পেশ করেছেন, সেগুলোকে একটু চিন্তা করে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে, তার মধ্যে একটি উদাহরণও এমন নেই, যার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন, আমি যিনা দ্বারা নিষিদ্ধ সহবাস মনে করি। কিন্তু আমার মতে কুরআনের আয়াত-

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ

(তোমাদের পিতারা যাদেরকে নিকাহ করেছে, তাদেরকে নিকাহ করোনা)

-এ আয়াতের অর্থ এটা হতে পারেনা, যেসব মহিলার সাথে তোমাদের পিতারা যিনা করেছে, তাদের সাথে যিনাও করোনা, 'আক্‌দ'ও করোনা। বরং আমি এর এ অর্থ গ্রহণ করি যে, যার সাথে পিতার নিকাহ্ হয়েছে, তার সাথে ছেলের নিকাহ হতে পারেনা। অবশ্য স্বভাবতই এ দ্বারা এ অর্থও বের হয় যে, পিতার সাথে কোনো মহিলার যে কোনোভাবে যৌন সম্পর্ক হয়ে গেলে, সে মহিলা ছেলের জন্য হারাম এবং ছেলের সাথে কোনো মহিলার এ ধরনের সম্পর্ক হয়ে গেলে, সেও পিতার জন্য হারাম। نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُوْنٌ- এ হাদীস অংশের অর্থও আমি এটাই বুঝি যে, হুজুর সা. "নাকেহুল ইয়াদ" বলে হস্তমৈথুনকারীকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ, অভিশপ্ত হস্তমৈথুনকারী নিজের হাতকেই যেনো বিয়ে করলো। এখানে নাকেহ্ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর হস্তমৈথুনকারীকে নিজের হাতকে নিকাহকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণগুলোর এই ধরনের ব্যাখ্যা করা যায়। (তরজমানুল কুরআন, খন্ড ৫৮, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ইং, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৪র্থ খন্ড)

কতিপয় নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হবার কারণ

প্রশ্ন ঃ গত কয়েকদিন থেকে বন্ধুদের সাথে হারাম সম্পর্কিত একটি বিষয়ের আলোচনা চলছে। নিম্নে সে বিষয়টি উদ্ধৃত করছি। আশা করি, আপনি এর উপর আলোকপাত করে আমাদেরকে বাধিত করবেন।

বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে কেন? একটি মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে আবার অন্য একটি মেয়েকে হারাম করা হয়েছে। অথচ মানব জাতির সূত্রপাতের প্রথমাবস্থায় এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ দৃষ্টিগোচর হয়না, যেমন হাবিল ও কাবিলের কাহিনী থেকে জানা যায়। এর কারণ কি? এ ধরনের বিয়ে কি শারীরিক অনিষ্টতার কারণ হতে পারে?

আশা করি, আপনি তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এর জবাব দেবেন। তাহলে অন্যান্য ভাইয়েরাও এ থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

জবাব ঃ যেসব নারীকে বিয়ে করা হারাম ঘোষিত হয়েছে, তাদের হারাম হবার কারণ শারীরিক অনিষ্টকারিতা নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক অনিষ্টকারিতার কারণে তাদেরকে হারামের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, যে মা নিজের ছেলের ব্যাপারে যৌন আবেগ অনুভব করে, সে মা কি মা ও ছেলের সম্পর্কের মধ্যে যে পবিত্র আবেগ-অনুভূতি প্রয়োজন তার সাহায্যে ছেলেকে লালন-পালন করতে পারে? অন্যদিকে বর্তমানে মা ও ছেলের মধ্যে যে নিষ্কলুষ ও নির্দোষ অসংকোচভাব বিদ্যমান, ছেলে বুদ্ধি-বিবেক ও যৌবনের সীমান্তে পদার্পণ করার পর পূর্বোক্ত অবস্থায় কি মায়ের সাথে তেমন নিষ্কলুষ অসংকোচভাব বজায় রাখতে সক্ষম হতো? মা ও ছেলের মধ্যে যদি চিরন্তন হারামের প্রাচীর না উঠানো হতো, তাহলে কি একই গৃহে পিতা ও পুত্রের মধ্যে রেষারেষি ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হতোনা?

ভাইবোনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাদের মধ্যে যদি চিরন্তন হারামের প্রাচীর দাঁড় করানো না হতো, তাহলে তারা ভাইবোনে কি পরস্পরের সাথে নিষ্কলুষ সম্পর্ক স্থাপন ও কামনামুক্ত ভালোবাসা পোষণ করতে এবং সকল সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে অসংকোচে মেলামেশা করতে পারতো? এ অবস্থায় ছেলেমেয়ে যৌবনের সীমান্তে পদার্পণ করার পর কি পিতামাতার পক্ষে তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক না রাখা সম্ভব হতো? কোনো ব্যক্তিও কি কোনো মেয়েকে বিয়ে করার সময় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারতো যে, মেয়েটি তার ভাইদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে?

অতপর যদি শ্বশুর ও পুত্রবধুর মধ্যে এবং শ্বাশুড়ী ও জামাতার মধ্যে হারামের প্রাচীর দাঁড় না করানো হতো, তাহলে পিতা ও পুত্র এবং মাতা ও

কন্যাকে পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা, রেষারেষি ও হিংসা এবং পরস্পরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা থেকে নিষ্কৃতি দান কেমন করে সম্ভব হতো?

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন, একটি গৃহ, একটি পরিবার ও একটি সমাজ গন্ডির আওতায় যে সমস্ত পুরুষ ও মেয়ের মধ্যে স্বভাবত নিকটতর ও নিঃসংকোচ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং সামাজিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠাই স্বাভাবিক, শরীয়ত কোন্ কোন্ গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও সামাজিক কারণে তাদেরকে পরস্পরের জন্যে হারাম করে দিয়েছে? পিতা-মাতা যদি পুত্র-কন্যার দিক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পারে যে, তাদের মধ্যে কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক নেই, তাহলে পুত্র-কন্যা প্রতিপালিত হতে পারেনা, ভাইদের ব্যাপারে বোনদের ও বোনদের ব্যাপারে ভাইদের মধ্যে যদি যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীতার পথ চিরতরে বন্ধ না করে দেয়া হতো, তাহলে একই গৃহে ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন সম্ভব হতোনা। খালা ও ফুফী এবং চাচা ও মামাকে যদি সকল প্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে না রাখা যায়, তাহলে বোন নিজের ছেলে মেয়েদেরকে নিজের ভাইবোনদের থেকে এবং ভাই নিজের ছেলেমেয়েদেরকে নিজের ভাইবোনদের থেকে দূরে রাখার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৫১, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খণ্ড)

বিয়েতে কুফু

প্রশ্ন ঃ তর্জমানুল কুরআনের যিলকদ-যিলহজ্জ ১৩৭০ সংখ্যায় মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী সাহেবের জবাবে একস্থানে আপনি এমন অস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন যা বুঝার উপযোগী নয়। সম্মানিত মাওলানা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন একজন সাইয়েদ হিন্দুস্থানে থেকে যাওয়ার কারণে সাইয়েদ থাকবে নাকি তাঁতী হয়ে যাবে? আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যখন দেখি, আপনিও এই অনৈসলামী তারতম্যকে চাপাকণ্ঠে এ বলে স্বীকার করে নিলেন যে, "দারুল কুফরের একজন সাইয়েদ এবং দারুল ইসলামের একজন সাইয়েদ বংশ মর্যাদার দিক থেকে সমান ঠিকই।" আপনার শব্দাবলী অস্পষ্ট। আপনিও কি কুফুর মাসয়ালাটিকে ইসলামে জায়েয মনে করেন? যদি জবাব হ্যাঁ সূচক হয় তবে কুরআন ও হাদীসের দলিল পেশ করে আমাকে নিশ্চিন্ত করবেন। বুঝতে পারছিনা দুনিয়ার কাজকর্ম ও পেশা মানবতার উঁচু-নীচু মর্যাদা নির্ণয়ে কেমন করে প্রবেশ করলো। সমগ্র মানব জাতি আদমের আ. সন্তান। হযরত দাউদ আ. যদি লোহা-লক্কড়ের কাজ করে থাকেন তাহলে কি তিনি কামার বলে গণ্য হবেন?

জবাব ঃ আপনি কুফুর মাসয়ালা সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন তার সাথে আমি একমত নই। ব্যাখ্যার পদ্ধতির মধ্যে মত পার্থক্য থাকতে পারে।

কিন্তু স্বয়ং কুফুর মাসয়ালাটি তো বুদ্ধি-বিবেক ও রেওয়াত উভয় দিক দিয়েই প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থেকে শুধু এতোটুকুই বলতে চাই– বিবাহে কুফু নির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে চারজন ইমামই ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ মাসয়ালার ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন হাদীস। যেমন ঃ

لَاتَنْكِحُوا النِّسَاءَ اِلَّا الْاَكْفَاءِ– (دارقطنى، بيهقى)

কুফুর (সমতার) ভিত্তি ছাড়া তোমরা মেয়েদের বিবাহ দিওনা। (দারে কুতনী ও বায়হাকী)

يَاعَلِىُّ ثَلَاثٌ لَاتُؤَخِّرْهَا– اَلصَّلوٰةُ اِذَا اَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ، وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدَتْ كِفَاءً– (ترمذى، حاكم)

"হে আলী! তিন কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়। এক. নামায, যখন তার সময় হয়। দুই. জানাযা, যখন তা তৈরী হয়ে যায় এবং তিন, অবিবাহিতা মেয়ে, যখন তার কুফু মিলে যায়।" (তিরমিযী ও হাকেম)

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوْا الْاَكْفَاءَ–

"নিজের বংশ সৃষ্টির জন্যে ভালো স্ত্রী তালাশ করো। মেয়েদের বিবাহ এমন পুরুষদের সাথে দাও যাদের সাথে কুফু হয়।"

(এ হাদীসটি হযরত আয়েশা রা. আনাস রা. উমর বিন খাত্তাব রা. প্রমুখ থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে)।

ইমাম মুহাম্মদ কিতাবুল আসারে হযরত উমরের রা. এ কথাকেও উল্লেখ করেছেন ঃ

لَاَمْنَعَنَّ فُرُوْجَ ذَوَاتِ حِسَابٍ اِلَّامِنَ الْاَكْفَاءِ–

"আমি ভদ্র ঘরের মেয়েদের কুফু ছাড়া বিবাহ দিতে অবশ্যই নিষেধ করবো।"

এগুলো হলো এ মাসয়ালার বর্ণনাগত দলিল। আর বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল সুস্পষ্টভাবে একথাই দাবি করে যে, কোনো মেয়েকে কোনো ছেলের সাথে বিবাহ দেয়ার সময় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে জুড়ি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কি হবে না, তা যাচাই করে দেখতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে আশা করা যায়না যে, উভয়ের বিবাহিত জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। যুক্তি ও বর্ণনাগত দিক থেকে বিবাহের উদ্দেশ্য এটাই স্থিরিকৃত হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি থাকবে। তারা একে অপরের কাছে পাবে অনাবিল শান্তি। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, একটি অসম ও বেমিল দম্পতির বিবাহোত্তর জীবন থেকে এ উদ্দেশ্য লাভ করার আশা কতোটুকু করা যায়? এমন কোনো বুদ্ধিমান লোক আছে কি, যে নিজের মেয়েকে বিবাহ দেয়ার সময় সমতা বা মিল তথা তাদের মিলেমিশে জীবন নির্বাহ করার বিষয়টা

সামনে রাখেনা? আপনি কি ইসলামী সাম্যের অর্থ এ বুঝেছেন যে, প্রত্যেক স্ত্রী লোককে প্রত্যেক পুরুষের সাথে এবং প্রত্যেক পুরুষকে প্রত্যেক স্ত্রী লোকের সাথে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য ছাড়াই শুধুমাত্র এ জন্যে বিবাহ দিতে হবে যে, তারা মুসলমান?

ফকীহগণ এ সামঞ্জস্যের তাৎপর্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকতে হবে সেগুলো তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পদ্ধতিতে বর্ণনা করছেন। এসব ব্যাখ্যা বিবৃতির মধ্যে কোনো কোনো ফিকাহবিদদের সাথে আমরা মতবিরোধ করতে পারি। আবার কারো কারো সাথে একমত পোষণ করতে পারি। তবে মোটামুটিভাবে সাধারণ জ্ঞানের দাবি হলো সারা জীবনের অংশীদারী ও বন্ধুত্বের জন্যে যে দুটি জীবনের একটিকে অপরটির সাথে জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদের মধ্যে চরিত্র, দীন, বংশ সামাজিক নিয়ম পদ্ধতি, মানমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির সামঞ্জস্য দেখতে হবে। এসব বিষয়ে যদিও পুরোপুরি সামঞ্জস্য না হয়, তবে অন্তত এতোটা ব্যবধান যেনো না থাকে, যার কারণে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন করতে অক্ষম হবে। এটা মানব সমাজের একটি বাস্তব সমস্যা এবং এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

সমগ্র আদম সন্তান এক ও সমান হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি আপনি এখানে প্রয়োগ করতে চাইলে লক্ষ লক্ষ পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি আপনি একথা বলেন যে, নিছক বংশ ও কৌলিণ্যের ভিত্তিতে গোত্র ও উঁচু-নীচু হওয়ার ধারণা একটি জাহেলী ধারণা। তাহলে একথায় আমি অবশ্যই আপনার সাথে একমত। যারা কুফুর ধারণা বিকৃত করে হিন্দুদের মতো কিছু উঁচু কিছু নীচু জাত-পাত ঘোষণা করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে আমারও তেমনি অভিযোগ, যেমন আপনার। (তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খণ্ড)

নাবালেগের বিয়ে

প্রশ্ন ঃ আমার মতে নাবালেগ বালক বালিকার বিয়ে অবৈধ। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?

জবাব ঃ কেউ যদি নিজের শরীয়ত নিজে তৈরী করে নেয়, তবে তার কথা আলাদা। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে একাজ বৈধ। কুরআনে হাকীমে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান রয়েছে যে, যেসব নারীর এখনো মাসিক আরম্ভ হয়নি সেসব নাবালেগ বালিকারা এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, বিয়ে ব্যতীত বালিকাদের তালাক এবং তালাকের ইদ্দতের প্রশ্নই ওঠেনা। কেউ যদি কুরআন হাদীসের বিধান থেকে মুক্ত হয়ে বলে ঃ "আমার মত

এরূপ এরূপ" তবে এটা মুসলমানের কাজ নয়। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খণ্ড)

বালেগা মেয়ের জন্যে নিজের বিয়ে নিজে করা কি বৈধ?

প্রশ্ন ঃ "হানাফী ও আহ্‌লে হাদীস আলেমদের মধ্যে অলী ছাড়া বালেগা মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে সাধারণভাবে মতপার্থক্য আছে। হানাফীগণের মতে বালেগা মেয়ে অলীর অনুমতি ছাড়াই নিজের বিবাহ নিজে করতে পারে। এমনকি অলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিয়ে করতে পারবে। এতে অলীদের আপত্তি করার কোনো অধিকার নেই। অন্যদিকে আহ্‌লে হাদীসের মতে এ ধরনের বিবাহ বাতিল গণ্য হবে। তারা বলেন, অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে বিনা দ্বিধায় দ্বিতীয় বিবাহ করা যায়। উভয় দলের দলিল প্রমাণ যা আমার সামনে রয়েছে, সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি। আমার আরয, এ ব্যাপারে আপনার গবেষণাপ্রসূত মতামত বিস্তারিত বর্ণনা করবেন।"

জবাব ঃ প্রশ্নকারী প্রশ্নের সাথে উভয় দলের দলিলসমূহ সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং আমি প্রথমত সেসব দলিল এখানে তুলে ধরছি ঃ

১. নিম্নলিখিত আয়াত ও হাদীসগুলো হানাফীদের দলিল ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ- (البقرة-٢٣٤

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে। তারপর যখন তারা নিজেদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথারীতি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।" (বাকারা ঃ ২৩৪)

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه-

"অতপর যদি (স্বামী তাকে তৃতীয়) তালাকও দিয়ে দেয় তবে এ স্ত্রী অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করা ছাড়া তার জন্য হালাল হবেনা।" (বাকারা ঃ ২৩০)

فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ- (البقره : ٢٣٢)

অতপর তোমরা ঐসব মহিলাকে নিজেদের ইচ্ছামতো স্বামী গ্রহণ করতে বাধা দিওনা, যখন তারা প্রচলিত রীতিতে পরস্পর সম্মত হয়ে যায়।" (বাকারা ঃ ২৩২)

عَنْ نَا فِع ابْنُ جُبَيْرٍعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلىَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأمَرُو اِذْنَهَا سُكُوْتَهَا وَفِىْ رَوَايَةِ اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا- (نصب الراية ۳۷۰ص)

নাফে ইবনে জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিধবা নিজের ব্যাপারে নিজেই অলীর চাইতে অনেক বেশী ফায়সালার অধিকার রাখে। কুমারীদের অনুমতি নিতে হবে। তাদের মৌনতাই অনুমতির লক্ষণ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ "ছাইয়েবাহ তথা পূর্ব বিবাহিতা নারী নিজের বিবাহের ব্যাপারে অলীর চেয়ে বেশী অধিকার রাখে।" (নসবুর রায়াহ ৩য় খন্ড ঃ ১৮২ পৃষ্ঠা)

عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ اِنَّ أَبِىْ اَنْكَحَنِىْ رَجُلاً وَاَنَاكَارِهَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لِاَبِيْهَا لاَ نِكَاحَ لَكَ اِذْهَبِىْ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتَ - (ايضًا)

"আবু সালমাহ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমার পিতা এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার বিবাহ দিয়েছেন, যাকে আমি পছন্দ করিনা। তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ বিবাহ দেয়ার ইখতিয়ার তোমার নেই। মেয়েটিকে বললেন ঃ যাও, যাকে ইচ্ছা বিয়ে করো।" (উক্ত গ্রন্থ)

روى من طريق مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن عائشة انها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذرابن زبير وعبدالرحمن غائب بالشام- فلما قدم عبدالرحمن قال ومثلئ يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذرابن زبيرفقال ان ذالك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ماكنت لأرُدَّ امرا قضيته فاستقرّت حفصة عند المنذر ولم يكن ذالك طلاق-

"মালিক আব্দুর রহমান বিন কাসিম থেকে, তিনি নিজের পিতা থেকে আর তিনি হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আব্দুর রহমানের কন্যা হাফসার বিবাহ মানযার ইবনে যুবায়েরের সাথে দিয়ে দেন। বিবাহের সময় আব্দুর রহমান সিরিয়ায় ছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন ঃ আমার

মতকে কি উপেক্ষা করা যাবে? তখন হযরত আশেয়া রা. মানযার ইবনে যুবায়েরের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ আব্দুর রহমানের হাতেই চূড়ান্ত ফায়সালার ভার ন্যস্ত। একথায় আব্দুর রহমান হযরত আয়েশাকে রা. বললেন ঃ যে ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাকে আমি কিছুতেই রদ করতে পারিনা। সুতরাং হাফসাহ্ মানযারের কাছেই থেকে যায় এবং এটা তালাক ছিলোনা। (উক্ত গ্রন্থ)

اخرجه ابو داؤد والنسائى ... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه عليه وسلم ليس لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ امر- (ايضا)

"আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিবাহিত নারীর উপর অলীর কোনো এখতিয়ার নেই।" (উক্ত গ্রন্থ)

اخرجه النسائى واحمد ..... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ اِلٰى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِىْ زَوَّجَنِىْ اِبْنَ اَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِىْ مِنْ خَسِيْسَتِهِ قَالَ فَجَعَلَ الْاَمْرَ اِلَيْهَا فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَجَزْتُ مَاصَنَعَ اَبِىْ وَلٰكِنْ اَرَدْتُ اَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ اَنْ لَيْسَ اِلٰى الْاٰبَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ-

"নাসায়ী ও আহমদ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, এক যুবতী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার পিতা তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে আমাকে শুধু এই উদ্দেশ্যে বিয়ে দেন যে, আমার সাহায্যে তিনি নিজেকে লাঞ্ছনামুক্ত করবেন। তিনি বিয়ে অটুট রাখা বা ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষমতা মেয়েটিকে দিয়ে দিলেন। মেয়েটি বললো ঃ আমার পিতা যা করেছেন তাকে আমি বৈধ গণ্য করলাম। আমার উদ্দেশ্য শুধু এতোটুকুই ছিলো যে, এ ক্ষেত্রে বাপের কোনো ইখতিয়ার নেই- সমস্ত মেয়েরা যেনো তা জেনে রাখে।"

২. আহলে হাদীসের আলিমগণ নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো পেশ করে থাকেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى عليه وسلم اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَاِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهَا -

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা নিজের অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হবে, তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে... সুতরাং যদি বিরোধ হয়, তাহলে যে মেয়ের অভিভাবক নেই সরকারই তার অভিভাবক। (বুলুগুল মারাম)

عَنْ اَبُو مُوسى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِىٍّ- (ايضًا)

"আবু মূসা নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'অলী ছাড়া বিবাহ হয়না'।" (উক্ত গ্রন্থ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (سنن كبرى للبيهقى)

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন মহিলা (অলী হয়ে) অন্য মহিলাকে বিবাহ দিতে পারেনা এবং কোনো মেয়ে নিজেই নিজের বিবাহের কাজ সম্পন্ন করতে পারেনা।" (সুনানে কোবরা লিলবায়হাকী)

قَالَ عُمَرَابْنُ الْخَطَّابِ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِىُّ اَوِ الْوَلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ- (ايضًا)

"হযরত উমর রা. বলেছেন ঃ যে মেয়ের বিবাহ অলী বা সরকার কর্তৃক সম্পন্ন হযনি তার বিবাহ বাতিল।" (উক্ত গ্রন্থ)

عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِد قَالَ جَعَلَتْ اِمْرَأَةٌ ثَيِّبٌ اَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِىٍّ فَاَنْكَحَهَا فَبَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا-

"ইকরামা ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত, একজন পূর্ব বিবাহিত নারী নিজের (দ্বিতীয় বিয়ের) ব্যাপারটি এমন একজন লোকের উপর ন্যস্ত করেছিল যে তার অলী ছিলোনা। অতপর লোকটি মহিলাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। হযরত উমর রা. একথা জানতে পেয়ে স্বামী ও বিবাহদানকারীকে দোররা মারার শাস্তি প্রদান করেন এবং বিয়ে বাতিল করে দেন। (উক্ত গ্রন্থ)

عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ لَانِكَاحَ اِلَّا بِاِذْنِ وَلِىٍّ- (ايضًا)

"হযরত আলী রা. বলেছেন ঃ যে মেয়ে নিজের অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তার বিবাহ বাতিল। অলীর অনুমতি ব্যতীত কোনো বিবাহ নেই।" (উক্ত গ্রন্থ)

عَنِ الشَّعْبِىِّ اَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رضى الله عنهما وشُرَيْحاً وَمَسْرُوْقًا رَحِمَهما الله قَالُوْا لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِىٍّ-(ايضا)

ইমাম শাবী থেকে বর্ণিত। হযরত উমর রা. ও হযরত আলী রা. এবং শুরাইহও মাসরূক রা. বলেছেন, অলী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই। (উক্ত গ্রন্থ)

উপরোল্লিখিত দলিলসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটা সহজেই অনুমিত হয় যে, উভয় পক্ষের বক্তব্যই যথেষ্ট জোরালো। একথা বলারও অবকাশ নেই যে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষের অভিমত সম্পূর্ণ বাতিল। এবার প্রশ্ন হতে পারে, রসূল বাস্তবিকই কি দু'টি স্ববিরোধী হুকুম দিয়েছিলেন? নাকি একটি হুকুম দ্বারা অন্য একটি হুকুমকে রহিত করে দেন? আর নাকি উভয় হুকুম একত্র করে রসূলের আসল উদ্দেশ্য কি ছিলো তা জানা যেতে পারে?

প্রথম কথাটি (অর্থাৎ রসূলের স্ববিরোধী হুকুম দেয়া) তো স্পষ্টই বাতিল। কারণ শরীয়তের সমগ্র কাঠামো শরীয়ত প্রণেতার পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ আর তাঁর থেকে স্ববিরোধী হুকুম জারী হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কথাটিও বাতিল। কেননা মানসুখ (রহিত) হওয়ার কোনো দলিল বা পূর্বাভাস নেই। এবার শুধু তৃতীয় অবস্থাটিই থাকে। এ অবস্থাটির উপর আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আমি উভয় পক্ষের দলিলসমূহ একত্র করার পর শরীয়ত প্রণেতার যে উদ্দেশ্য বুঝতে পেরিছি তা হলো ঃ

১. বিবাহের ব্যাপারে আসল দু'পক্ষ হলো বর ও কনে। তাদের অভিভাবকরা নয়। এ জন্য ইজাব ও কবুল বর ও কনের মধ্যেই হয়ে থাকে।

২. বালেগা মেয়ের (কুমারী বা অকুমারী) বিবাহ তার সম্মতি বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হতে পারেনা, বিবাহদানকারী তার বাপই হোক না কেন। যে বিবাহে মেয়ের সম্মতি নেই, সেখানে মূলত ঈজাবই অনুপস্থিত। তাহলে এরূপ বিবাহ কিভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে?

৩. কিন্তু শরীয়ত প্রণেতা এটাও বৈধ করেননি যে, মেয়েরা নিজেদের বিবাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সেচ্ছাচারী হয়ে যাবে কিংবা নিজেদের অভিভাবকের সম্মতির বিরুদ্ধে তারা যে ধরনের পুরুষকে ইচ্ছা বিবাহ করে স্বামীর মর্যাদায় নিজের খান্দানে আশ্রয় দেবে। এ জন্যে মেয়ের বিবহের ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতা তার নিজস্ব সম্মতির সাথে সাথে অভিভাবকের সম্মতিকেও জরুরী বলে সাব্যস্ত করেছেন। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজেই বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মেয়েদের জন্য যেমন ঠিক নয়, তেমনি মেয়ের সম্মতি ছাড়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়াও অভিভাবকের উচিত নয়।

৪. যদি কোনো অভিভাবক কোনো মেয়ের বিবাহ নিজেই দিয়ে দেয়, তবে এ বিবাহ মেয়ের সম্মতির উপর ঝুলন্ত থাকবে। যদি মেয়েটি তা কবুল করে তবে বিবাহ বৈধ হবে আর কবুল না করলে ব্যাপারটি আদালতের কাঠগড়ায় আসা উচিত। আদালত অনুসন্ধান করে দেখবে এ বিবাহে মেয়ের সম্মতি আছে কিনা? যদি মেয়ের সম্মতি নেই বলে প্রমাণিত হয় তাহলে আদালত তা বাতিল ঘোষণা করবে।

৫. যদি কোনো মেয়ে অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করে, তবে তার বিবাহ অলীর অনুমতির উপর ঝুলানো অবস্থায় থাকবে। অলী মঞ্জুর করলে বিবাহ অপরিবর্তিত থাকবে। আর মঞ্জুর না করলে এ ব্যাপারটিও আদালতে আসা উচিত। আদালত অনুসন্ধান করে দেখবে অলীর অস্বীকার ও অভিযোগ করার বুনিয়াদ কি? যদি বাস্তবিকই যুক্তিসঙ্গত কারণে ঐ পুরুষ লোকটির সাথে নিজের ঘরের মেয়ের জুড়ি অপছন্দনীয় হয় তাহলে এ বিবাহের বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে অলী জ্ঞাতসারেই অনীহা করেছে অথবা অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে টালবাহানা করতে থেকেছে এবং এ অবস্থায় মেয়েটি অনন্যোপায় হয়ে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করে নিয়েছে, তাহলে এমন অলীকে অসৎ ক্ষমতাসম্পন্ন ঘোষণা করা হবে এবং আদালতের পক্ষ থেকে বিবাহ বৈধ হওয়ার সনদপত্র দেয়া হবে।

هٰذَا مَاعِنْدِيْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ -

এটাই আমার অভিমত। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন। রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খণ্ড।

এক দেহীভূত যমজ বোনের বিবাহ

(নীচের যে প্রশ্নটির জবাব দেয়া হচ্ছে তার ভিত্তিতে একদল লোক কয়েক বছর থেকে লেখকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে আসছে যে, তিনি একই সঙ্গে দুই বোনের বিয়ে হালাল করে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি এ আলোচনাটি পাঠ করে নিজেই এ অপপ্রচারটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, দুই যমজ ভাই বা বোনের একদেহীভূত হওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। রিডার্স ডাইজেস্টের ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় সিরিয়ার একদেহীভূত যমজ ভাইয়ের কাহিনী দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন ঃ নিম্নলিখিত বিষয়টির জবাব দেবেন। জবাবটি কোনো সাক্ষাতকারীর মাধ্যমে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। বিষয়টি হলো ঃ

বাহাওয়ালপুরে দু'টি একদেহীভূত যমজ বোন আছে, অর্থাৎ জন্মের সময় তাদের কাঁধ, পার্শ্বদেশ ও কোমরের হাড় জোড়া ছিলো। কোনোক্রমে তাদেরকে আলাদা করা সম্ভব ছিলোনা। জন্মের পর থেকে এখন যৌবনে পদার্পণ পর্যন্ত তারা একত্রে চলাফেরা করছে। তাদের একই সঙ্গে ক্ষুধা লাগে, একই সঙ্গে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হয় এমনকি যদি তাদের একজন কোনো রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে অন্যজনও তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন পুরুষের সাথে তাদের দু'জনের বিয়ে হতে পারে কিনা? উপরন্তু তাদের দু'জনকে যদি একই সময়ে একই পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া যায়, তাহলে এর সপক্ষে শরীয়তের প্রমাণ উল্লেখ করবেন।

স্থানীয় আলেমগণ তাদেরকে একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দেবার অনুমতি দেননা, আবার দু'জন পুরুষের সাথে বিয়ে দিতেও আপত্তি করেন। একজন পুরুষের সাথে তাদের বিয়ে জায়েয না হবার সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে কুরআনের একটি আয়াত, যাতে বলা হয়েছে যে, দু'জন সাহোদর বোনের সাথে একই সময়ে একজন পুরুষ বিয়ে করতে পারেনা। ...এ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের ভিত্তিতে যদি দু'টি পুরুষের সাথে এই একদেহীভূত মেয়ে দু'টির বিয়ে দেয়া হয় তাহলে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলি দেখা দেয়। এগুলি প্রত্যক্ষ করে ওলামায়ে কেরাম নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অসুবিধাগুলো হলো ঃ

১. একজন পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রী পর্যন্ত নিজের যৌন সম্পর্কে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং অন্য যে মেয়েটির সাথে তার বিয়ে হয়নি তার সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েম করবেনা, এর নিশ্চয়তা থাকে কি?

২. এই দ্বিতীয় মেয়েটি তার বোনের সাথে একদহেীভূত হবার সাথে সাথে এক স্বভাব প্রকৃতিরও অধিকারী। কাজেই তার বোনের সাথে ঐ ব্যক্তির দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের সময় সে নিজেও কি প্রভাবিত হবেনা?

৩. দু'জন পুরুষের সাথে তাদের বিয়ে হলে দুই বোনই (যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সময়) তাতে প্রবাভিত হবে। তাদের লজ্জা আহত হবে, তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণা সৃষ্টি হবে, কাজেই এ ধরনের বিয়ে কি 'ওয়া জায়ালা বাইনাকুম মাওয়াদ্দাতান এবং ওয়া জায়ালা মিনহা যাওজাহা লিয়াসকুনু ইলাইহা' এ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিয়ের যে প্রাণশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তার বিরোধী নয়?

৪. বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি এবং সন্তান ও পিতামাতার

মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন। কিন্তু দু'জন পুরুষের এ বিয়ে এ সম্পর্কের মূলে কুঠারাঘাত হানে। এ ছাড়াও আরো বহু অনিষ্টকারীতা আছে সেগুলি এখানে বর্ণনা করা হলোনা।

মেহেরবানী করে শরীয়তের আলোকে এ সমস্যাটির সমাধান করুন। এ অচলাবস্থা দূর করুন। ঐ মেয়েদের পিতামাতা যেনো তাদের বিয়ে দিতে পারে এবং যৌবনে পদার্পণ করার কারণে যে ফিতনার সৃষ্টি হয়েছে তার দুয়ার যেনো বন্ধ হয়ে যায়।

জবাব ঃ এ মেয়ে দু'টির ব্যাপারে চারটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

এক. দু'জনের বিয়ে দু'টি পৃথক পৃথক পুরুষের সাথে দেয়া যেতে পারে।

দুই. তাদের একজনকে কোনো একজন পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং অন্যজনকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

তিন. দু'জনের বিয়ে একজন পুরুষের সাথে দেয়া যেতে পারে।

চার. দু'জনকে চিরকালের জন্যে বিয়ে থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

এর মধ্যে প্রথম পন্থা দু'টি এমন সুস্পষ্টভাবে অবৈধ, অযৌক্তিক ও অবাস্তব যে, এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। এখন শেষের দু'টি পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এ পন্থা দু'টি বাস্তবানুগ। কিন্তু এ দু'টির একটি পন্থা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু এর ফলে একই সময়ে দুই বোনকে বিয়ে করা হয় এবং কুরআনে এটিকে হারাম করা হয়েছে, তাই অবশ্যি সর্বশেষ পন্থাটিকে কার্যকরী করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে ওলামায়ে কেরামের একথাটি যথার্থ মনে হয়। কারণ মেয়ে দু'টি যমজ বোন এবং কুরআনে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একই সময়ে দুই বোনকে বিয়ে করা হারাম গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এখানে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয় ঃ

এক. এ মেয়ে দু'টিকে চিরকাল যৌন সম্পর্ক রহিত এবং বিবাহ থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য করা কি জুলুম নয়?

দুই. একটি মেয়ে জন্মগতভাবে যে বিশেষ ও অস্বাভাবিক অবস্থার সাথে জড়িত কুরআনের এ হুকুমটি কি সত্যিই তার সাথে সম্পৃক্ত?

আমার মত হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার এ ফরমানটি এ বিশেষ অবস্থাটির জন্যে নয়, বরং যে সাধারণ অবস্থায় দু'বোন আলাদা আলাদাভাবে জন্মগ্রহণ করে, সেই অবস্থার জন্যে ফরমানটি প্রদত্ত হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় যদি এক ব্যক্তি একই সময় দু'বোনকে বিয়ে করে তাহলে এ নির্দেশটি অমান্য করা হবে, অন্যথায় নয়। আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হচ্ছে, তিনি সাধারণ অবস্থার জন্যে নির্দেশ দান করেন এবং বিশেষ ও অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যে কোনো নির্দেশ না দিয়ে সামনে অগ্রসর হন। এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন

হলে সাধারণ নির্দেশকে হুবহু তার ওপর প্রয়োগ করার পরিবর্তে নির্দেশের রূপকল্পটি বাদ দিয়ে তার উদ্দেশ্যকে সংগত পদ্ধতিতে পূর্ণ করাই ফিকাহ জ্ঞানের পরিচায়ক।

এর নজীরস্বরূপ বলা যায়, রোজা সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন, সুবহে সাদেকের উদয়ের সাথে সাথে রোজা শুরু করতে এবং রাত শুরু হবার সাথে সাথে ইফতার করতে। পৃথিবীর যে সমস্ত এলাকায় চব্বিশ ঘন্টায় রাত দিন হয় সেসব এলাকার জন্যে এ নির্দেশটি প্রদত্ত হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি এসব এলাকায় থাকার দরুণ নির্দেশটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি এলাকার যেখানে রাত ও দিন কয়েক মাস পরিমাণ দীর্ঘ হয়, সেসব এলাকার বিশেষ অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি এ নির্দেশটি প্রয়োগ করেন তাহলে তিনি মস্ত বড় ভুল করবেন। এসব এলাকার জন্যে একথা মোটেই যথার্থ নয় যে, সেখানেও সুবহে সাদেকের উদয়ের সাথে সাথে রোজা শুরু করতে হবে এবং রাত শুরু হবার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে, অথবা সেখানে আদতে রোজাই রাখতে হবেনা। এসকল স্থানে নির্দেশের রূপকল্পটি বাদ দিয়ে অন্য সংগত পদ্ধতিতে নির্দেশের উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই প্রকৃত ফিকাহ জ্ঞানের পরিচায়ক। যেমন, রোজার জন্যে এমনসব সময় নির্ধারণ করা উচিত, যা পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতির রোজাকালের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

আমার মতে যে মেয়ে দু'টির দেহ একত্র সংযুক্ত, তাদের ব্যাপারেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। দু'জন পৃথক পৃথক পুরুষের সাথে তাদের বিয়ে দেয়া বা আদতে তাদের বিয়ে না দেয়ার প্রস্তাব ক্রুটিপূর্ণ। এর পরিবর্তে এর বাহ্যিক রূপকল্পটি বাদ দিয়ে কেবল এর উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করা উচিত। এ নির্দেশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু'বোনকে সতীন সুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নিক্ষেপ করা থেকে রক্ষা করা। আর এখানে যেহেতু এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে দু'জনের বিয়ে একই ব্যক্তির সাথে হতে পারে অথবা আদতে তাদের বিয়েই হতে পারেনা, তাই ঐ বোনদ্বয় একই সময় এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে করতে রাজি আছে বা চিরন্তন কুমারীত্ব অবলম্বন করতে প্রস্তুত, এ ব্যাপারটি তাদের দু'জনের মতের ওপর ছেড়ে দেয়াই সংগত। যদি তারা নিজেরাই প্রথম অবস্থাটি গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে পছন্দ করে এমন কোনো ব্যক্তির সাথে তাদের বিয়ে দেয়া উচিত। আর যদি তারা দ্বিতীয় অবস্থাটি পছন্দ করে তাহলে এ যুলুমের জন্যে আমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাই এবং খোদার আইনও।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, এ মেয়ে দু'টিকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেবার পর ঐ ব্যক্তি যদি তাদের একজনকে তালাক দেয়, তখন কি অবস্থা হবে?

আমি বলবো, এ অবস্থায় তাদের দু'জনই তার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। একজনকে তো তালাক দেয়া হয়েছে তাই সে আলাদা হয়ে যাবে আর প্রথম জনের সাথে মিলনের অপরাধে অপরাধী না হয়ে দ্বিতীয় জনের থেকে সে কোনো প্রকার ফায়দা হাসিল করতে পারবে না বলে দ্বিতীয় জনও আলাদা হয়ে যাবে। কেবল এতোটুকুই নয়, বরং সে ঐ অতালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে নিজের গৃহে রাখতেও পারবে না। কারণ তালাকপ্রাপ্তা মেয়েটিকে নিজের গৃহে রাখার জন্য বাধ্য করার অধিকার তার নেই। আর তালাকপ্রাপ্তা মেয়েটিকে বাদ দিয়ে অতালাকপ্রাপ্তা মেয়েটি তার গৃহে থাকতে পারেনা। কাজেই সে তাদের একজনকে তালাক দিলে অন্যজন 'খুলা' তালাক দাবি করার বৈধ অধিকার লাভ করবে। যদি সে 'খুলা' তালাক না দেয় তাহলে আদালত তাকে 'খুলা' তালাক দিতে বাধ্য করবে। এ মেয়ে দু'টি জন্মগতভাবে এহেন শারীরিক কাঠামোর অধিকারিণী, যার ফলে কোনো ব্যক্তি তাদের একজনের সাথে বিয়ে করতে পারেনা এবং একজনকে তালাকও দিতে পারেনা। তাদের বিয়েও একসাথে হবে এবং তালাকও হবে একসাথে। (আমার মতে এটিই যথার্থ, অবশ্যি আল্লাহ্ই ভালো জানেন)। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৫৪, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খণ্ড)

স্ত্রীর সংখ্যা প্রসংগে

প্রশ্ন ঃ জামায়াত ক্ষমতায় গেলে কি বহু বিবাহ প্রথা চালু হবে?

জবাব ঃ বলা হয়, জামায়াত ক্ষমতায় এলে লোকেরা চারটি করে বিয়ে করবে। এতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় এজন্য যে, যারা এ দেশের এ সমাজে বসবাস করে, তারা পাশ্চাত্যের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে স্বয়ং নিজের দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে এতোটাই অজ্ঞ। চোখ খুলে একটু তাকিয়ে দেখুন, আপনার দেশে এমন কতোজন লোক আছে, যারা চার চারটি বিয়ে করে রেখেছে? বরং দু'জন স্ত্রী গ্রহণকারী লোকের সংখ্যাই বা কতোজন? এটা একটা অপপ্রচার, যা আমাদের উপর বহু বিবাহ প্রসঙ্গে আরোপ করা হয়েছে। আসল রহস্য হলো, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ঐসব নারীরা, যারা নিজেরাই প্রকৃতপক্ষে তাদের স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী। তারা বহু বিবাহের বিরুদ্ধে এ কারণে চেঁচামেচি করছে যে, ওদের সাহেবরা যেনো আবার তৃতীয় বিবাহ না করে বসে। কারণ পর্দাহীন সমাজে 'স্ত্রী বাছাই'র সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে।

যে পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে বহু বিবাহের বিরোধিতা করা হয়, তাদের সমাজে এক বিবাহ (Monogamy)-কে আইনসংগতভাবে তো স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু তাদের শতকরা একজনেরও বাস্তবে শুধু মাত্র

একজন স্ত্রী (Monogamous) নেই। চিকিৎসার জন্য আমি যখন লন্ডনে অবস্থান করছিলাম, তখন হাসপাতালের এক নার্স একদিন আমার নিকট ইসলামের বহু বিবাহ (Polygamy) প্রসংগ উত্থাপন করে। আমি তাকে বললাম, তুমি কসম খেয়ে বলো, তোমাদের দেশে কি এক বিবাহ পাওয়া যাবে? আমি আইনসংগত এক বিবাহের কথা বলছি না। তা তো তোমাদের এখানে স্বীকৃত আছেই। কিন্তু এটা বলো যে, কার্যত কি তোমাদের সামজে এক বিবাহ পাওয়া যাবে?

সে বললো, 'না'। আমি বললাম, এবার বলো, তুমি দু'টি অবস্থার মধ্যে কোনটিকে উৎকৃষ্ট মনে করো? একটি অবস্থাতো হলো, আইনসংগতভাবে এক বিবাহ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বেআইনীভাবে বহু বিবাহ খুব জোরেসোরেই চালু রয়েছে। আর এ অবৈধ বহু বিবাহের ক্ষেত্রে যতোজন মহিলার সঙ্গে একজন পুরুষের সম্পর্ক থাকে, এদের মধ্যে কোনো একজনেরও তার উপর কোনো অধিকার থাকেনা। আর এ কারণে তার উপর কোনো দায়দায়িত্বও অর্পিত হয়না।

দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, ব্যক্তির উপর আইনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে তাকে একথা বলা হয় যে, সে যদি একাধিক স্ত্রী রাখতে চায়, তবে তাকে তাদের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। তাদের সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যকীয়। আর সে ব্যক্তি একই সঙ্গে সর্বোচ্চ চারটির বেশী বিয়ে করতে পারবেনা। এবার তুমি নিজেই বলো, এ দু'টি অবস্থার মধ্যে কোনটি তোমার কাছে উৎকৃষ্ট।

একজন ইংরেজ মহিলা হয়েও সে স্বীকার করে যে, এ দু'টি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয়টিই সর্বোত্তম। সুতরাং আমি আমার মুসলিম বোনদের বলবো, যে দীন আপনারা পেয়েছেন, তার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত, সুবিচারপূর্ণ এবং মানব কল্যাণের গ্যারান্টিবহ অপর কোনো দীন বা জীবনব্যবস্থা নেই। এর ভেতরে যদি পাশ্চাত্য প্রভাবের দরুণ কারো নযরে ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তবে সে অপর কোনো দীন খুঁজে নিতে পারে। আমাদের দীন বাস্তবে চার বিবাহের অনুমতি দিয়েছে সত্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে শর্তও আরোপ করেছে যে, সকল স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তবে একজন স্ত্রীকেই যথেষ্ট মনে করে নেবে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ২য় খণ্ড)।

বহু বিবাহ প্রসংগে

প্রশ্ন ঃ সূরা নিসার তৃতীয় আয়াত, যাতে স্ত্রী সংখ্যার বিধান উল্লেখ হয়েছে- মুহকাম না মুতাশাবিহ? যদি মুহকাম হয়ে থাকে তবে তার অর্থে মত

পার্থক্য হয়েছে কেন এবং আয়াতটির এতো অধিক তা'বীল কেন করা হয়ে থাকে? কেউ যদি মনে করে আয়াতটির অর্থ সুস্পষ্ট তবে আয়াতটির ব্যাখ্যার জন্যে তার হাদিসের দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন আছে কি? (প্রকাশ থাকে যে, আমি নিজে স্ত্রী সংখ্যা সংক্রান্ত বিধানটির ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই। তবে আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কুরআনের তাবীল সমস্যা।

জবাব ঃ উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একথা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, সূরা নিসার ৩ নম্বর আয়াত মুতাশাবেহ নয়, বরঞ্চ মুহকাম আয়াত। আপনি প্রশ্ন করেছেন ঃ "আয়াতটি যদি মুহকাম হয় তবে এর ব্যাখ্যায় এতো মতপার্থক্য কেন দেখা যায়?" আপনার এ প্রশ্ন অনেকগুলা ভ্রান্ত ধারণার পরিণাম। আপনার প্রথম ভুল ধারণা এই যে ঃ "মুহকাম আয়াতসমূহে মতপার্থক্য থাকা উচিত নয়।" আর এই ভুল ধারণা আপনার মধ্যে এজন্যে সৃষ্টি হয়েছে যে, আপনি মনে করেন মুহকাম আয়াত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষীই নয়। আপনার দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে এইযে, এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় অনেক মতপার্থব্য পরিলক্ষিত হয় এবং সে মতবিরোধের ব্যাপকতা বড় ধরনের। অথচ ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে বিগত বারশত বছর থেকে আয়াতটির একটি সর্বসম্মত অর্থই রয়েছে। আর তা হচ্ছে এইযে, একজন পুরুষকে আয়াতটি একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করছে। আর সে আধিক্যের সীমা একত্রে চারজন পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এজন্যে সমতা রক্ষা করার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর এ সমতা রক্ষার বা عدل-এর অর্থ আচরণ এবং অধিকারের সমতা রক্ষা করা, ভালোবাসা ও প্রাণাকর্ষণের সমতা নয়।

এখন আসুন সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কথায়, যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায়ে কোনো কোনো মুলমান করতে শুরু করেছে। আর এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই আপনার নিকট আয়াতটির ব্যাখ্যায় ব্যাপক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমার পরিষ্কার কথা হলো, প্রকৃতপক্ষে এগুলো কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়, বরঞ্চ এগুলো হচ্ছে কুরআনের মনগড়া ও বিকৃত অর্থ, কুরআনের বৈধ তাফসীরের সীমায় যেগুলোকে স্থান দেয়া যেতে পারেনা। ঐসব লোকেরাই এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে যারা আপনাদের নিকট থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করে, কুরআন থেকে নয়। অতঃপর তারা কুরআনকে বাধ্য করে সে কথা সঠিক বলাতে যেটাকে আপনারা সঠিক বলেন। আমার মতে এভাবে কোনো জিনিসের মনগড়া অর্থ করার চেষ্টা করা মুনাফিকী এবং বেঈমানী। (বিশ্বাস করুন) আমি যদি এ বিষয়ে বা অন্য যে কোনো বিষয়ে ঈমানদারীর সাথে বুঝতাম যে, সে বিষয়ে

কুরআনের দৃষ্টিকোণ ভ্রান্ত এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক, তাহলে আমি পরিষ্কার ভাষায় কুরআন অস্বীকার করে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা করে দিতাম এবং আমি মুসলমান নই - একথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতামনা। প্রত্যেক সত্যপন্থী নিষ্ঠাবান ব্যক্তির নীতি এরকমই হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় আপনারা আমাদের মধ্যকার মুনাফিকদের সাহস যোগাচ্ছেন। কারণ যিন্দেগীর বিভিন্ন বিষয়ে তারা আপনাদের অনুসারী। তাদের "অন্ধ অনুকরণ" আপনাদের নিকট ভালো লাগে আর "মুনাফিকীটা" খারাপ লাগেনা। (রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)

একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধকরণ

প্রশ্ন ঃ আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। সেটি হলো, ইসলামী রাষ্ট্রে যদি মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম হয় তাহলে সরকার কি সেই কারণে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করতে পারে?

এ প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা আমি এজন্য অনুভব করেছি যে, আমার ধারণা পবিত্র কুরআনে যেখানে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেখানে জরুরী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই তা দেয়া হয়েছে। সে আমলে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বহু নারী বিধবা এবং বহু শিশু এতীম ও আশ্রয়হীন হয়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য এই অনুমতি দেয়া হয়েছিল, যাতে বিধবা ও এতীমদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করা এবং তাদের লালন পালনের ভদ্রজনোচিত ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

জবাব ঃ আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, কোনো সমাজে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা একটা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটাতে পারে নারীর সংখ্যা এ পরিমাণে কম হওয়া একটা বিরল ঘটনা। সাধারণত পুরুষদের সংখ্যাই ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। যেসব কারণে পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস পায়, সেসব কারণে নারীর সংখ্যা হ্রাস পায়না।

নারীর সংখ্যা যদি কমে তবে কেবলমাত্র পুরুষের চাইতে নারীর জন্মহার কমে যাওয়ার কারণেই কমতে পারে। আর এমনটি হওয়া প্রথমত অত্যন্ত বিরল। আর তা যদি হয়ও, তথাপি নারীর জন্মহার এতো কম হয়না যে, তার দরুণ একটা সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে এবং তার সমাধানের জন্য আইন রচনার প্রয়োজন দেখা দেবে। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর পুনঃবিবাহের প্রচলন দ্বারা এ সমস্যার সমাধান আপনা আপনিই হয়ে যায়।

দ্বিতীয় যে কথাটা আপনি লিখেছেন, তা কুরআনের সঠিক অধ্যয়নভিত্তিক নয়। ইসলামের কোনো যুগেই একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ ছিলোনা। আর এই নিষেধাজ্ঞাকে কোনো কারণে বাতিল করে একাধিক বিয়ে বৈধ করা হয়েছে, এমন ঘটনাও কখনো ঘটেনি। আসলে একাধিক বিয়ে সকল যুগে সকল

নবীর শরীয়তেই জায়েয ছিলো। আরবের জাহিলী সমাজেও এটা জায়েয ছিলো। নবুয়তের পর রসূলুল্লাহ সা. এবং সাহাবায়ে কিরামও এই প্রথার অনুসারী ছিলেন। কুরআনে একটি আয়াতও এমন নেই, যা দ্বারা ধারণা জন্মে যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ ছিলো এবং এ আয়াত এসে তাকে বৈধ করেছে। এ ধরনের কোনো আয়াত আপনার জানা থাকলে তার উল্লেখ করবেন

প্রশ্ন নং-২ ঃ আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনার জবাব আমাকে আশ্বস্ত করেনি। আমি শুধু একথাই বলেছিলাম যে, কোনো সমাজে যদি নারীর সংখ্যা পুরুষের চাইতে কম হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে সরকারের একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করার অধিকার আছে কি না? আপনি বলেছেন যে, এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। আমি তো সেই বিরল ঘটনা নিয়েই প্রশ্ন করেছি। আপনি হয়তো জানেন যে (আদমশুমারীর আলোকে) পাকিস্তানে নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম। এখন সরকার কি এমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে যা দ্বারা এই পরিস্থিতি বহাল থাকা অবধি একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যায়? আমার বক্তব্য ছিলো, একাধিক বিয়ে অনুমোদনের তাৎপর্য সম্ভবত এইযে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী আন্দোলনে লিপ্ত থাকার সেই আমলে বহু বছরব্যাপী জেহাদ চলার কারণে বিধবা ও এতীম হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল এবং একাধিক বিয়ের অনুমোদনকেই তার একটি উপায় হিসেবে স্থির করা হয়েছিল। যে আয়াতে এই অনুমোদন দেয়া হয়েছে তার আগে জেহাদ ও যুদ্ধবিগ্রহেরই উল্লেখ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আমি এই ধারণায় উপনীত হয়েছি (তা ভুল বা শুদ্ধ যাই হোক) যে, এ অনুমতি বিশেষ পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। এ ধারণা যদি ভুলও হয়ে থাকে এবং আপনার উক্তি অনুসারে এটা যদি কুরআনের বিশুদ্ধ অধ্যয়ন ভিত্তিক নাও হয়ে থাকে, তবে এটা বাদ দিয়েও একথাই ভাবা যেতে পারে যে, দুই, তিন ও চারটা করে বিয়ের প্রচলন কেবলমাত্র সেই অবস্থায়ই হওয়া সম্ভব যখন সমাজে পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যা বেশি হয়। তাদের সংখ্যা যদি অপেক্ষাকৃত বেশি না হয়ে থাকে অথবা পুরুষের সমান হয়, তাহলে এই অনুমতিকে বাস্তবায়িত করার কি প্রয়োজন?

জবাব ঃ পাকিস্তানের লোক গণনায় নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে কম পরিলক্ষিত হলেই একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়না যে, আমাদের দেশে সত্যিই পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম। আমাদের দেশের প্রচলিত রীতিপ্রথাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারণ জনগণ সাধারণভাবে পরিবারের নারী সদস্যাদের নাম নথিভুক্ত করেনা। তবুও যদি কোটি কোটি

মানুষের মধ্যে কয়েক লাখের পার্থক্য হয়ও তবুও তাতে এমন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়না যার জন্য একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজন হবে। সমস্যা যেটুকু হয়, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীদের পুনঃবিবাহের প্রচলন করলেই তার সমাধান হয়ে যায়। তথাপি ধরে নেয়া যাক, কোনো অস্বাভাবিক ঘাটতি যদি দেখা দেয়, তবে সাময়িকভাবে কিছুকালের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করাও যেতে পারে। তবে শর্ত এইযে, এই নিষেধাজ্ঞার আসল কারণ শুধুমাত্র এই সমস্যাই হওয়া চাই - অন্য কিছু নয়। কিন্তু একথা গোপন করার কি প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে এ সস্যার কারণে একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি, বরং এটা অনুভব করা হয়েছে একাধিক বিয়েকে মূলতই খারাপ মনে করার পাশ্চাত্য মানসিকতার ভিত্তিতে এবং আইনত এক বিয়েই চালু করার উদ্দেশ্যে। এ মানসিকতা আমাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং এর মূলোৎপাটন করাকে আমরা জরুরী মনে করি।

আমি আগেও একথা বলেছিলাম এবং এখন আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কুরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়ার জন্য কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। একাধিক বিয়ে আগে থেকেই বৈধ চলে আসছিল। সূরা নিসার ৩ নং আয়াত নাযিল হওয়ার আগেই স্বয়ং রসূল সা.-এর ঘরে তিনজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও অনেকের একাধিক স্ত্রী ছিলো। এই বৈধ কাজটির অনুমতি দেয়ার জন্য সূরা নিসার উক্ত আয়াত নাযিল হয়নি। বরং আয়াতটি নাযিল হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, ওহোদ যুদ্ধে বহু সংখ্যক সাহাবীর শহীদ হওয়া এবং বহু সংখ্যক শিশুর এতিম হওয়ার দরুণ তাৎক্ষণিকভাবে যে সমাজিক সমস্যা দেখা দেয়, তার সমাধানের জন্য মুসলমানদেরকে একটি পদ্ধতি জানিয়ে দেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, তোমরা যদি তোমাদের বর্তমান স্ত্রীদের দ্বারা এতীমদের প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করতে পারো তাহলে দুইজন, তিনজন বা চারজন করে মহিলাকে বিয়ে করে এই এতীমদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো। এর অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র এই জাতীয় সমস্যাবলীর উদ্ভব হলেই একাধিক বিয়ে বৈধ হবে। বিগত ১৩-১৪'শ বছর ধরে তো মুসলিম সমাজে এ প্রথা চালু রয়েছে। তার আগে এমন প্রশ্ন কখনো ওঠেনি যে, একাধিক বিয়ের অনুমতি বিশেষ পরিস্থিতির শর্তাধীন কিনা?

এ চিন্তাধারার প্রাদুর্ভাব তো কেবল প্রাশ্চাত্যের আধিপত্যের কারণেই আমাদের দেশে হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৩, রাসায়ে ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)

মোহরানা ছাড়া বিয়ে

প্রশ্ন ঃ এক মিসরীয় আলেম মোহরানা ছাড়া বিয়ে বৈধ হবার দাবি করেন? সত্যিই কি মোহরানা ছাড়া বিয়ে জায়েয?

জবাব ঃ মোহরানা ছাড়া বিয়ে হতে পারে। তবে ইসলামী ফিকহের দৃষ্টিতে এ ধরনের বিয়েতে 'মোহরে মেসেল' (অর্থাৎ মা-ফুফুদের যে পরিমাণ মোহরানা ছিলো একই পরিমাণ মোহরানা) স্বতস্ফূর্তভাবে আরোপিত হবে। (রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)

গায়রে মুয়াজ্জল মোহরের হুকুম

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় যদি কেবলমাত্র দেন মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়, কিন্তু তা مُعَجَّل হবে নাকি مُؤَجَّل তা ঠিক করা না হয়; তবে এ মোহরের বিধান কি হবে? তাকি مُعجل ধরে নিতে হবে, না مؤجل?[১] এ বিষয়ে আলিমদের নিকট ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জবাব পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি জবাব এখানে উল্লেখ করা গেলো ঃ

মওলানা মুহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ্ সাহেব ও দিল্লীর অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ

"মোহর যদি مؤجل (বাকি) বলে উল্লেখও করা হয়, কিন্তু অজ্ঞতাবশত পরিশোধের সময় সীমা উল্লেখ করা না হয় তবে মোহর معجل (নগদ) হয়ে যাবে। আর যদি معجل কিংবা مؤجل কিছুই উল্লেখ না করে শুধুমাত্র 'পরিশোধ করতে হবে' লেখা হয়, সে অবস্থাতেও معجل মোহর হবে। কেননা পরিশোধের সময় সীমা নির্ধারণ ছাড়া مهر مؤجل হতে পারেনা।" (দুররে মুখতার)।

আযমগড় জিলার সরাইমীরস্থ 'মাদ্‌রাসাতুল ইসলাহ্‌র' মুদাররিস্ মওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব বলেন ঃ

"সে অবস্থায়ই مؤجل মোহর হবে যখন বিবাহ অনুষ্ঠানে মোহর পরিশোধের দিন তারিখ নির্ধারণ করে নেয়া হবে। এরূপ না হলে معجل মোহর হবে। সর্বপ্রকার লেনদেনের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। কেউ যদি কোনো দোকান থেকে কিছু জিনিস ক্রয় করে এবং কথাবার্তায় বাকি বা নগদ মূল্য পরিশোধের কথা নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তবে এ ক্রয় বিক্রয় معجل (নগদ) হবে। ক্রেতা সংগে সংগে মূল্য পরিশোধ করে দিক কিংবা পরে দেয়ার ওয়াদা করুক, তাতে কিছু যায় আসেনা। معجل এর জন্যে এটা শর্ত নয় যে, বিনিময় সংগে সংগে পরিশোধ করতে হবে। বরঞ্চ

---

১. বর কর্তৃক দেন মোহর পরিশোধের দুইটি স্বীকৃত পন্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে নগদ বা معجل অপরটি مؤجل বা বাকি।

পাওনাদারের এ অধিকার থাকে, সে সংগে সংগে কিংবা যখন ইচ্ছা তার পাওনা দাবি করতে পারে। আর যদি مؤجل (বাকি) নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে নির্দিষ্ট দিন তারিখ আসার পূর্বে পাওনাদার তার পাওনা দাবি করতে পারেনা। এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী আলোচ্য মাসআলার মোহর معجل হবে এবং স্ত্রী যখন ইচ্ছা তা চাইতে ও দাবি করতে পারবে।"

মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী বলেন ঃ মোহর معجل কিংবা مؤجل কোনোটাই যদি ফায়সালা না হয়ে থাকে তবে তা প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরিশোধ করতে হবে। বেকায়া গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

الْمُعَجَّلُ وَالْمُؤَجَّلُ اِنْ بَيَّنَا فَذَالِكَ وَاِلاَّ فَالْمُتَعَارِفُ -

معجل বা مؤجل যদি পরিষ্কারভাবে ঠিক হয়ে থাকে, তবে সে অনুযায়ীই পরিশোধ করতে হবে। তা না হয়ে থাকলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।"

পাতিয়ালার নায়েবে মুফতি মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ

"এ অবস্থায় প্রচলিত নিয়ম মাফিক কাজ করতে হবে (সূত্র ঃ বেকায়া গ্রন্থ)। যে মোহর পরিশোধের সময় ঠিক করা হয়নি, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তা যদি শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যু ঘটলে কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হলেই মহিলারা লাভ করে থাকে, তবে সে স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পূর্বে মোহর আদায়ের অধিকার রাখেনা।"

এ মতভেদের সমাধান কি? মেহেরবানী করে আপনি এর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করুন।

জবাব ঃ কুরআন হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের যে অধিকার লাভ করে, প্রকৃতপক্ষে মোহর তারই 'বিনিময়'। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَا لِكُمْ -

"এদের ছাড়া আর যতো নারী আছে, নিজেদের ধন সম্পদের বিনিময়ে তাদের বিয়ে করা তোমার জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে"। (নিসা, রুকু ৪)

فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -

"আর (দাম্পত্য জীবনে) তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করো, তার বিনিময়ে একটি অবশ্য কর্তব্য ফরয হিসেবে তাদের মোহর পরিশোধ করো।" (নিসা রুকু ৪)

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

"আর তোমরা কী করে সে অর্থ ফেরত নিতে পারো যখন তোমরা একজন আরেক জনের স্বাধ আস্বাদন করেছ?" (নিসা, রুকু ৩)

এ আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, মোহরই হলো সেই জিনিস, যার বিনিময়ে স্ত্রীর উপর পুরুষের স্বামীত্বের অধিকার লাভ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কিত রসূলে করীমের হাদীসসমূহ বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দেয়। সিহা সিত্তাহ, দারেমী ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوفُوا بِهٖ مَا سْتَحْلَلْتُمْ بِهٖ الْفُرُوْجَ

"বিয়েতে পূরণ করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীদের লজ্জাস্থান হালাল করে নাও।"

লেয়ানের সেই মোকদ্দমাহ্ যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেনঃ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর স্বামী আবেদন করলো ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমার অর্থ সম্পদ আমাকে ফেরত দেয়া হোক। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ

لَا مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَالِكَ اَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا -

"সম্পদ ফেরত নেয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই। তুমি যদি তার বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগ এনে থাকো, তবে তুমি যে তার গোপন অংগ হালাল করে নিয়েছিলে তার বিনিময়ে তা পরিশোধ হয়ে গেছে। আর তুমি যদি তার প্রতি মিথ্যা অভিযোগ (অপবাদ) আরোপ করে থাকো তবে সম্পদ ফেরত নেয়ার দূরতম কোনো অধিকারও তোমার নেই।"

বিষয়টি এর চাইতেও পরিষ্কার ভাষায় অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুস্নাদে আহমদে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِصِدَاقٍ وَنَوٰى اَنْ لَا يُؤَدِّيَهٗ فَهُوَزَانٍ -

"যে ব্যক্তি কোনো নারীকে মোহর দেবে বলে বিয়ে করেছে অথচ নিয়্যত করেছে মোহর পরিশোধ না করার, সে ব্যাভিচারী।"

এসব দলীল প্রমাণ থেকে মোহরের যে মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো, মোহর কোনো সামাজিক ও প্রদর্শনীমূলক জিনিষ নয়। বরঞ্চ মোহর হলো সেই জিনিস, যার বিনিময়ে একজন নারী একজন পুরুষের জন্যে হালাল হয়ে যায়। আর কুরআন হাদিসের এসব প্রামান্য দলীলের দাবি এটাই যে; স্ত্রীর গুপ্তাংগ হালাল করার সাথে সাথেই পূর্ণ মোহর পরিশোধ

করা ওয়াজিব। তবে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যদি বিলম্বে পরিশোধের কোনো সমঝোতা হয়ে যায়, কেবল সেক্ষেত্রেই বিলম্বে পরিশোধ করা যাবে।

সুতরাং মোহর পরিশোধের ব্যাপারে مُعَجَّلٌ কিংবা مُؤَجَّلٌ কোনেটাই আসল ব্যাপার নয়। মোহরের দাবি হলো তা গুপ্তাংগ হালাল করার ক্ষণেই পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধের ব্যাপারে স্বামীকে কিছুটা অবকাশ দেয়াটা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একটা মেহেরবানী মাত্র। আর অবকাশ দানের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোনো চুক্তি ও সমঝোতা না হয়ে থাকলে মূলনীতি (অর্থাৎ معجل অনুযায়ীই কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর মেহেরবানী (অর্থাৎ অবকাশ বা مؤجل ধরে নেয়া যাবেনা।) এমনটি শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ খেলাফই মনে হয় যে, অবকাশ দান مؤجل কে মূলনীতি ধরা হবে এবং معجل কিংবা مؤجلঅনুল্লেখ থাকলে এমনিতেই মোহরকে موجل মনে করা হবে!

এ মাসআলাটির ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের ফকীহ্দের দু'টি দল পাওয়া যায়। একদলের মত তাই যা আমি উপরে বর্ণনা করলাম। গায়াতুল বয়ান (غاية البيان)গ্রন্থের ভাষ্য হলো ঃ

"মোহর নির্ধারণের সময় যদি معجل এর শর্ত আরোপিত হয়ে থাকে অথবা - معجل কিংবা -مؤجل কোনোটাই উল্লেখ করা না হয়ে থাকে, তবে তা সংগে সংগে পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় মোহর পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীর স্বামী থেকে নিজেকে দূরে রাখার অধিকার থাকবে।"

'শারহে ইনায়াহ আ'লাল হিদায়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"অতপর যদি معجل (নগদ) কিংবা مؤجل (বাকি) এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে মোহর নির্ধারিত হয়, তবে তার বিধান কি? আমি বলছি, তা সংগে সংগে পরিশোধ করা ওয়াজিব। এর বিধান হচ্ছে এমন মোহরের বিধান, যার জন্যে معجل এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।"

ইসতিজাবী-গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"যদি معجل মোহর হয়, কিংবা এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়, তবে নগদ পরিশোধ করা ওয়াজিব। কেননা বিয়ে হচ্ছে একটি বিনিময় বন্ধন। স্ত্রীর উপর যখন স্বামীর অধিকার নির্ধারিত হয়ে গেলো তখন স্ত্রীর অধিকার নির্ধারিত হওয়াও ওয়াজিব হয়ে যায়। আর মোহর পরিশোধের মাধ্যমেই তা হতে পারে।"

বাকি থাকলো দ্বিতীয় দলের মতামত। তারা বলেন, এ ব্যাপারে প্রচলিত নিয়মের উপর নির্ভর করতে হবে। ফতোয়ায়ে কাযীখানে বলা হয়েছে ঃ

"যদি معجل এর পরিমাণ স্পষ্টভাবে আলোচিত না হয়ে থাকে, তবে দেখতে হবে স্ত্রী কোন্ শ্রেণীর লোক এবং মোহরের পরিমাণ কি? এটাও দেখতে হবে যে, সমাজে এ শ্রেণীর মেয়েদের মোহর কি পরিমাণ معجل নির্ধারণ করা হয়ে থাকে? ব্যাস, সে পরিমাণই معجل নির্ধারণ করতে হবে। এক চতুর্থাংশ কিংবা এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করে দেয়া ঠিক নয়, বরঞ্চ প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করা উচিত।"

আল্লামা ইবনে হাম্মাম ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এ মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"যদি মোহরের কিছু অংশ معجل করার শর্তারোপ করা না হয়ে থাকে বরঞ্চ - معحل কিংবা مؤجل এর বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তবে প্রচলিত নিয়ম দেখতে হবে। প্রচলিত নিয়মে যদি একাংশ معجل নির্ধারণ করা হয়, আর বাকি অংশ মৃত্যু পর্যন্ত কিংবা স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত কিংবা তালাক পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়, তবে স্ত্রী কেবলমাত্র এ معجل অংশ উসূল করা পর্যন্তই নিজেকে স্বামী থেকে দূরে রাখার অধিকার পাবে।"

মূলনীতির দিক থেকে প্রথম দলের রায়ই কুরআন হাদীসের দৃষ্টিভংগির সংগে অধিকতর সামঞ্জস্য রাখে। কিন্তু দ্বিতীয় দলের রায়ও ঠুক্‌কো নয়। তাদের দাবি এটা নয় যে, মোহর পরিশোধের ব্যাপরে مؤجل হচ্ছে মূল বিধান আর যখন - معجل কিংবা - مؤجل উল্লেখ না থাকে, তখন مؤجل নীতির দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বরঞ্চ তাঁরা তাঁদের ফতোয়ায় আরেকটা নিয়মের অনুসরণ করেছেন। শরীয়তে সেটাও স্বীকৃত। আর সে নিয়মটা হলো, কোনো সমাজে কোনো বিষয়ে যে পন্থা সাধারণভাবে প্রচলিত থাকে, সেখানকার লোকদের জন্যে তার অনুসরণ করা একটা অলিখিত চুক্তির মতোই হয়ে থাকে। সে সমাজের দুই পক্ষ যখন সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং উক্ত বিষয়ের বিশেষ কোনো দিক সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ফায়সালা না করে থাকে, তবে বুঝে নিতে হবে যে, সে জিনিসটা সম্পর্কে তারা প্রচলিত নিয়মের উপরই সন্তুষ্ট।

এ নিয়ম শরীয়তে নিঃসন্দেহে স্বীকৃত। আর এ হিসেবে ফকীহ্‌দের দ্বিতীয় দলের রায়ও ভুল নয়। কিন্তু কোনো বিশেষ সমাজে এ নিয়ম কার্যকর করার পূর্বে আমাদের একটি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। আর তা হলো, ইসলামী শরীয়ত কোনো সমাজের প্রচলিত প্রথাকে আইনের উৎস (Source of Law) হিসেবে স্বীকার করেনা। যা কিছু সমাজে প্রচলিত আছে তাই সঠিক, এমনটি ইসলাম স্বীকার করেনা। বরঞ্চ এর বিপরীত ইসলাম এসব খোদাবিমুখ অন্যায় অমূলক প্রথাসমূহ পরিবর্তনের সংগ্রাম

করে। ইসলাম কেবল এমনসব রসম রেওয়াজকেই স্বীকৃতি দেয় যা একটি পরিশুদ্ধ সমাজে শরীয়তের প্রাণস্পন্দন ও তার মূলনীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রচলিত প্রথাকে অলিখিত চুক্তি ধরে নিয়ে তাকে আইন হিসেবে কার্যকর করার পূর্বে আমাদের একটা জিনিস ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। আর তা হলো, যে সমাজ প্রথাকে আমরা এতোখানি মর্যাদা দিচ্ছি তা কি একটি তাকওয়াসম্পন্ন সমাজ? এ সমাজের প্রথাসমূহ কি শরীয়তের প্রাণবস্তু ও তার মূলনীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে? যদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা দ্বারা এর জবাব 'না' সূচক পাওয়া যায় তবে এ নিয়মটাকে আইন হিসেবে কার্যকর করা কিছুতেই ইনসাফ ও ন্যায়সংগত হতে পারেনা। বরঞ্চ এটা হবে একটা সুস্পষ্ট যুল্ম।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের বর্তমানে মুসলিম সমাজের প্রতি তাকালে সুস্পষ্ট দেখা যাবে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে এ সমাজ নফসের দাসত্বের পথ অনুসরণ করে সেই সুষম ব্যবস্থার অনেক কিছুই বিগড়ে দিয়েছে যা ইসলামী শরীয়ত কায়েম করেছিল। তাছাড়া এ সমাজ এমনসব পন্থা পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, যা ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি ও বিধিবিধান থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় এই দেনমোহরের ব্যাপারটাই চিন্তা করে দেখুন।

এদেশের মুসলমানরা সাধারণত দেন মোহরকে একটা প্রথাগত জিনিষমাত্র মনে করে। কুরআন হাদীসে মোহরের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে তার সে গুরুত্ব অবশ্যই নেই। বিয়ের সময় সম্পূর্ণ প্রদর্শনীমূলকভাবে মোহরের চুক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এ চুক্তি কার্যকর করার কোনো চিন্তাই তাদের মস্তিষ্কে থাকেনা। মোহরের বিষয় আলোচনাকালে আমি নিজ কানে বহুবার একথা শুনেছি ঃ "আরে মিঞা! মোহর দেয়ই বা কে আর নেয়ই বা কে!" এ যেনো কেবল একটা নিয়ম রক্ষার জন্যেই ধার্য করা হয়। আমার জানা মতে শতকরা আশিটি বিয়ে এরূপ হয়ে থাকে যেগুলোতে কখনো মোহর পরিশোধ করা হয়না। লোকেরা কেবল তালাকের প্রতিবন্ধক হিসেবেই মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। এভাবে কার্যত নারী সমাজের শরীয়ত প্রদত্ত একটি পাকাপোক্ত অধিকারকে বিলুপ্ত করা হলো। একথার কোনো পরোয়াই করা হয়না যে, যে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ লোকেরা নারীদেরকে পুরুষদের জন্যে বৈধ করে নেয়, সে শরীয়তই মোহরকে নারীর যৌনাংগ হালাল করার জন্যে বিনিময় বলে ঘোষণা করেছে, আর এ বিনিময় পরিশোধ করার নিয়্যত না থাকলে আল্লাহর আইনে পুরুষের জন্যে স্ত্রী হালালই হয়না।

আমার বুঝেই আসেনা, যে সমাজের রসম রেওয়াজ এতোটা বিকৃত হয়ে গেছে, যে সমাজের প্রথা প্রচলন সম্পূর্ণভাবে শরীয়তের মূলনীতি ও বিধি

বিধানের বিপরীত রূপ ধারণ করেছে, সে সমাজের রসম রেওয়াজ তথা প্রচলিত প্রথাকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েষ ঘোষণা করা কী করে সঠিক হতে পারে? প্রচলিত প্রথা অনুসরণের সমর্থনে যেসব ফকীহ্র বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয় তাদের সময় না এরূপ বিকৃত হয়ে যাওয়া সমাজ ছিলো আর না শরীয়ত বিরোধী কোনো রসম রেওয়াজ ও প্রথা প্রচলন বর্তমান ছিলো। তাঁরা এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছিলেন, তা ছিলো একটি সংস্কারপ্রাপ্ত পরিশুদ্ধ সমাজব্যবস্থা এবং তাঁরা তারই রসম রেওয়াজকে সামনে রেখে লিখেছিলেন। কোনো মুফতি কেবল তাঁদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েই নিজের দায়িত্ব মুক্ত হতে পারেননা। ফতোয়া দেয়ার পূর্বে শরীয়তের মূলনীতির আলোকে তাদের বক্তব্য ভালোভাবে বুঝে নেয়া তাঁর কর্তব্য। তাঁকে একথারও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নিতে হবে যে, যে পরিবেশ পরিস্থিতি সামনে রেখে তাঁরা এসব বক্তব্য ও মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন আর আজকে যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে সে বক্তব্য ও মতামত প্রয়োগ করা হচ্ছে, এ উভয় পরিবেশের মধ্যে কোনো গরমিল নেই তো? (তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শা'বান ১৩৬২ হিঃ, জুলই-আগষ্ট ১৯৪৩ইং, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খন্ড)

মুতআ বিয়ে

প্রশ্ন ঃ আপনি সূরা মুমিনূনের তাফসীরে মুতআ বিয়ে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এবং অন্য কয়েকজন সাহাবী ও তাবেয়ীর বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন যে, তাঁরা অনন্যোপায় অবস্থায় মুতআ বিয়ে সমর্থন করেন। অথচ প্রায় সকল মুফাসসিরই লিখেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা. পরবর্তীতে মুতআ বিয়ে বৈধ হওয়ার মত পরিহার করেন। আমি অবাক হলাম, হযরত ইবনে আব্বাসের প্রত্যাবর্তন কেমন করে আপনার নজর থেকে গোপন থাকলো! মুতআ বিয়ের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে সকল সাহাবী এবং তাবেয়ীই যে একমত - তা সকল মুফাসসীরই লিখেছেন। এতে সন্দেহ নেই, আপনিও মুতআ বিয়েকে হারাম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু 'অনন্যোপায়' শব্দ প্রয়োগ করে একটি কাল্পনিক চিত্র অংকনের মাধ্যমে আপনি মূলত মুতআকে জায়েযই বানিয়ে দিলেন। আশা করি আপনার এ মত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করবেন। কারণ মুতআ হারাম হওয়াটা আহলুস সুন্নাতের সর্বসম্মত মত।

জবাব ঃ এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি, তার উদ্দেশ্য মূলত একথা বলা যে, সাহাবী, তাবেয়ী এবং ফকীহ্গণের মধ্যে যে ক'জন বুযুর্গ মুতআকে বৈধ বলে মনে করতেন, তাদের এ মনে করার অর্থ এটা ছিলোনা যে, তারা স্বাধীন নিয়ন্ত্রণহীন মুতআ বিয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। বরঞ্চ তাঁরা এটাকে হারাম মনে করতেন এবং 'অনন্যোপায়' অবস্থায় বৈধ মনে

করতেন। তাদের কোনো একজনও মুতআকে বিয়ের মতো সাধারণ ও স্বাধীন ব্যাপার মনে করতেননা। 'অনন্যোপায়' অবস্থা বুঝানোর জন্যে আমি যে কৃত্রিম উদাহরণটি পেশ করেছি, তা দ্বারা 'অনন্যোপায় হওয়ার' প্রকৃত অবস্থার একটি চিত্র অংকন করাই উদ্দেশ্য ছিলো। যাতে করে যে কেউ বুঝতে পারে যে, শীয়ারা যদি মুতআ বৈধ হওয়ার মতই অবলম্বন করতে চায়, তবে কি ধরনের 'অনন্যোপায় হওয়া' পর্যন্ত তাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত। আমার বক্তব্য দ্বারা মূলত ঐসব লোকদের ধারণার সংশোধনই উদ্দেশ্য ছিলো, যারা 'অনন্যোপায় হওয়ার' শর্ত উড়িয়ে দিয়ে মুতআ বিয়ের অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার বর্ণনাভংগি দ্বারা আপনার মতো কারো কারো মধ্যে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি নিজেই অনন্যোপায় অবস্থায় মুতআ বিয়ের পক্ষপাতী। অথচ আমি মুতআকে অকাট্য হারাম মনে করি। এখন থেকে কয়েক বছর পূর্বে রাসায়েল মাসায়েল দ্বিতীয় খন্ডে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমি পেশ করেছি। যাহোক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দ্বিতীয়বার দেখার সময় আমি এ বাক্যটিকে এমনভাবে সংশোধন করে দেবো যাতে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

মনে রাখা দরকার, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত মুতআর বিষয়টা মতবিরোধপূর্ণ ছিলো। আর সেই মতবিরোধও ছিলো একথা নিয়ে যে, মুতআ কি অকাট্য হারাম নাকি মৃত প্রাণী ও শূকরের গোস্ত ভক্ষণের মতো হারাম - যা নাকি 'অনন্যোপায়' অবস্থায় হালালে পরিবর্তিত হতে পারে। অধিকাংশ লোক প্রথমোক্ত (অকাট্য হারাম) মতের পক্ষে ছিলেন আর স্বল্পসংখ্যক লোক ছিলেন শেষোক্ত মতের পক্ষে। পরবর্তীতে আহলে সুন্নাতের সকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেন যে, মুতআ বিয়ে অকাট্য হারাম। 'অনন্যোপায়' অবস্থায়ও এর বৈধতাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেন। পক্ষান্তরে শীয়াগণ মুতআ স্বাধীনভাবে বৈধ হওয়ার আকীদা গ্রহণ করেন এবং 'অনন্যোপায় হওয়া' তো দুরের কথা 'প্রয়োজন' শর্তটিও তারা বাকি রাখেননি। এ সম্পর্কে আমি যে কথাটি বলতে চাই, তা হচ্ছে এইযে, মুতআর নিষিদ্ধতা সর্বাবস্থায়ই প্রমাণিত এবং এর স্বাধীন বৈধতার কাল্পনিক ধারণা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য কেবলমাত্র 'অনন্যোপায় হওয়া' অবস্থার জন্যে অতীত আলেমগণের একটি দলের রায়ের মধ্যে এর বৈধতার অবকাশ ছিলো। সুতরাং মুতআর পক্ষপাতী লোকদেরকে এই আলেমগণের অনুসরণ যদি করতেই হয় তবে কমপক্ষে এই (অনন্যোপায় হওয়ার) সীমা অতিক্রম করা কিছুতেই উচিত হবেনা।

মুতআর ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রা.-এর পূর্বমত প্রত্যাহারের যে কথা আপনি বলেছেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো - উলামায়ে কিরামের সেসব বক্তব্য আমার সম্মুখে রয়েছে, যেগুলোতে হযরত ইবনে আব্বাসের পূর্বমত প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব দাবি মতবিরোধপূর্ণ। এ বিষয়ে যেসব রেওয়ায়েতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস রা. তার মত যে ভুল একথা স্বীকার করে নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়না। বরঞ্চ মনে হয় কেবল ভালো বিবেচনা করেই ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকছিলেন। ফতহুল বারীতে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী ইবনে বাত্তালের একথা উল্লেখ করেছেন যে ঃ

"মক্কা ও ইয়েমেনের লোকেরা ইবনে আব্বাস রা. থেকে মুতআ মুবাহ হবার কথা উল্লেখ করেছেন। একথা দ্বারা যদিও তার পূর্বমত থেকে প্রত্যাবর্তনের রেওয়ায়েত এসেছে, কিন্তু এসব রেওয়াতের সনদ দুর্বল। অধিকতর বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহ হচ্ছে এইযে, তিনি মুতআকে জায়েযই মনে করতেন।"

আরেকটু অগ্রসর হয়ে স্বয়ং ইবনে হাজর একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তাঁর পূর্বমত প্রত্যাহারের বর্ণনাগুলো এখতিলাফপূর্ণ।' (৯ম খন্ড, ১৩৮ পৃঃ)। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম তাঁর গবেষণা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভালো বিবেচনা করে ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত থাকাটাকেই তাঁর প্রত্যাবর্তন ধরে নেয়া হয়েছে। ইবনে কাইয়্যেম বলেন ঃ লোকেরা যখন এ বিষয়ে (মুতআ) বাড়াবাড়ি করতে লাগলো এবং প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই যথেচ্ছ এ পন্থা অবলম্বন করতে থাকলো এবং কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ ও সীমারেখাই বাকি রাখলনা, তখন ইবনে আব্বাস রা. এর বৈধতার ফতোয়া দেয়া বন্ধ করে দেন এবং পূর্বমত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন (যাদুল মাআদ, ২ খন্ড, পৃঃ ৩০, তরজমানুল কুরআন, রবীউল আওয়াল ঃ ১৩৭৫ হিঃ, নভেম্বর ১৯৫৫ ঈসায়ী, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)।

শেগার বিবাহ

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রথা হয়ে গেছে যে, দু'ব্যক্তি পরস্পর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ অদলবদলের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করে থাকে। কখনো কতিপয় লোক মিলিত হয়ে এভাবে অদলবদল করে থাকে। যেমন, যায়েদ বকরের ছেলের সাথে বকর উমরের ছেলের সাথে এবং উমর যায়েদের মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মুহরের পরিমাণ সাধারণত একই হয়ে থাকে। কোনো কোনো আলেম এ প্রথাকে শেগার বলেন। বলা হয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম শেগার নিষেধ করেছেন বরং হারাম ঘোষণা করেছেন।

বর্তমান অবস্থায় একজন গরীব লোক এ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্যও হয়। কারণ অন্য লোক যেমন সহজভাবে তার মেয়েকে গ্রহণ করতে তৈরি থাকে। সে রকম সহজ উপায়ে তার ছেলেকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে তৈরি থাকেনা।

মেহেরবানী করে এ মাসয়ালাটির স্বরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

জবাব ঃ আমাদের দেশে সাধারণভাবে বদল বিবাহের যে পদ্ধতি চালু আছে তা প্রকৃতপক্ষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিষিদ্ধ শেগার বিয়েরই সংজ্ঞায় পড়ে। শেগারের তিনটি অবস্থা আছে যার সবগুলোই নাজায়েয।

১. এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এ শর্তের উপর নিজের মেয়ে দিয়ে দেয় যে, সে প্রথম ব্যক্তিকে তার পরিবর্তে নিজের মেয়ে দিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মেয়ে অপর মেয়ের 'মোহর' ধার্য হবে।

২. শর্ত তো অদলবদলেরই। তবে উভয়ের মোহর সমান সমান (যেমন ৫০/৫০ হাজার টাকা) ধার্য করা হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সমান অর্থের বিনিময় শুধু কল্পনামাত্র। উভয় মেয়েই বাস্তবে এক কপর্দকও পায়না।

৩. অদলবদলের, ব্যাপারটি উভয় পক্ষের মধ্যে শুধুমাত্র মৌখিকভাবেই গৃহীত হয়না বরং একটি মেয়ের বিবাহে অন্য মেয়ের বিবাহ শর্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। উপরোল্লিখিত তিনটি অবস্থার যে অবস্থা গ্রহণ করা হোক তা শরীয়ত বিরোধী হবে। প্রথম অবস্থা নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত। অবশ্যি অবশিষ্ট দু'অবস্থা সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিন্তু আমি শরয়ী দলিলসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিত যে, তিনটি অবস্থাই নিষিদ্ধ শেগারের আওতাভুক্ত। তিনটি অবস্থার মধ্যে সামাজিক ফিতনার এমনসব কারণ সমভাবে বিদ্যমান যার কারণে শেগার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন, রজব-শাবান ১৩৭১, এপ্রিল-মে ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

দাসী প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ সূরা আল মায়ারিজ একটি মক্কী সূরা। এ সূরায় দাসীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মক্কী জীবনে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং ঐ সময়ে যুদ্ধবন্দী সূত্রে দাসী থাকার প্রশ্নই সৃষ্টি হয়নি। তবে কি তখন লোকদের কাছে ক্রীতদাসী ছিলো? আর তাদের মর্যাদা কি যুদ্ধবন্দী দাসীর মতোই ছিলো? মেহেরবাণী করে বুঝিয়ে বলুন।

জবাব ঃ আল্লাহর শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে এইযে, কোনো বিষয়ে

ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মই চালু থাকবে যতোক্ষণ না শরীয়ত প্রণেতা সে বিষয়ে বিশেষ কোনো বিধান প্রদান করেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর সময় যখন জিহাদ শুরু হয়, তখন দাসীর অর্থ অন্যকিছু হয়ে যায়। কিন্তু যতোদিন জিহাদ শুরু হয়নি এবং দাসী প্রসংগে সুস্পষ্ট বিধান দেয়া হয়নি ততোদিন তাদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে চলে আসা প্রথাই চালু রাখা হয়। পূর্ব থেকে আরবে এই প্রথা চলে আসছিল যে, সাধারণভাবে প্রকাশ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় হতো। এমতাবস্থায় যেসব দাসী বিক্রির জন্যে আনা হতো তারা কি দাসীদেরই বংশধর, নাকি ফুসলিয়ে আনা হয়েছে? আর নাকি কোনো যুদ্ধে তাদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছে এবং সেই যুদ্ধ বৈধ ছিলো কি অবৈধ ছিলো? -এসব কিছুই জানা কঠিন ছিলো। প্রত্যেক ক্রেতার পক্ষে এসব কিছুর বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিলোনা। তাছাড়া সেই সমাজ কাঠামোটাই এমন ছিলো যে, দাস দাসী ছাড়া তাদের অর্থনৈতিক জীবন চলতেই পারতোনা। যেমনটি চলতে পারেনা আজকের সমাজে শ্রমিক কর্মচারী ও চাকর চাকরাণী ছাড়া। সেকালে বেতন ভোগী কর্মচারী পাওয়া যেতোনা। কেননা স্বাধীন আরবরা ছিলো বড় অহংকারী। তারা চাকরি বাকরি করতে রাজি হতোনা। বর্তমানকালেও তারা এমনটি করতে রাজি হয়না। আর সেকালে তো কোনো স্বাধীন আরব অপরের কোনো চাকরি করার চিন্তাই করতে পারতোনা। এমনকি না খেয়ে মরে গেলেও একাজ তাদের জন্য সহজ ছিলোনা। তাই বর্তমানকালে যেমন গোটা সমাজ ব্যবস্থার চাকা শ্রমিক কর্মচারী এবং চাকর বাকরদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, তেমনি সেকালেও সমাজ ব্যবস্থা চালিত হতো দাস দাসীদের দ্বারা। একারণেই বিকল্প কার্যকরী ব্যবস্থা প্রদানের পূর্বে ইসলামী শরীয়ত এমন কোনো বিধান প্রদান করেনি যার ফলে গোটা সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো বিচূর্ণ হয়ে যেতো। তাই এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম যখন দাসীদের প্রসংগে বিধান প্রদান করে তখন পর্যন্তও যেসব দাস দাসী পূর্ব থেকে চলে এসেছিল তাদের মালিকানা বাতিল করেনি। তবে ভবিষ্যতের জন্যে এ নিয়ম নির্ধারণ করে দেয় যে, যুদ্ধের ময়দান থেকে যেসব লোক বন্দী হয়ে আসবে এবং যেসব যুদ্ধবন্দীর বিনিময় হতে পারবেনা তাদেরকে লোকদের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হবে। আর ওই সময়টায় বিভিন্ন প্রকার কাফ্ফারা প্রভৃতির মাধ্যমে সাবেক দাসদাসীদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ মালিকানা বাতিল করার পরিবর্তে মানুষকে উৎসাহ দেয়া হয় যে, তোমরা যদি জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাও তবে দাস দাসীদের মুক্ত করে দাও। বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের সমাজে এরূপ উৎসাহ এবং প্রেরণা দানই যথেষ্ট ছিলো। একজন সাহাবীর ব্যাপারে একথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর

জীবনে ত্রিশ হাজার দাস দাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। তিনি যেনো তার গোটা সম্পদ একাজেই ব্যয় করে ফেলেছেন। একইভাবে অন্যান্য সাহাবীরাও কেউ এক হাজার কেউ পাঁচশ' কেউ একশ' মোটকথা, নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী তারা দাস দাসী ক্রয় করে মুক্ত করে দেন এবং নিজ নিজ মালিকাধীন দাস দাসীকেও মুক্ত করেন। এভাবে ইসলামী শরীয়ত প্রাচীন রীতিতে চলে আসা দাসদাসীদের বিষয়টি পর্যায়ক্রমে এবং হিকমতের সাথে সমাধান করে। অবশ্য যখন তাদের মালিকানা স্বীকার করা হয় তখন মালিকানার আবশ্যকীয় অধিকারগুলোও আদায় করা হয়। এমনটি হয়নি যে, মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে অথচ সে সংক্রান্ত অধিকার ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

দাসীর সংজ্ঞা এবং তার হালাল হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কুরআনে দাসীর সংজ্ঞা কি দেয়া হয়েছে? বিবাহ ছাড়াই দাসীর সাথে সঙ্গম হালাল হওয়ার প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ কুরআনে দাসীর যে সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো ঃ "যে নারী শক্তি প্রয়োগে অর্জিত হয়।" যেহেতু কুরআন শক্তি প্রয়োগকে শুধু আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগামের মধ্যে সীমিত রেখেছে তাই কুরআনের সংজ্ঞার আলোকে দাসী শুধু সেই নারী, যে আল্লাহর পথে সংঘটিত যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের করায়ত্ব হয়।

এই সংজ্ঞা এবং এ ধরনের নারীর সঙ্গে সঙ্গম বৈধ হওয়ার প্রমাণ আমরা সূরা নিসা'র নিম্নোক্ত আয়াতে পাই ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ .... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের গর্ভধারিণীগণকে --- এবং যে নারীরা বিবাহিতা, কেবল সেইসব নারী ছাড়া, যাদের মালিক হয়েছে তোমাদের ডান হাত।"

'ডান হাত' শব্দটি আরবি ভাষায় শক্তি, বিজয়, আধিপত্য, পরাক্রম ও বাহুবল অর্থে ব্যবহৃত হয়। দাসী সংক্রান্ত উপরোক্ত সংজ্ঞার সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে এ আয়াতই যথেষ্ট। এর সপক্ষে আরো যুক্তি এইযে, এ আয়াতে যে বিবাহিত নারীকে নিষিদ্ধ নারীর গন্ডী বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সে কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধে জড়িত নয় এমন দেশের বিবাহিত নারী হতে পারেনা। কেননা আয়াতটির পটভূমি থেকে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, এ ধরনের বিবাহিত নারী নিষিদ্ধ নারীর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং "তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তারা ছাড়া" এ কথাটি দ্বারা অবশ্যই 'দারুল

হরব' (যুদ্ধরত অমুসলিম দেশের) বিবাহিত নারীকেই বুঝানো হবে যারা যুদ্ধবন্দিনী হয়ে এসেছে।

তবে তাদের সাথে যে বিয়ে ব্যতিরেকেই সঙ্গম বৈধ তার প্রমাণ এইযে, যুদ্ধবন্দিনীদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিবাহিত নারীদের গন্ডীবহির্ভূত বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"এছাড়া অন্য নারীদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা তাদেরকে আপন অর্থের বিনিময়ে বিয়ের মাধ্যমে অর্জন করবে - এভাবে নয় যে, যথেচ্ছ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে"।

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, যুদ্ধবন্দিনী হয়ে দাসীত্ব বরণকারিণীদেরকে মোহর দিয়ে বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। মোহর দিয়ে বিয়ে করা ছাড়াই তারা বৈধ।

সূরা মুমিনূনের নিম্নোক্ত আয়াত কয়টিও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থক ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ -

"সেই মুমিনগণ মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নামাযে একাগ্র ও বিনয়ী ---- এবং যারা আপন লজ্জাস্থানগুলো সংরক্ষণ করে - কেবল আপন স্ত্রী ও দাসীরা ব্যতীত। কেননা স্ত্রী ও দাসীদের থেকে লজ্জাস্থানকে যারা সংরক্ষণ করেনা, তারা তিরস্কারযোগ্য নয়"।

এ আয়াতে মুমিনদের দুই ধরনের নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের স্ত্রীগণ। দ্বিতীয়তঃ দাসীগণ। স্ত্রী বলতে যে বিবাহিতা স্ত্রী বুঝা যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এখন 'দাসী' শব্দ দ্বারাও যদি বিবাহিত স্ত্রীই বুঝায় তাহলে তাদেরকে স্ত্রীদের থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন। কাজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হচ্ছে যে, দাসীদের সাথে শুধুমাত্র মালিকানা স্বত্বের ভিত্তিতেই সঙ্গম করা জায়েয। (তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৭৫ হিঃ জুন ১৯৫৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)

বাকদানের শরয়ী বিধান

প্রশ্ন ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে বাকদানের মর্যাদা কি? লোকেরা এটাকে ঈজাব-কবুলের মর্যাদা দিয়ে থাকে। যদি মেয়ের বাপ-মা নির্ধারিত কথা রদ করে দেয়, তাহলে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা পর্যন্ত ঘটে যায়।

এমতাবস্থায় যদি বাপ-মা সংশ্লিষ্ট মেয়ের বিবাহ অন্যত্র দিয়ে দেয়, তাহলে কি তা ঠিক হবে?

জবাব ঃ বাকদান নিছক এই মর্মে একটি উক্তি ও অংগীকার যে, ভবিষ্যতে এ মেয়ের বিবাহ অমুক ব্যক্তির সাথে দেয়া হবে। এটা যথার্থ অর্থে বিবাহ নয়। অবশ্য এতে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ধরনের চুক্তি হয়, যা ভংগ করা ঠিক নয়। তবে সংগত কারণ থাকলে কোনো চুক্তি ভংগ করা যায়। কথাবার্তা ও অংগীকারের পর উভয় পক্ষের কোনো এক পক্ষের কাছে দ্বিতীয় পক্ষের এমন কোনো দোষ যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, যে সম্পর্কে আগে জানা ছিলোনা বা গোপন রাখা হয়েছিল, তাহলে নিঃসন্দেহে এ কথাবার্তা ও অংগীকার বাতিল করা যাবে। কিন্তু এ ধরনের কোনো সংগত কারণ ছাড়া অনর্থক বাতিল করা অথবা কোনো অযৌক্তিক কারণে চুক্তি ভংগ করা কখনো জায়েয নয়। অন্যান্য চুক্তি ভংগের মতো এটাও একটা চুক্তি ভংগ, এজন্য মানুষকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, মুহররম-সফর ১৩৭২, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

বহু বিবাহ এবং দাসীর প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ নিম্নলিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ –

"এতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবেনা বলে যদি আশংকা করো, তাহলে যে নারীকে ভালো লাগে বিয়ে করো, দুইজন, তিনজন অথবা চারজন। আর যদি আশংকা করো যে, ন্যায়বিচার করতে সমর্থ হবেনা, তাহলে একজন নারীকেই বিয়ে করো অথবা দাসী থাকলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকো।" (সূরা নিসা-আয়াত ঃ ৩)

জিজ্ঞাসা এইযে, এই আয়াতে যে চার বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হলো তা কি শুধু সেই ব্যক্তির জন্য যে এতীম বালিকাদের অভিভাবক এবং এই বালিকাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারবেনা বলে আশংকা অনুভব করে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এইযে, স্ত্রীদের বেলায় তো সংখ্যা নির্দিষ্ট রয়েছে এবং তা হলো সর্বোচ্চ চার স্ত্রী গ্রহণ করা চলে। কিন্তু দাসীদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর মতো সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তাদের কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এর কারণ কি? এর জবাব যদি এই হয়ে থাকে যে, যুদ্ধের সময় যেসব নারী বন্দিনী হয়ে আসবে তার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তাই দাসীদের সাথে

যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারেও সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাহলে আমার বক্তব্য এইযে, নিঃসন্দেহে একথা সত্য এবং এ দিকটি বিবেচনা করলে একজন মুসলমানের ভাগে কয়জন দাসী পড়বে, তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। একজনের অংশে দশজন আর একজনের অংশে বিশজনও পড়তে পারে। কিন্তু এইসব দাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যেতো। এক ব্যক্তির মালিকানায় দাসী যতোই থাকুক, সে তার মধ্য থেকে একজন বা দুইজনের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, যেমন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই স্বাধীনতা থাকার কারণে এক ব্যক্তি শুধু যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ হিসাবে বহু সংখ্যক দাসী লাভ করতে পারে তা নয়, বরং সে যতো সংখ্যক দাসী ইচ্ছা কিনতেও পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে একজন ভোগবিলাসী পুঁজিবাদী যতো খুশী দাসী কিনবার এবং তাদের দ্বারা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। দাসীদের সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই তাদের সাথে যৌনাচারের অবাধ ও সাধারণ অনুমতি দেয়ার কারণে সমাজে ঠিক সেই অনাচারই ঢুকে পড়ে, যাকে ইসলাম ব্যভিচার আখ্যা দিয়ে কঠিন শাস্তির যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। আমার ধারণা এইযে, এ কারণেই মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম সমাজে ব্যভিচারের দায়ে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড চালু থাকা সত্ত্বেও ভোগবিলাসের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। এই অনাচার রোধ করার মতো কোনো আইন ছিলোনা। এ কারণে আমরা উমাইয়া ও আব্বাসী শাসকদের হেরেমে অগণিত দাসদাসীর সমাবেশ দেখতে পাই এবং এসব দাসদাসীর দ্বারা সংঘটিত বহু কুটীল ষড়যন্ত্রের কাহিনী ইতিহাসে পড়ি। সুতরাং আমার মতে, দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের অনুমতিও যদি সংখ্যা নির্ধারণ সহকারে দেয়া হতো তাহলে মুসলমানদের সমাজে অনাচার ও ভোগবিলাসে এমন ব্যাপক প্রচলন ঘটতোনা। যাই হোক, অনুগ্রহপূর্বক ব্যাখ্যা করুন যে, কোন্ কারণে ও কোন্ কল্যাণের স্বার্থে শরিয়ত দাসীদের উপভোগ করার অনুমতি দিতে গিয়ে সংখ্যা নির্ধারণ করেনি?

এই সাথে আরো একটি জিজ্ঞাসা এইযে, দাসী যদি মোশরেক হয় তাহলে তার সাথে যৌন সম্ভোগ কি জায়েয আছে?

জবাব ঃ[১] সূরা নিসার আয়াত ঃ وان خفتم الاتقسطوا فى اليتامى (তোমরা এতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা এরূপ আশংকা যদি

১. এ ধরনের প্রশ্ন ও তার উত্তর দ্বারা লোকেরা অনেক সময় এরূপ ধারণা করে বসে যে, এসব সমস্যা বোধ হয় বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্য আলোচিত হচ্ছে। অথচ মূলত এ ধরনের সমস্যা এমন একটি যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট, যখন পৃথিবীতে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের রীতি প্রচলিত হয়নি। এমনকি পণ্যের বিনিময়ে আপোষরফা করাও

বোধ করো...) সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনে বিস্তারিত টীকা লিখেছি। সেটার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। আপনি বরঞ্চ উক্ত টীকা পড়ে দেখুন। তবে আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং তা সাহাবা ও তাবেঈনদের থেকে বর্ণিত। একটি অর্থ এইযে, 'তোমরা যদি এতীমদের সাথে ন্যায়বিচার করতে সমর্থ না হও, তাহলে এমন নারীদেরকে বিয়ে করো, যাদের স্বামী মারা গেছে এবং ছোট ছোট এতীম শিশু রেখে গেছে।' এ অর্থটা অধিকতর মানানসই বলে মনে হয়। কারণ এ সূরা ওহোদ যুদ্ধের পরে নাজিল হয় এবং সেই যুদ্ধে বহুসংখ্যক মুসলমান শহীদ হন। তবে ইসলামে যে চার বিয়ে করার অনুমতি রয়েছে, একই সাথে চারটার বেশী স্ত্রী রাখা যে চলেনা, আর এই ঘোষণার সাথে যে এতীমদের কোনো সম্পর্ক নেই, সেকথা শুধু আলোচ্য আয়াত থেকেই জানা যায়না, বরং এ আয়াত নাযিল হওয়ার অব্যবহিত পর রসূল সা.-এর যে বাস্তব ও বাচনিক ব্যাখ্যা দেন তা থেকেও তা বুঝা যায়। এ আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন তিনি চারটের বেশি স্ত্রী যাদের ছিলো তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, চারের অতিরিক্ত যে কয়জন স্ত্রী আছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে এবং শুধুমাত্র চারজন স্ত্রী বহাল রাখতে। অথচ এ সময় এতীমদের কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলনা। তাছাড়া রসূল সা.-এর জীবদ্দশায় বহু সাহাবী উক্ত চারের সীমার ভেতরে একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তিনি তাদের কাউকে একথা বলেননি যে, তোমার যখন এতীম শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব নেই, তখন তোমার এই অনুমতি কাজে লাগানোর অধিকার নেই। এ কারণে সাহাবায়ে কিরামের সময়

শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিলো। বর্তমান সময়ে এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা এখন দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার খুলতে চাই। এর উদ্দেশ্য শুধু এইযে, যে যুগে যুদ্ধবন্দী বিনিময় ও পণ্যের মাধ্যমে আপোষরফা করা সম্ভব ছিলোনা, সে যুগে ইসলাম এই জটিল সমস্যার সমাধান কিভাবে করেছিল তা বিশ্লেষণ করতে চাই। তাছাড়া ইসলামের প্রবর্তিত এই সমাধানগুলো নিয়ে অজ্ঞ লোকেরা যেসব আপত্তি উথাপন করে থাকে তা নিরসন করাও এর একটি অন্যতম লক্ষ্য। আমরা যখনই এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি এ উদ্দেশ্যেই করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে তৎপর এক শ্রেণীর লোক জেনেবুঝে এর এরূপ কদর্থ করে থাকে যে, আমরা আজকাল এ যুগেও দাসদাসী প্রথা চালু রাখতে ইচ্ছুক, চাই বন্দী বিনিময় এবং পণের আদান-প্রদান সম্ভব হোক বা না হোক। আমরা জানি, এই শ্রেণীর লোকেরা কোনো ভুল বুঝাবুঝির কারণে একথা বলেনা। আমরা তাদের কাছে এতোটা লজ্জাশরমেরও আশা করিনা যে, আমাদের পক্ষ থেকে এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার পর তারা তাদের অপপ্রচারে ক্ষান্ত হবে। তা সত্ত্বেও এই ব্যাখ্য বিশ্লেষণ এজন্য করা হচ্ছে যে, যেসব সরলপ্রাণ মানুষ তাদের অপপ্রচারে কোনো বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন, তাদের বিভ্রান্তি অপনোদিত হোক।

থেকে নিয়ে পরবর্তী সময় পর্যন্ত সকল মুসলিম আইনবেত্তা এ কথাই বুঝেছেন যে, এ আয়াত এক সাথে চারটি বিয়ে করার অনুমতি দেয়। চারটির বেশি বিয়ে কোনোক্রমেই বৈধ নয়। তাঁরা এটাও বুঝেছেন যে, চারটা বিয়ের অনুমতি শর্তহীন। এতীমদের কোনো দায়দায়িত্ব এর জন্য শর্ত নয়। স্বয়ং হুজুর সা. একাধিক বিয়ে করেছেন এবং তার কোনোটির সাথেই এতীমদের বিষয় জড়িত ছিলোনা।

দাসীদের ব্যাপারে আপনি প্রস্তাব দিয়েছেন যে, দাসী রাখার ব্যাপারে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা না থাকুক, তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সংখ্যা নির্ধারণ করা উচিত ছিলো। এ প্রস্তাবে আপনি শুধু একটি দিক লক্ষ্য রেখেছেন, অন্যান্য দিক আপনি ভেবে দেখেননি। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সংখ্যা নির্ধারণ করা হতো, তারা বাদে অবশিষ্ট নারীদের সমস্যার কি সমাধান দেয়া যেতো? পুরুষের সংসর্গ লাভের সুযোগ থেকে কি তাদেরকে চিরতরে বঞ্চিত রাখা হতো? না তাদেরকে গৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরে আপন যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য অবৈধ উপায় অনুসন্ধানের স্বাধীনতা দেয়া হতো? অথবা তাদেরকে অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে মালিকদেরকে আইনত বাধ্য করা হতো এবং বন্দিনী নারীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব ছাড়াও তাদের ওপর বাড়তি এ দায়িত্বটাও অর্পণ করা হতো যে, দাসীদেরকে বিয়ে করতে রাজী হয় এমন স্বামীও তারা খুঁজে বেড়াবে?

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের জবাব এইযে, দাসীদের সাথে যৌন সম্ভোগের জন্য তাদের আহলে কিতাব হওয়া শর্ত নয়। যুক্তির নিরিখেও এরূপ শর্ত আরোপ করা বাঞ্ছনীয় ছিলোনা। তা যদি হতো তাহলে যুদ্ধবন্দীদেরকে (বন্দী বিনিময়ের সম্ভাবনা না থাকা অবস্থায়) ব্যক্তি মালিকানায় সমর্পণ করা ও মালিকদেরকে তাদের সাথে যৌন সম্ভোগের অনুমতি প্রদানের পেছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, তার অর্ধেকের বেশি ব্যর্থ হয়ে যেতো। কেননা সেক্ষেত্রে সেসব নারীকেই মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতো, যারা আহলে কিতাব তথা ইহুদী বা খৃষ্টানদের মধ্য থেকে বন্দিনী হয়ে এসেছিল। যারা আহলে কিতাব নয় তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হলে মুসলমানদের অন্য আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। সেটি এইযে, বন্দিনী নারীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটা অতিরিক্ত সমস্যায় পরিণত হওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায়? (তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল ১৩৭৫ হিঃ, জুন ১৯৫৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)।

যৌতুক

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! যৌতুক সম্পর্কে শরীয়তের বক্তব্য কি?

জবাব ঃ যৌতুক দেয়া নাজায়েয নয়, কিন্তু আজকাল এটাকে যে রূপ দেয়া হয়েছে তা খুবই মন্দ ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সা. যৌতুক দিতে বাধ্য করেননি। যৌতুক না দিলেও বিয়ে হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে একারণেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সা. যে জিনিষ করতে বলেননি, মানুষ সেটা করে। অতপর বলে, 'করতে হয়'। কিন্তু আল্লাহ এবং রসূল সা. যেসব জিনিসের হুকুম করেছেন সেগুলোকে উপেক্ষা করা হয়। যেমন, মেয়েদের জন্যে উত্তরাধিকারের যে অংশ আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা তাদের দেয়া হয়না। এ ধরনের কর্মনীতি কখনো কল্যাণকর হতে পারেনা। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

অপরাধের জরিমানা ও কুফু প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ (১) কোনো অপরাধের (যেমন ব্যভিচার) শরিয়তবিহিত শাস্তি যদি কেউ ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে ভোগ করে, তাহলে সে কি আখেরাতে ঐ গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে?

(২) হাদীস ও কুরআনে এ ব্যাপারে কি কোনো মৌলিক বিধান আছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে কেবল নিজের বংশের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আমি বর-কনের সমতাকে এই অর্থে সমর্থন করি যে, উভয় পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত এবং অপ্রয়োজনীয় মানের পার্থক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

জবাব ঃ (১) শরিয়তের বিধিসম্মত দন্ড কার্যকরী হওয়ার পর আখেরাতে দন্ডিত ব্যক্তির গুনাহ মাফ হতে পারে কেবল তখনই, যখন সে সেই সাথে আল্লাহর কাছে তওবাও করবে এবং নিজেকে শুধরে নেবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তি চুরি করলো এবং তার হাত কেটে দেয়া হলো। কিন্তু সে নিজের পাপের জন্য আল্লাহর সামনে অনুশোচনা প্রকাশ করলোনা, তওবা করলোনা এবং চুরি পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞাও করলোনা, বরঞ্চ উল্টো মনে মনে শরিয়তের হাতকাটার আইনকেই গালাগাল দিতে লাগলো, তাহলে আল্লাহর দরবারে তার গুনাহ মাফ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

(২) কুরআনে বা হাদীসে এমন কোনো নির্দেশ নেই যে, প্রত্যেককে নিজ বংশের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে। বরং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এর বিপরীত কাজ করেছেন এমন নজীর রয়েছে। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১) রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড।

টেলিফোনে বিয়ে

প্রশ্ন ঃ আমাদের এখানে আজকাল টেলিফোনে বিয়ে হচ্ছে। মেহেরবানী

করে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের এ রীতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

জবাব ঃ এ এক অজ্ঞতা ও বোকামীসুলভ কাজ। এমনটি যারা করে, তারা টেলিফোনে আদালতের সাক্ষ্য দেয়ার চেষ্টা করে দেখুক। তখন তারা এ কাজটার স্বরূপ ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বিয়ে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর একজন নারী ও একজন পুরুষের গোটা যিন্দেগীর শান্তি ও স্থিতি নির্ভরশীল। কেবল টেলিফোনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একাজ সম্পন্ন করা কিছুতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারেনা। এমন কাজ তো কেবল সে ব্যক্তিই করতে পারে, যার কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্যে বর পাওয়া যায়না আর যখনি কোনো বীর পুরুষের প্রাসাদ থেকে টেলিফোন এলো, সাথে সাথেই টেলিফোনে তিনি কন্যাকে তার হাতে সঁপে দিলেন।

মনে রাখতে হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে টেলিফোনের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অবৈধ। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে বৈধ হবার জন্যে দু'জন ব্যক্তির সম্মুখে 'ইজাব' ও 'কবুল' হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন, টেলিফোনের বিয়ে বৈধ নয়। তাহলে ইতিপূর্বে যারা টেলিফোনে বিয়ে করেছে, তাদের বিয়ে কি নবায়ন করতে হবে, না অন্য কোনো উপায় আছে?

জবাব ঃ এ ব্যাপারে আমি কি বলবো? টেলিফোনের বিয়ের তো কোনো শরয়ী এবং আইনগত মর্যাদা নেই। এটাতো আইন এবং নিয়মনীতি বর্জিত কাজ। এতে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা এবং দীনি বিষয়ে অনুভূতিহীনতার বহিপ্রকাশ ঘটেছে। বরঞ্চ আমার মনে হয় শুধু অজ্ঞতাই নয়, যারা এমনটি করছে দীনের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই তারা একাজ করছে। যে ব্যক্তির বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার কষ্টটুকু সহ্য হয়না, সে কি বর হওয়ার যোগ্য? কি করে তার কাছে কেউ তার কন্যা বিয়ে দিতে পারে? যারা এ ধরনের ছেলেদের কাছে মেয়ে দিতে উদ্যত হয়, তাদের মেয়েরা কি তাদের জন্যে এতোই বোঝা হয়ে পড়েছে যে, তাদেরকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলতে হবে?

প্রশ্নকর্তা পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ এ পন্থার বিয়েতে কি আত্মীয়তা সফল হয়? জবাবে মাওলানা বলেন ঃ তাও সফল হতে পারেনা। যারা এভাবে স্বীয় কন্যাদের বিয়ে দেয়, তারা মূলত সফল আত্মীয়তার জন্যে এমনটি করেনা, বরঞ্চ বোকামীর কারণেই এরূপ করে থাকে। এমনও দেখা গেছে, কেউ কেউ ইংল্যান্ডে অবস্থানরত এদেশীয় কোনো লোকের কাছে টেলিফোনে কন্যা বিয়ে দিয়েছেন। অতপর মেয়ে সোখানে গিয়ে দেখলো বরটি আস্ত মুর্খ কিংবা যৎকিঞ্চিত পড়ালেখা করে সেখানে কোনো মিলে শ্রমিকের কাজ করছে। এখন অনন্যোপায় হয়ে মেয়েটি সেখানে বড় কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

এসময় অপর একজন বলতে লাগলেন ঃ "একটা অন্ধমোহে পড়ে লোকেরা এভাবে ইংল্যান্ডে অবস্থানরত ছেলেদের কাছে মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছে। শুধুমাত্র ছেলেটি ইংল্যান্ডে থাকে এ আকর্ষণে তারা এমনটি করছে। আমার জানামতে এরূপ একটা ঘটনা ঘটেছে। একবার এক ভদ্রলোক ইংল্যান্ডে অবস্থানরত এক যুবকের কাছে টেলিফোনে তার কন্যাকে বিয়ে দেন। অতপর মেয়ে সেখানে পৌঁছলে ছেলে তাকে অপছন্দ করে এবং সাথে সাথেই মেয়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দেয়।"

মওলানা বলেন ঃ পাশ্চাত্য দেশে যারা 'সোল ম্যারেজ' করে তারাও আদালতে উপস্থিত হয়ে তা করে। আর এসব মুসলমানরা টেলিফোনে বিয়ে করার রীতি চালু করছে। অথচ ইসলামের বৈবাহিক আইন অনুযায়ী 'ইজাব' এবং 'কবুল' অপরিহার্য জরুরী বিষয়। আর ইজাব কবুলের জন্যে সাক্ষীদের সশরীরে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। প্রশ্ন হচ্ছে, টেলিফোনের বিয়েতে এ স্বাক্ষ্য কিভাবে হবে? (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড, সাপ্তাহিক এশিয়া ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ ঈসায়ী)

বিয়ের সুন্নত

প্রশ্ন ঃ বৃদ্ধ মায়ের সেবা করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি বিয়ে না করে এবং মাও যদি বিয়েতে রাজী না হয় তবে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? আমার বয়স এখন ত্রিশ বছর। আপনার "পর্দা ও ইসলাম" বই পড়ার পর বিয়ের গুরুত্ব অনুভব করছি। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আমার সম্পর্কে আপনার রায় কি?

জবাব ঃ বিয়ে করা ফরয নয় বটে, তবে তা সুন্নত এবং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। বিয়ে না করার ফলে অনেক অনিষ্টের সৃষ্টি হয়। মা বৃদ্ধ হলে তার খেদমত করা আপনার জন্য ফরয। কিন্তু কেবলমাত্র এ কারণেই বিয়ে না করাটা ঠিক নয়। বিয়ের পর অধিকতর ভালোভাবে মায়ের সেবা করা যায়। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

রসূল সা.-এর একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা ও স্বার্থকতা

প্রশ্ন ঃ আমি বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসী। এখানে খৃষ্টানদের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে প্রায়ই আলাপ আলোচনা হয়ে থাকে। তারা বিশেষত তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ একাধিক বিয়ের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই তর্কে লিপ্ত হয়। এ জিনিসটা কিছুতেই তাদের বুঝে আসেনা। এ প্রসঙ্গে তারা আমাদের রসূল রাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয়টি বিয়ের ওপর নানা রকম আপত্তি তোলে এবং বলে, তিনি হযরত আয়েশাকে অত্যন্ত অল্প বয়সে বিয়ে করেন। এর কি প্রয়োজন ছিলো তা তাদের কাছে দুর্বোধ্য।

আমি এবং আমার অন্য কতক মুসলিম বন্ধু সাধ্যমত তাদের উত্তর দিতে চেষ্টা করি। তবে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তাদেরকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারিনি। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেন এবং একাধিক বিয়ে, বিশেষত রসূল রাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় এমন তথ্যাদি ও দলীল প্রমাণ সরবরাহ করেন, তাহলে আমাদের আলোচনা ও যুক্তি প্রদর্শন সহজতর হবে এবং আমরা ইনশাআল্লাহ সকল বিষয়ে সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হবো।

জবাব ঃ এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বহুবিবাহকে একটা ধর্মীয় ও সামাজিক অনাচার হিসেবে গণ্য করে এবং তাদের অনুকরণে কিছু পাশ্চাত্যমনা মুসলমানও এ নিয়ে নাক সিটকায়। অথচ আধুনিক খৃষ্টবাদের আবির্ভাবের আগে মানবেতিহাসে কখনো বহু বিবাহকে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দিয়ে দূষণীয়, অনভিপ্রেত কিংবা খোদাভীরুতার পরিপন্থী মনে করা হয়নি। আপনি ঐসব আপত্তি উত্থাপনকারী খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এবং নিজেও বাইবেল পড়ে দেখবেন যে, তাতে হযরত ইবরাহীম আ., হযরত ইসহাক আ., হযরত ইয়াকুব আ. এবং অন্যান্য নবীগণের একাধিক স্ত্রী থাকার কথা উল্লেখ আছে কিনা? আমাদের রসূল রাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নয় বিয়ে সম্পর্কে যারা আপত্তি তোলে, ভাবতে অবাক লাগে, তাদের মনে বাইবেলে বর্ণিত এসব বহু বিবাহে কোনো আপত্তি ওঠেনা।

আসল ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্যের আধুনিক জাতিগুলোর মাথায় একদিকে চড়াও হয়ে আছে যৌন আকর্ষণ ও কামোন্মত্ততা, অপরদিকে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদের মনমগজ। এজন্য তারা ভাবতে বাধ্য হয় যে, বিয়ের উদ্দেশ্য নিছক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ইসলামের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত শিক্ষা ও নীতিমালা এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনবৃত্তান্ত যে ব্যক্তিই নিরপেক্ষ ও খোলা মনে অভিনিবেশ সহকারে পড়বে, সে সহজেই বুঝতে পারবে, ইসলাম বিয়ের নির্দেশ দেয়ার সময় বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক লক্ষ্য সামনে রেখেছে। অধ্যয়নকারী একথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিছক বিয়ের জন্যই বিয়ে করেননি, বরং প্রত্যেক বিয়েতেই কোনো না কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ও ইসলামের সামষ্টিক স্বার্থ নিহিত ছিলো।

তিনি প্রথম বিয়ে করেন একাধিক সন্তানের জননী, বিধবা ও তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের বয়জ্যেষ্ঠা হযরত খাদীজাকে। এ বিয়ে করার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স পঁচিশ এবং খাদীজার রা.-এর বয়স

ছিলো চল্লিশ। এমন টগবগে যৌবনেও তাঁর চরিত্র এতো পবিত্র ও নিষ্কলুষ ছিলো যে, কাফিররাও তা স্বীকার করতো। তাছাড়া তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন তা থেকে তাকে থামাতে মুশরিকরা যে আপোসমূলক প্রস্তাব দেয়, তাতে এই প্রলোভনও দেয়া হয়েছিল যে, হেজাযের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত খাদীজাও তাঁর চরিত্র ও সততায় মুগ্ধ হয়ে নবুয়্যত লাভের আগেই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। অথচ এই বয়সে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কোনো ইচ্ছে ও প্রয়োজন ছিলোনা। হযরত খাদীজা তিনি একজন অত্যন্ত ধনবতী মহিলা ছিলেন এবং ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছে করলে যে কোনো কুমারী যুবতীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি হযরত খাদীজার নির্মল ও অনমনীয় চরিত্রের জন্য তাঁকে বিয়ে করেন এবং তিনি বেঁচে থাকতে অন্য কোনো বিয়ে করেননি। ইতিহাস সাক্ষী, এই বিয়ে অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিল। হযরত খাদীজা রসূল রাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যত লাভের পর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন এবং যতোদিন জীবিত ছিলেন নিজের জীবন ও সহায়সম্পদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন।

হযরত খাদীজার ইন্তিকালের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকজন প্রবীণ মহিলা হযরত সওদাকে বিয়ে করেন, যাতে তিনি তাঁর অল্প বয়স্কা কন্যাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালন করতে পারেন এবং অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম সম্পাদন করতে পারেন। হযরত সওদাও অত্যন্ত মজবুত ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারীণী ছিলেন। শুধুমাত্র ইসলামের জন্য তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং বহু কষ্ট ও বিপদ মুসিবত সহ্য করেন। চার বছর পর্যন্ত একমাত্র তিনিই ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী।

এরপর তিনি এমন একজন অল্পবয়স্কা মেয়েকে গৃহিনী করে আনার প্রয়োজন অনুভব করেন, যিনি ইসলামী পরিবেশেই জন্মেছেন এবং নবীগৃহে এসে বড় হবেন। এতে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও মানসিক বিকাশ সর্বদিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানের হবে এবং তিনি মুসলিম নারী ও পুরুষদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা নির্বাচিত হলেন। তাঁর পিতামাতার গৃহ তো আগে থেকেই ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত ছিলো। আর শৈশবেই তাঁকে নবীগৃহে পাঠিয়ে দেয়া হলো, যাতে তার নির্মল মানসপটে ইসলামী আদর্শের ছবি অক্ষয়ভাবে খোদিত হয়ে যায়। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, হযরত আয়েশা সেই কৈশরেই কুরআন ও

সুন্নাহর জ্ঞানে গভীর পারদর্শী হয়ে ওঠেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান জীবন চরিত এবং তাঁর বাণী ও কর্মের এক বিরাট অংশকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন এবং শিক্ষাদান ও বর্ণনার মাধ্যমে তা সমগ্র উম্মাহর নিকট হস্তান্তর করেন। হযরত আয়েশার নিজস্ব উক্তি ও বাস্তব কর্মের দৃষ্টান্ত ছাড়াও দু'হাজার দু'শো দশটি (২,২১০) বিশুদ্ধ হাদীস তিনি সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা ব্যতীত আর কোনো পুরুষ কিংবা মহিলা সাহাবী এর চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেননি। হযরত আয়েশার কোনো সন্তান ছিলোনা। তিনি বহু শিশুকে লালন পালন করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষা দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত শুধুমাত্র মৌখিক প্রচার ও উপদেশ বিতরণের মধ্য সীমাবদ্ধ ছিলোনা। এটি ছিলো গোটা সমাজ জীবনে কার্যকর বিপ্লব সংঘটনের লক্ষ্যে পরিচালিত এক মরণপণ সংগ্রামের ভিত্তি ও সূচনা। এই পটভূমিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর ঘনিষ্ঠতম ও সর্বাপেক্ষা নিবেদিত প্রাণ সঙ্গীদের সাথে আত্মীয়তা স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজে বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করা খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্ববহ কাজ ছিলো। তাই একদিকে তিনি হযরত উসমান রা. ও হযরত আলী রা.-এর সাথে নিজের মেয়েদের বিয়ে দেন, অপরদিকে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা.-এর মেয়েকে নিজে বিয়ে করেন। এভাবে এই চার জনের সাথেই নিজের সম্পর্ক অটুট ও চিরস্থায়ী করেন।

অনুরূপভাবে কয়েকটি প্রভাবশালী নওমুসলিম গোত্রের সাথেও আত্মীয়তা স্থাপন করে তাদেরকে ইসলামের সমর্থকে পরিণত করেন এবং তাদের মধ্যে যারা ইসলামের বিরোধী ছিলো, তাদের বিরোধিতার তেজ কমান। হযরত উম্মে সালমা ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ বুদ্ধিমতী মুমিন মহিলা। কিন্তু বনু মখযুম গোত্রের যে পরিবারে আবু জেহেলের জন্ম, তিনি সেই পরিবারেরই সদস্যা ছিলেন। হযরত উম্মে হাবীবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজের জীবনের ওপর কতো বড় ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন এবং কতো বলিষ্ঠতা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করেছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অথচ তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সময় পর্যন্ত কাফিরদের সরদার ছিলেন। এ দুই মহীয়সী মহিলাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী হিসেবে বরণ করায় একদিকে যেমন উভয়ের ব্যক্তিগত গুণাবলী স্বীকৃতি পেয়েছিল, অপরদিকে এর ফলে এই উভয় পরিবারের চরম শত্রুসুলভ তৎপরতারও অবসান ঘটেছিল।

কয়েকজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা সাহাবীকে বিয়ে করে রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মনতুষ্টি সাধন করেন। দত্তক গ্রহণের জাহেলী প্রথা উচ্ছেদের খাতিরে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পালিত পুত্র হযরত যায়েদের তালাক দেয়া স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করার নির্দেশ দেন। হযরত যয়নাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো বোন ছিলেন। ইচ্ছে করলে তিনি হযরত যায়েদের আগে তাঁকে স্ত্রীরূপে বরণ করতে পারতেন। কিন্তু বংশগত উঁচু নীচুর ভোদাভেদ খতম করার জন্য তিনি মুক্ত গোলাম যায়েদের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। এরপর যখন এই দম্পতির মধ্যে কিছুতেই বনিবনা হলোনা এবং তালাক অনিবার্য হয়ে পড়লো, তখন তিনি যয়নাবকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে একদিকে তাঁর মনের প্রবোধের ব্যবস্থা করলেন, অপরদিকে পালিত পুত্রকে আসল পুত্ররূপে গণ্য করার জাহেলী প্রথারও উচ্ছেদ ঘটালেন।

একই নামের আর এক উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে খুযায়মাকে বিধবা হওয়ার পর বিয়ে করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শোকাহত মনে সান্তনা দেন। তাঁর তৃতীয় ও সর্বশেষ স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাস ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কিন্তু নবীর সহধর্মিনী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের মাত্র দু'তিন মাস পর তিনি জান্নাতবাসিনী হন। এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত উম্মে সালমার স্বামী আবু সালমাও ওহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে ইন্তিকাল করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালমাকে বিয়ে করেন এবং তার চারটি এতিম শিশু সন্তানকেও নিজের অভিভাবকত্বে গ্রহণ ও লালন পালন করেন। হযরত উম্মে হাবীবার স্বামী প্রথমে মুসলমান হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় হযরত উম্মে হাবীবা নিজের শিশু কন্যা হাবীবাকে নিয়ে বিদেশে চরম অসহায় অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হন। একথা জানতে পেরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়াতেই তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নাজ্জাশী স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদন করে উম্মে হাবীবাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দেন। হাবীবাও তাঁর মায়ের সাথে নবীগৃহে আসে এবং পালিত কন্যা হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিভাবকত্বে বড় হয়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুয়াইরিয়া ছিলেন ইহুদী গোত্র বনুল মুসতালিকের সরদার হারেস বিন আবি যিরারের কন্যা। মুরাইসীর যুদ্ধে তিনি যুদ্ধবন্দিনী হয়ে সাহাবী সাবেত বিন কায়েসের হাতে অর্পিত হন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পারিবারিক মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মুক্তিপণ নিজেই দিয়ে দেন এবং তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করেন। এর

তাৎক্ষণিক সুফল দাঁড়ালো এইযে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁর গোত্রের একশোরও বেশি যুদ্ধবন্দীর সবাইকে মুক্তি দেন।

হযরত সুফিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ। তিনি ছিলেন যুদ্ধবন্দিনী। প্রথমে তিনি হযরত দিহইয়া কালবীর ভাগে পড়েন। কিন্তু তার পিতাও ছিলো ইহুদী নেতা ও গোত্রপতি। এজন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ থেকেও মুক্তিপণ পরিশোধ করেন এবং তাকে বিয়ে করেন, যাতে তার মন আহত না হয়। এ আত্মীয়তার ফলে ইহুদীদের শত্রুতার তীব্রতাও কমে যায়।

মোটকথা, যতো চিন্তাগবেষণাই করা হবে, একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কয়টি বিয়েই করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে ইসলাম ও মুসলিম জাতির কোনো না কোনো বৃহত্তর স্বার্থ, মহত্তর কল্যাণ এবং গভীরতর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতা নিহিত ছিলো। আর এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশাই ছিলেন কুমারী, আর সবাই হয় বিধবা, না হয় তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামীগৃহের পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। কিন্তু যাদের স্নায়ুতে নারীর কেবল যৌনতার দিকটিই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে এবং পেটের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই যাদের চোখে পড়েনা, তারা যদি এসব মহৎ উদ্দেশ্য ও কল্যাণের দিকগুলো দেখতে না পায়, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বিয়েতেই ছিলো, তবে তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। প্রাগ-বিয়ে যৌন সম্পর্ক, বিয়ে বহির্ভূত লাম্পট্য এবং স্ত্রী থাকা অবস্থায় রক্ষিতা পোষা যাদের নৈমিত্তিক ব্যাপার, তারা কোন্ মুখে বহু বিবাহ রীতির সমালোচনা করে- ভেবে পাইনা! (তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬৮, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড)।

দাস দাসীর অর্থ

প্রশ্ন ঃ মেহেরবাণী করে দাস দাসীর অর্থ বুঝিয়ে দিন। বর্তমান যুগে এর প্রয়োগ কিভাবে হবে?

জবাব ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে দাস দাসী তারাই যাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে গ্রেফতার করে আনা হবে এবং তাদের দেশ ফিদিয়া বা যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের ছাড়িয়ে নেবে না। এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র তাদের কোনো ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেবে। এরূপ দাসীর গর্ভ থেকে তার যেসব সন্তান হবে তারা তার আইনসংগত সন্তান হবে এবং এরা তার ঠিক তেমনি উত্তরাধিকারী হবে, যেমন হয়ে থাকে স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানরা। মালিকের মৃত্যুর পর এই দাসী আইনগতভাবে মুক্ত হয়ে যাবে। কারণ মা সন্তানের গোলাম হতে পারেনা।

বর্তমানকালে এর প্রয়োগ না হবার কারণ হলো, বর্তমানকালে যুদ্ধবন্দী বিনিময় হয়। কিন্তু বর্তমানকালে যুদ্ধবন্দী বিনিময় মূলত সমান সংখ্যক

হয়ে থাকে। অর্থাৎ 'যতোজন দেবে ততোজন পাবে' এই নীতিতে হয়ে থাকে। কিন্তু এটা এ বিষয়ের কোনো উত্তম ও নির্ভরযোগ্য সমাধান নয়। যেমন ধরুন, এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হলো যে, কোনো জাতির যতোজন বন্দী অপর জাতির কাছে আটক পড়েছে, সে সেই জাতিকে পরাস্ত করে নিজ বন্দীদেরকে মুক্ত করে নিল। ফলে বিজয়ী জাতির কাছে পরাজিত জাতির যেসব বন্দী রয়েছে তাদেরকে আর বিনিময় করার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। তাছাড়া পরাজিত জাতির পক্ষে তার বন্দীদেরকে ফিদিয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়াও সম্ভব হয়না। এমতাবস্থায় বর্তমানকালের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বন্ধীদেরকে চিরজীবনের জন্যে Concentration Camp -এ রাখা হয়। চরম অমানবিকভাবে সেখানে তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা হয়। ইসলামী আইন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী আইন অনুযায়ী এরূপ বন্দীদেরকে লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় এবং একজনকে একজনের দায়িত্বে ন্যাস্ত করা হয়। বর্তমানকালে রাষ্ট্রীয় Concentration Camp-এ যে লোকদের নিক্ষেপ করা হয় তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করা হয়। সেখানে তাদের জীবন হয় পশুর চাইতে নিকৃষ্টতর এবং এখানে গোটা ব্যাপার এমন হয়ে দাঁড়ায় যেনো মানুষকে মানুষ নয় বরঞ্চ মেশিন পরিচালিত করছে। কিন্তু ব্যক্তিকে যদি ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যাস্ত করা হয়, তবে একজন মানুষকে পরিচালনার দায়িত্ব আর একজন মানুষের উপরই ন্যাস্ত হয়। এভাবে তাদের একজনের গুণাগুণের প্রভাব আরেক জনের উপর পড়ে থাকে। যেমন বন্দী লোকটি যদি ভালো লোক হয়ে থাকে আর তার মালিকও যদি হন উদার এবং দয়ালু, তবে তিনি অবশ্যি তার কদর করবেন। এ কারণেই ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছেন, একজন লোক গোলাম হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তার মালিক তার কদর করেছেন, তাকে শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করেছেন, সরকারী চাকরিতে নিয়েছেন, কোথাও গভর্নর বানিয়েছেন, কোথাও সেনাপতি বানিয়েছেন, আবার কোথাও নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছেন আবার কোথাও জামাই বানিয়েছেন। মূলত, ব্যক্তিকে ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যাস্ত করার ফলেই এরূপ হতে পেরেছে। যখন একজন ব্যক্তির ব্যাপার আরেকজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন মানবীয় গুণ বৈশিষ্ট উভয়ের মাঝে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু যেখানে হাজারো কয়েদীকে মাত্র কয়েকজন প্রহরীর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয় আর চারিদিকে মিনারের উপর মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হয়, যেনো কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত না করতে পারে। সেখানে আসলে মানুষের সাথে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট আচরণ করা হয়। এখন প্রত্যেক ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারে যে, তার নিকট ইসলামের যুদ্ধবন্দী নীতি পছন্দনীয়, নাকি বাধ্যতামূলক শ্রম ক্যাম্প? (যুগ জিজ্ঞসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

৬

দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন

স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকা

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! লোকেরা স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকেনা। নাম ধরে ডাকলে শরয়ী দিক থেকে কোনো অসুবিধা আছে কি?

জবাব ঃ এ ব্যাপারে শরয়ী দিক থেকে কোনো বিধি নিষেধ নেই। স্বয়ং নবী করীম সা. তাঁর স্ত্রীকে 'আয়েশা' বলে ডাকতেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে স্ত্রীকে নাম ধরে না ডাকার প্রথা হিন্দুদের থেকে আমদানী হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে পারেনা। এর প্রভাব মুসলমানদের মধ্যেও পড়েছে। ফলে মুসলমানদের ঘরে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদেরকে 'খোকার আব্বা' প্রভৃতি বলে সম্বোধন করে এবং স্বামীরা স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে 'খোকার মা' প্রভৃতি বলে। অনেক সময় এগুলোর প্রতি অনর্থক কড়াকড়ি করা হয়। এ প্রসংগে একটি চুটকি খ্যাতি লাভ করেছে। এক ব্যক্তির নাম ছিলো 'রহমতুল্লাহ'। তার স্ত্রী নামায শেষ করে সালাম ফিরাবার সময় 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ' বলার পরিবর্তে বলতো, 'আসসালামু আলাইকুম খোকার আব্বা'। কারণ তার ধারণা ছিলো 'রহমতুল্লাহ' বললে তার বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

নবী মহিষীদের অসংযত কথাবার্তা

প্রশ্ন ঃ আপনি সূরা তাহরীমের আয়াত :

إِنْ تَتُوبَا إِلَيْهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ -

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফহীমুল কুরআনে হযরত ওমরের যে রেওয়ায়েত বোখারী ও মুসনাদে আহমদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে হযরত ওমরের উক্তি (স্বীয় কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা.কে) لَا تُرَاجِعِي এর অনুবাদ করেছেন ঃ রসূল সা. এর সাথে তুমি 'অসংযত কথাবার্তা বলোনা' (তরজমানুল কুরআন, ভলিউম ৭২, সংখ্যা ৪, পৃঃ ২২৩, শেষ ছত্র)। যদিও

শুদ্ধ, তথাপি আমার অনুরোধ, আপনার এ শব্দটা বদলানোর কথা ভেবে দেখবেন। কেননা বিকারগ্রস্ত লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে অন্যান্য অপবাদের পাশাপাশি এ অপবাদও খুব জোরেশোরে রটাচ্ছে যে, মাওলানা মওদূদী নবী মহিয়ষীদেরকে 'অসংযতভাষিণী' বলে তাদের সাথে বেআদবী করেছেন। আমার পরামর্শ, আপনি যদি তাফহীমুল কুরআনে 'অসংযত কথাবার্তা বলোনা' -এর পরিবর্তে 'বাদানুবাদ করোনা' বা 'তর্ক করোনা' লিখে দেন, তাহলে অনুবাদেও তেমন হেরফের হবেনা, আবার বিকারগ্রস্ত লোকেরাও অপপ্রচারের সুযোগ পাবেনা।

জবাব ঃ হযরত ওমরের রেওয়ায়েত থেকে এ কথাতো প্রমাণিতই হয়ে গেছে যে, নবী মহিয়ষীগণ তাঁর সাথে বাদানুবাদ করা শুরু করে দিয়েছিলেন। এখন আপনি নিজেই বুঝতে পারেন, কোনো নিম্নপদস্থ লোক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাথে বাদানুবাদ করলে বা মুখে মুখে তর্ক করলে তাকে অসংযত ভাষণ ছাড়া আর কি বলা যায়? আর স্বয়ং রসূল সা. এর সাথে এ আচরণ হলেতো কথাই নেই। তখন কেউ যদি নবী মহিয়ষীদের মর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং রসূল সা.-এর চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন হন, তাহলে আমার আর বলার কিছু থাকেনা। একথাতো এমনিতেই বুঝা যায় যে, নবী মহিয়ষীদের আচরণ একটু বেশিরকম আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল বলেই প্রথমে হযরত ওমর রা. তাঁর মেয়ের ওপর রেগে যান, তারপর একে একে মহিয়ষীদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র সম্ভাব্য গজবের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেন। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে ২৯ দিন পর্যন্ত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এক নির্জন কক্ষে অবস্থান করেন। পরিস্থিতি এতোদূর গড়াতে দেখে সাহাবায়ে কিরাম উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবতে থাকেন, রসূল সা. তাঁর স্ত্রীদেরকে হয়তো তালাকই দিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও কুরআনে তাঁদেরকে হুঁশিয়ার করে দেন। এখন এ ঘটনাটা যদি নিছক মুখোমুখি তর্ক বা বাদানুবাদ করার মতো নগণ্য ব্যাপার হতো, তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, আমার ভাষা নিয়ে যারা আপত্তি তুলছেন, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন যে, তিনি এমন একটা ক্ষুদ্র ব্যাপারে একেবারে একটা আয়াত নাযিল করে ফেললেন? তারা কি রসূল সা. কে (নাউজুবিল্লাহ) এতোই রগচটা মনে করেন যে, একটা মামুলি ব্যাপার নিয়ে তিনি স্ত্রীদের ওপর এতো খাপ্পা হয়ে গেলেন? হযরত ওমরকেই বা তারা কি ভাবেন যে, সামান্য একটা ব্যাপারে নিজের মেয়েকে ধমকালেন এবং একে একে নবী মহিয়ষীদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখালেন? এসব ব্যাপারতো কুরআন ও

হাদীস থেকেই প্রমাণিত। আমার অপরাধ শুধু আমি এগুলো উদ্ধৃত করেছি। আপত্তিকারীদের কথা আর কি বলবো। আমার প্রত্যেক কথায় খুঁত ধরাই তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্য আমি স্থির করেছি, তাদের কোনো কথাতেই আর কর্ণপাত করবোনা। যতোদিন তাদের ইচ্ছা, নিজেদের আমলনামাকে কলুষিত করতে থাকুক। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৭০, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৫ম খন্ড)।

রাগের মাথায় মা বলা

প্রশ্ন ঃ রাগের মাথায় স্ত্রীকে মা বললে তো কাফফারা আদায় করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি মুখে না বলে মনে মনে বললো, তাকেও কি কাফফারা দিতে হবে?

জবাব ঃ মনে মনে বললে কাফফারা দিতে হয়না। কিন্তু তার মনে এরূপ কোনো কল্পনা হয়ে থাকলে তা দূর করে ফেলা উচিত এবং এসব ধারণা কল্পনা থেকে মনকে সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা উচিত। শরয়ী বিধান কেবল তখনই কার্যকর হয়, যখন কেউ কার্যত কোনো কথা বলে ফেলে, কিংবা কোনো কাজ করে ফেলে। মানুষের মনে তো কতো চিন্তাই উঁকি মারে। এমনকি কোনো কোনো সময় শিরকী এবং কুফরী চিন্তা পর্যন্ত উঁকি মারে। এসব চিন্তার উপর কোনো শরয়ী বিধান আরোপিত হয়না। কারণ এগুলোতো কেবল চিন্তা, মনে উদ্রেক হয় আবার চলে যায়। অবশ্য এসব কুচিন্তা মনে স্থান দেয়া ঠিক নয়। আল্লাহর নিকট এগুলো থেকে পানাহ্ চাওয়া উচিত। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

পারিবারিক আইন

প্রশ্ন ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন প্রসংগে কোনো কোনো লোক বলেন, "দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে সাধারণ অনুমতি রয়েছে"। মোল্লাদের এই ব্যাখ্যা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। "আমাদের মতে এই অনুমতির সাথে ইনসাফের শর্ত যুক্ত রয়েছে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হলে দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ নয়।" আজকাল পত্র পত্রিকায় এই মত ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে ঃ যেহেতু ইনসাফ করা সম্ভব নয় সে জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি নেই।

জবাব ঃ অবস্থা হচ্ছে এইযে, উর্দু এবং ইংরেজি পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। উর্দু পত্রিকাগুলোতে উভয় মত আসছে। অথচ ইংরেজি পত্রিকাগুলোতে যথাসম্ভব একমুখী বক্তব্যই উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাদের দাবি হচ্ছে গণতন্ত্রের। কিন্তু তাদের দৃষ্টি মোল্লাদের চাইতেও অধিক সংকীর্ণ। তাদের সংকীর্ণতা এতোই নিকৃষ্ট যে, অপর পক্ষের মতামত তারা

প্রকাশ হতেই দেয়না। এ ধরনের কর্মনীতির পরিণতি উর্দূ পত্রিকা পাঠক এবং ইংরেজি পত্রিকা পাঠকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? এর অশুভ পরিণতি জাতিকেও ভুগতে হবে এবং এই লোকদেরও ভুগতে হবে। এই চিন্তা ও মানসিক অনৈক্য সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ হবে। অথচ উভয় দিক জনগণের সামনে তুলে ধরা হলে একটি অভিন্ন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে পারতো এবং লোকেরা বুঝতে পারতো অপর পক্ষের মত কোন্ ধরনের যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যারা আপনার পেশকৃত উপরোক্ত দলিল পেশ করে তাদের একথাটা চিন্তা করা উচিত যে, কুরআন স্পষ্ট বলে দিয়েছে ঃ তোমরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারো। এখন কেউ যদি বলে- 'কুরআন অপর স্থানে বলেছে ঃ তোমরা স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেনা। এ কারণে একাধিক বিয়ে করতে পারবেনা।' তাহলে তার একথার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তাআলা নিজের বক্তব্য সাজিয়ে বলতে পারেননি। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কুরআনের যে স্থানে বলা হয়েছে, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবেনা, সেখানে তো মনের অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং ভালবাসার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। দাবি তো মনের ভিতরের অর্থাৎ ভালবাসার সাম্য রক্ষা করার নয়, বরঞ্চ আচরণের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত দাবি। দুঃখ হচ্ছে এ লোকগুলো যেমন মুর্খ তেমনি হঠকারী। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

পারিবারিক আইন ও শরিয়তের বিধান

প্রশ্ন ঃ মুসিলম পারিবারিক আইন বলবত হওয়ার পর কেউ যদি শরিয়ত মোতাবেক কোনো রকম তালাক দেয় তবে তা কি কার্যকর হবে? পারিবারিক আইনে তো তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

জবাব ঃ কোনো সরকারের প্রবর্তিত আইন দ্বারা শরিয়তের বিধিতে যেমন কোনো রদবদল ঘটতে পারেনা, তেমনি তা শরিয়তের বিকল্পও হতে পারেনা। তাই শরিয়তের বিধি মোতাবেক যে তালাক দেয়া হবে তা আল্লাহর চোখে এবং মুসলমানদের চোখে কার্যকর হয়ে যাবে, চাই সরকারি আইনে তা কার্যকর হোক বা না হোক। আর যে তালাক শরিয়ত অনুসারে কার্যকর হওয়ার যোগ্য নয়, সরকারি আইন তাকে কার্যকর সাব্যস্ত করলেও তা কখনো কার্যকর হবেনা। এখন মুসলমানরা বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের শরিয়ত মোতাবেক ফায়সালা করবেন, না সরকার

প্রবর্তিত পারিবারিক আইন মোতাবেক - সেটা তাদেরই ভেবে দেখা কর্তব্য। (তরজমানুল কুরআন, মে ১৯৬২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)।

বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের উত্তরাধিকার

প্রশ্ন ঃ কুদুরী গ্রন্থে (ফারায়েয পরিচ্ছেদ, ইজাব অধ্যায়) নিম্নবর্ণিত বাক্য আছে ঃ

ان تترك المرأة زوجا واما اوجده واخوة من امّ وخًا من اب- وامٌ فلزوج النصف وللام الدس ولاولا د الام الثلث ولاشيئ الاخوة للاب والامّ -

"যদি কোনো মহিলার ওয়ারিশদের মধ্যে তার স্বামী, মা অথবা দাদী ও বৈপিত্রেয় ভাই এবং সহোদর ভাই থাকে, তাহলে স্বামী পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় ভাইবোনরা পাবে এক তৃতীয়াংশ আর আপন ভাইয়েরা কিছুই পাবেনা।"

জিজ্ঞাসা হলো, এটাই কি হানাফীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? এবং এরই উপর কি ফতওয়া দেয়া হয়? এটা কি ন্যায়সংগত হলো যে, সহোদর ভাই বঞ্চিত হবে আর বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারিশ গণ্য হবে? এই সংগে 'কালালাহ' শব্দটির আইনগত সংজ্ঞাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবেন। দাদী ও মায়ের জীবিত থাকা অবস্থাতেও কি একজন মৃতকে কালালাহ গণ্য করা যেতে পারে?

জবাব ঃ আপনি কুদুরা থেকে যে মাসয়ালাটি উদ্ধৃত করেছেন, সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যদি কোনো মহিলার মৃত্যুর পর তার স্বামী, মা, সহোদর ভাইবোন ও বৈপিত্রেয় ভাইবোন থাকে তবে হযরত আলী রা., আবু মূসা আশয়ারী রা. এবং উবাই বিন কা'বের রা. ফতওয়া মতে স্বামী অর্ধেক, মা ষষ্টাংশ এবং বৈপিত্রেয় ভাইবোনকে এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে। আপন ভাইবোনেরা কিছুই পাবেনা। হানাফী আলেমগণ এ ফতওয়াই দিয়েছেন এবং এটাই তাদের চূড়ান্ত রায়। অপরদিকে হযরত উসমান রা. এবং যায়েদ বিন সাবেতের রা. মতে, এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সহোদর ও বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের মধ্যে সমান হারে বন্টিত হবে। হযরত উমর রা. প্রথমত প্রথম মতের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে দুটি রিওয়ায়েতের উল্লেখ আছে। কিন্তু অধিকতর নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েত এটাই যে তিনিও দ্বিতীয় মতের সমর্থক ছিলেন। কাযী শুরাইহ্ এরই উপর ফতওয়া দিয়েছেন। ইমাম মালিক শাফেয়ী এবং সুফিয়ান ছাওরীরও রা. এ

মত। হানাফীদের দলিল হলো - বৈপিত্রেয় ভাইবোন 'যাবিল ফুরুয' (অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম প্রাপক)। আর ভাইবোন 'আসাবা' (অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিক প্রাপক)। আসাবার উপর 'যাবিল ফুরুযের' অগ্রাধিকার থাকে। সুতরাং যাবিল ফুরুযকে দেয়ার পর কিছু অবশিষ্ট না থাকলে আসাবা কিছুই পাবেনা। দ্বিতীয় দলের দলিল হলো, উভয়ের মাঝে মায়ের স্থান হওয়ার কারণে আপন ও বৈপিত্রেয় ভাইবোন যখন সমান সমান, তখন অংশ পাওয়ার ব্যাপারে সমান সমান না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা।

কালালাহার যে অর্থ হযরত আবু বকর রা. বলেছেন এবং হযরত উমর রা. যা গ্রহণ করেছেন তাহলো ঃ – مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ
অর্থাৎ সেই কালালাহ, যার পুত্রও নেই, পিতাও নেই। এমনিভাবে মা কিংবা দাদীর অস্তিত্ব কোনো মৃতের কালালাহ হওয়ার বাধা নয়। (তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

আল্লাহর হক ও মাতাপিতার হক

প্রশ্ন ঃ আমি একটা জটিল মানসিক দ্বন্দ্বে আক্রান্ত এবং আপনার দিকনির্দেশনার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছি। জামায়াতের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কারণে আমাকে বাড়ি থেকে দূরে অবস্থান করতে হচ্ছে। মা বাবা খুবই পীড়াপীড়ি করছেন যাতে আমি তাদের কাছে থেকে ব্যবসায়িক কায় কারবারে নিয়োজিত হই। তারা আমাকে ক্রমাগত চিঠি লেখেন এবং এই বলে দোষারোপ করেন যে, তুমি মা-বাপের অধিকার উপেক্ষা করছো। আমি এ ব্যাপারে সবসময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকি। একদিকে মা বাপের অধিকার সম্পর্কে আমার অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র। অপরদিকে এটাও উপলব্ধি করি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালানোর জন্য আমার জামায়াতের কর্মী থাকা জরুরী। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সঠিক পরামর্শ দিন, যাতে বাড়াবাড়ি ও ঢিলেমি দু'টোই পরিহার করে চলতে পারি। আমি এটাও জানি যে, মতের পার্থক্যের জন্য বাড়ীতে আমার জীবন যাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। কিন্তু মা বাপ যে দাবি জানাচ্ছেন, তা মানা যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিহার্য হয়, তাহলে বাড়ীতে বসবাস করা যতো কষ্টকরই হোক তা সানন্দে বরদাশত করাই আমার জন্য উত্তম। আমার আব্বা আমার প্রতিটি তৎপরতায় আপত্তি তুলতে অভ্যস্ত। আর অত্যন্ত বিনম্র ভাষায়ও যদি তার জবাব দেই, তবে তাও শোনার মতো সহিষ্ণুতা তাঁর নেই।

জবাব ঃ মা বাপের আনুগত্য করা ও ইসলামের খিদমত করা, এই দু'টো

কাজই ভারসাম্য সহকারে করা জরুরী। কিন্তু কিছু সংখ্যক যুবকের পক্ষে এই ভারসাম্য রক্ষা করা এক উদ্বেগজনক সমস্যা। জামায়াতে ইসলামীর প্রতি এবং ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে জামায়াত সংগ্রামরত তার প্রতি যেসব যুবকের মাতা পিতা সহানুভূতিশীল নন, সেইসব যুবক কর্মীই সাধারণত এ সমস্যার সম্মুখীন। আমি প্রায়শ দেখেছি, কোনো ছেলে যদি সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত থাকে অথব কোনো লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে, তাহলে সে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও মা বাপ সহ্য করেন। তাকে কখনো বলেননা যে, তুমি চাকরি বা ব্যবসায় ছেড়ে দাও এবং বাড়ি এসে আমাদের খিদমত করো। ছেলে যদি দুর্নীতি ও পাপাচারে জড়িত থাকে তবুও তারা আপত্তি করার প্রয়োজন বোধ করেননা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এইযে, কোনো ছেলে যখন ইসলামের খিদমতে আত্মোৎসর্গ করে কেবল তখনই তাদের নিজেদের যাবতীয় অধিকারের কথা মনে পড়ে যায়। এমনকি জামায়াত যদি তাকে ন্যায্য পারিশ্রমিকও দেয় তবুও তারা জিদ ধরেন যে, ছেলে বাড়ী বসে তাদের "হক" আদায় করুক। এমনকি হক আদায় করাতেও তাদের মন শান্ত হয়না। তার প্রত্যেক কাজেই তাদের খটকা লাগে। তার কোনো খিদমতেই তাদের মন খুশি হয়না। বেশ কিছুকাল ধরেই আমি এ অবস্থা লক্ষ্য করছি। জামায়াতের বহুসংখ্যক যুবক এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে ও হচ্ছে।

আমি জানিনা আপনার সামনে আসলে কি ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আপনার বিবরণ থেকে যা বুঝা যাচ্ছে সেটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এটা আপনার মা-বাপের বাড়াবাড়ি। আপনি যেখানে কাজ করছেন, সেখানেই করতে থাকুন। টাকা পয়সা দিয়ে যতোটা খিদমত করা আপনার সাধ্যে কুলায়, তাও চালিয়ে যান। বরঞ্চ নিজে কষ্ট করে সাধ্যের বাইরেও কিছু পাঠাতে থাকুন। আর প্রয়োজন মতো কখনো কখনো গিয়ে বেড়িয়েও আসুন, তবে যদি আসল পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে থাকে এবং যথার্থই আপনার পিতা মাতার জন্য আপনার তাদের কাছে থেকে খিদমত করাই জরুরি হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কথা আপনার মেনে নেয়াই বাঞ্চনীয়। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৫৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৪র্থ খন্ড)।

হযরত ঈসা আ.- এর বিনা বাপে জন্মলাভ

প্রশ্ন ঃ একটি গোষ্ঠী এমন রয়েছে যারা স্বীকার করতে চায়না যে, হযরত ঈসা আ. বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের যুক্তি এইযে, ফেরেশতারা যখন হযরত মরিয়মকে এই মর্মে সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার পেট থেকে একটি পুতপবিত্র শিশু জন্মগ্রহণ করবে, তখন তিনি

জবাব দিলেন, আমার তো এখনো বিয়েই হয়নি, আর আমি ব্যভিচারিণীও নই। এই ফেরেশতা আগমনের সময়ে হযরত মরিয়মকে যদি কুমারী ধরে নেই এবং পরবর্তীকালে ইউসুফ নাজ্জারের সাথে তার বিয়ে এবং তার পরে হযরত ঈসার জন্ম হয়েছে বলে যদি মেনে নেই তাহলে কি আল্লহর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত হয়না?

তাদের দ্বিতীয় যুক্তি এইযে, আল্লাহ্ তাঁর চিরন্তন রীতি পরিবর্তন করেননা, এ বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে তাঁরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করে থাকেন ঃ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا -

"তুমি আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবেনা।"

তারা বলে যে, সন্তানদের জন্ম একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীর মিলনের ফল। সৃষ্টির শুরু থেকে এটাই আল্লাহর নিয়ম চলে আসছে এবং এ নিয়ম এখনো অব্যাহত রয়েছে।

অনুগ্রহপূর্বক এ যুক্তি কতোদূর সঠিক তা ব্যাখ্যা করবেন। সময়ের স্বল্পতা হেতু আপনি যদি বিস্তারিত জবাব দেয়া সমীচীন মনে না করেন, তাহলে কোন্ কোন্ কিতাব থেকে এ তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে তা জানালেই চলবে।

জবাব ঃ আমি স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে সূরা আল ইমরান ও সূরা মরিয়মের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ঈসা আ.-এর বিনাবাপে জন্মগ্রহণের সপক্ষে পর্যাপ্ত যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। আপনি উক্ত তাফসীর পড়ে দেখুন। এতে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, হযরত ঈসার আ. অলৌকিক জন্মের ঘটনাকে যারা অস্বীকার করে তাদের যুক্তি কতোখানি সঠিক।

আল্লাহ্ যে নিজের চিরন্তন নিয়মে কোনো রদবদল ঘটাননা, সেকথা ঠিক। কিন্তু কোন্টা আল্লাহর নিয়ম আর কোন্টা নয়, সে ফায়সালা করার অধিকার আমাদের নয়, স্বয়ং আল্লাহর। যেটাকে আল্লাহ্ স্বীয় নিয়ম বলে ঘোষণা করেন, তার বিপরীত কিছু হতে পারেনা। কিন্তু আমরা যেটাকে আল্লাহর নিয়ম বা বিধি বলে আখ্যায়িত করি, তার বিপরীত অনেক কিছুই হওয়া সম্ভব। কেননা আমাদের কথিত নিয়মবিধির আনুগত্য করার কোনো দায়দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেননি। আল্লাহ্ এমন কথা কখনোই বলেননি যে, পুরুষ ব্যতিরেকে কোনো নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম নেয়া আমার নিয়মের খেলাপ, কিংবা আমার বিধান এইযে, একমাত্র পুরুষের সাথে মিলনক্রমেই নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে,

প্রথম মানব দম্পতি কোন্ নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে জন্মেছিলেন? আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আমি হযরত আদম আ.-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তাঁর থেকেই তাঁর জীবন সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছি। এই দম্পতির জন্ম যদি আল্লাহর বিধানের বরখেলাপ না হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ঈসার আ. বিনা বাপে জন্মগ্রহণ আল্লাহর বিধানের বরখেলাপ হবে কেন? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজেও হযরত ঈসা আ.-এর জন্মকে হযরত আদম আ. এর জন্মের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ -

“প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দাবিতে ঈসার ব্যাপারটা আদমের মতোই, যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, অতপর বলেছিলেন ‘হও’ আর অমনি সে হয়ে গেলো” (আল-ইমরান, আয়াত ৫১)। (তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)।

পৃথিবীর নেককার নারী এবং হুর

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন, এ পৃথিবীর পবিত্র ও নেক্‌কার নারীরাই হবে হুর। কিন্তু বক্তব্য পরম্পরা থেকে একথাটা স্পষ্ট হয়না।

জবাব ঃ এ পৃথিবীর নেক্‌কার নারীরাই হুর হবে একথা আমি অকাট্যভাবে বলিনি। এ পৃথিবী থেকে যেসব বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে হয়তো বা তারাই বেহেশতের হুর হবে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এ পৃথিবীরই পবিত্র নেককার নারীদেরকে কুমারীরূপে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, হুরেরা হবে আল্লাহ তাআলার নতুন সৃষ্টি। অবস্থা এর যেটিই হোকনা কেন, একথা পরিষ্কার যে তারা হবে এমন সৃষ্টি যাদের প্রতি এ পৃথিবীতে মানুষ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

গিলমান প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ জান্নাতের গিলমানদের (সেবক) সম্পর্কে আপনি যে ধারণা পেশ করেছেন, তাহলো, শিশুরাই জান্নাতে গিলমান হিসেবে হাযির হবে। অথচ প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা অধিকতর নিষ্পাপ হয়ে থাকে। তাদের চাইতে কম মর্যাদার লোকদের পক্ষে তাদের সেবা পাওয়াটা কি করে সঠিক হতে পারে?

জবাব ঃ নিষ্পাপ হওয়া এক জিনিস আর বুঝবুদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করার পর স্বীয় ইচ্ছাকে অনুগত করে নেক পথে চলা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। শিশুরা যেহেতু এতোটা বুঝ ও চেতনা লাভ করেনা যাতে বুঝে শুনে সৎ বা অসৎ কাজ করতে পারে, তাই প্রকৃত অর্থে তাদের সব ধরনের কাজই এক রকম।

নিষ্পাপ হবার ভিত্তিতে লোকেরা বেহেশতে প্রবেশ করবেনা, বরঞ্চ সত্যদীনের পথে চলার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা চালানোর কারণে তারা এই পুরস্কার লাভ করবে। এ কারণে ঐ শিশুদের তুলনায় তাদের মর্যাদা হবে অনেক উপরে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

শিশুদের জান্নাত

প্রশ্ন ঃ আপনি দারসে কুরআনে বলেছেন, শিশুরাও জান্নাতে যাবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, অমুসলমানদের শিশু সন্তানরাও কি জান্নাতে যাবে?

জবাব ঃ রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খন্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি। সেটা দেখে নিন। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় অমুসলিমদের শিশু সন্তানরাও পিতা মাতাদের সাথে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু কোনো কোনো হাদীস এর বিপরীত। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

আমানত, ঋণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

প্রশ্ন ঃ

১. যিনি আমানত রাখতে দেন এবং যিনি আমানত রাখেন এদের উভয়কে কি কি নিয়ম নীতি মেনে চলা উচিত?

২. করযে হাসানা প্রদান এবং করযে হাসানা গ্রহণের ব্যাপারে কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত?

৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক অর্থ কি? শরীয়তে এর গুরুত্ব কতোটুকু?

জবাব ঃ

১. আমানত মূলত দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে রাখা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কারো নিকট কোনো আমানত রাখে, সে এ আস্থার ভিত্তিতেই রাখে যে, তিনি তার সাধ্যানুযায়ী পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে এর হিফাযত করবেন। আর যে ব্যক্তি আমানত সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনিও এ আস্থার ভিত্তিতেই তা গ্রহণ করেন যে, এই ব্যক্তি একটি পূর্ণ বৈধ আমানত তার নিকট গচ্ছিত রাখছে, কোনো চুরির মাল বা বিধি বহির্ভুত জিনিস তিনি তার কাছে রাখছেননা এবং এ আমানতের মাধ্যমে কোনো প্রকার ধোঁকা বা

প্রতারণায় ফেলে তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা তার নেই। অতএব উভয়ই পূর্ণভাবে তাদের এই পারস্পরিক আস্থার হক আদায় করবে। এছাড়া পালনীয় অন্য কোনো নিয়ম নীতি তাদের জন্যে নেই।

২. ঋণ দেয়া এবং নেয়ার ব্যাপারে একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলো, ঋণ লেনদেনের শর্তাবলী উভয় পক্ষের মধ্যে পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত হতে হবে। সময়সীমা নির্দিষ্ট হতে হবে। শর্তাবলী লিখিত হবে এবং নিয়মমাফিক সাক্ষী রাখতে হবে। ঋণদানকারী এর বিনিময়ে কোনো প্রকার ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করবেননা। ঋণ গ্রহণকারীকে যেনো এই উপকারের বিনিময়ে কোনো প্রকার অপদস্থ করা বা কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা না হয়। যদি ঋণ পরিশোধের সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ঋণ গ্রহীতা সত্যি সত্যি ঋণ পরিশোধের সামর্থ না রাখে তবে যতোটা সম্ভব তাকে অবকাশ দেয়া উচিত এবং ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব হচ্ছে এইযে, যখনি তিনি ঋণ পরিশোধের সামর্থ লাভ করবেন তখনি তিনি তা পরিশোধ করে দেবেন এবং বুঝে শুনে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কোনো প্রকার ঢিলেমী বা টালবাহানা করবেননা।

৩. 'আত্মীয়তার সম্পর্ক' অর্থ হলো, আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা, সদাচার, কল্যাণ কামনা এবং বৈধ সীমার ভিতর থেকে সাহায্য করা। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং এর মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করাও সম্ভব নয়। আসলে এটা সমাজের একটি প্রচলিত বাস্তবতা। এ সম্পর্কে প্রত্যেকটি লোক নিজেই অবগত। এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে সংকুচিত করা কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ করা সেইসব বড় বড় গুনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত, কুরআন ও হাদীসে যেগুলোর চরম নিন্দা করা হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল আউয়াল ঃ ১৩৬৫, এপ্রিল ১৯৪৬ ইং, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খন্ড)।

৭

জন্মনিয়ন্ত্রণ

জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন ঃ আজকাল জন্মনিয়ন্ত্রণকে পরিবার পরিকল্পনা শীর্ষক নতুন নাম দিয়ে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর সপক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তিপ্রমাণ ছাড়াও কারো কারো পক্ষ থেকে ধর্মীয় যুক্তিও দেয়া হচ্ছে। যেমন বলা হচ্ছে, হাদিসে 'আযল' (বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া)-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকে তার ওপর কিয়াস করা যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে পুরুষদেরকে বন্ধ্যাকরণের সুযোগ-সুবিধাও সরবরাহ করা হচ্ছে। এমন এক ধরনের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে যা দ্বারা পুরুষদের বীর্য সন্তান উৎপাদনের যোগ্যতা হারায়, কিন্তু যৌন আনন্দ বহাল থাকে। কারো কারো মতে এই পদ্ধতি শরিয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয় এবং তা সন্তান হত্যা বা গর্ভপাতের পর্যায়েও পড়েনা।

অনুগ্রহপূর্বক এ সম্পর্কে জানাবেন যে, আপনার মতে ইসলাম এই প্রক্রিয়া অনুমোদন করে কিনা?

জবাব ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কয়েক বছর আগে "ইসলাম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ" নামক একখানা বই লিখেছি। ঐ বইতে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়ের সকল দিক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি ঐ বইয়ের নতুন সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

আপনার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব এইযে, আযল সম্পর্কে রসূল সা. কে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং তার জবাবে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট। জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী প্রচার ও আন্দোলন তার লক্ষ্য ছিলোনা। এর দ্বারা এ ধরনের কোনো আন্দোলনের বিশেষ কোনো দর্শনও জনগণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছিলনা। তখন সকল পুরুষ ও নারীকে এমন পদ্ধতিও সেখানো হচ্ছিল না যা দ্বারা তারা যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও গর্ভধারণ রোধ করতে পারে। সে সময় গর্ভরোধক ওষুধ ও সরঞ্জামাদি নির্বিচারে সকল নারী-পুরুষের হাতের নাগালে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা

ছিলোনা। আযলের অনুমতি সংক্রান্ত যে বারটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার তাৎপর্য শুধু এতোটুকুই যে, কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা ও অসুবিধার কথা জানালো, আর রসূল সা. সেই বিশেষ অবস্থার আলোকে একটি উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিলেন। এ ধরনের যেসব জবাব রসূল সা.-এর পক্ষ থেকে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে যদি আযলের অনুমতি প্রমাণিতও হয়, তবুও তাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচলিত সর্বব্যাপী আন্দোলনের পক্ষে ব্যবহার করা চলেনা। কেননা আজকাল যে আন্দোলন চলছে তার পেছনে সক্রিয় রয়েছে যথারীতি একটা নির্ভেজাল বস্তুবাদী ও স্বেচ্ছাচারবাদী দর্শন। এ ধরনের কোনো আন্দোলন যদি রসূল সা.-এর জীবদ্দশায় চালু হতো তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি তার প্রতি অভিসম্পাত দিতেন এবং শির্ক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তিনি যেমন জিহাদ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধেও তেমনি জিহাদ করতেন। যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযল সংক্রান্ত উক্তিসমূহের অপব্যবহার করে তাকে বর্তমান জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে, তাদের প্রত্যেককে আমি বলি ঃ আল্লাহকে ভয় করুন এবং আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে এমন ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকুন। পাশ্চাত্যের খোদাহীন কৃষ্টি ও চিন্তাধারা যদি কারো অনুসরণ করতেই হয় তাহলে তাকে সোজাসোজি পাশ্চত্যের জীবন পদ্ধতি মনে করেই গ্রহণ করা উচিত। তা না করে তাকে আল্লাহ ও রসূলের প্রকৃত শিক্ষারূপে আখ্যায়িত করে আল্লাহর অধিকতর গজব ডেকে আনার চেষ্টা কেন?

ইসলাম যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক আন্দোলনকে অনুমোদন করেনা, তেমনি তা স্বেচ্ছায় বন্ধ হবার অনুমতিও দেয়না। জেনে শুনে বন্ধ্যা হওয়াতে দোষ নেই - একথা বলা আত্মহত্যাকে বৈধ বলার মতোই ভ্রান্ত। আসলে যারা মনে করে যে, মানুষ নিজের শরীর ও শারীরিক শক্তিসমূহের স্বয়ং মালিক এবং এই শরীর ও তার শক্তিসমূহের সাথে যা খুশী তাই করার অধিকার তার রয়েছে, কেবলমাত্র তারাই এ ধরনের কথা বলে থাকে। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণেই জাপানীরা আত্মহত্যাকে বৈধ মনে করে থাকে। আর এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই কোনো কোনো সাধক সন্যাসী স্বীয় হাত পা বা জিহ্বাকে পংগু করে দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকেই নিজের মালিক ও প্রভু মনে করে এবং এই শরীর ও তার শক্তিসমূহকে আল্লাহর আমানত বলে বিশ্বাস করে, তার দৃষ্টিতে নিজেকে বন্ধ্যা করে দেয়া অপর কাউকে জোরপূর্বক বন্ধ্যা করা অথবা কারো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়ার মতোই পাপ। (তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল ১৯৬০, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)।

মানব সন্তানের কৃত্রিম প্রজণন কি বৈধ?

প্রশ্ন ঃ রাসায়নিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পুরুষদের বীর্য যদি নারীর জরায়ুতে পৌঁছে দেয়া যায় এবং তাতে সন্তান পয়দা হয়, তবে একাজ অনিষ্টমুক্ত হওয়ার কারণে মুবাহ (বৈধ) হবে কি? একাজ যে করবে সে নারী কি ব্যাভিচারিণী বলে গণ্য হবে এবং তার উপর কি শরয়ী দন্ডবিধি কার্যকর হবে? বিবেচ্য বিষয় হলো, আজকের ফ্যাশন বিলাসী মহিলারা পুরুষদের থেকে মুক্ত থাকতে চায়। তারা যদি বৈজ্ঞানিক পন্থায় নিজেদের ভাগের বংশবৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করে তবে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া উচিত নয়। এ পন্থায় জন্মলাভকারী সন্তানকে আমেরিকায় আইনগতভাবে বৈধ সন্তান বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

জবাব ঃ যন্ত্রের সাহায্যে সন্তান প্রজণন বৈধ হওয়া তো দূরের কথা, নারীকে ঘোটকীর স্তরে নামিয়ে আনার মতো এ কর্মের চিত্র কল্পনা করাটাও আমার বরদাশ্তের বাইরে। আর যা-ই করুন না কেন, মানববংশীয় নারীকুল এবং মাদী পশুর মধ্যে অন্তত কিছুটা পার্থক্য রাখুন। আল্লাহ তায়ালা পশুদের জন্য বংশবৃদ্ধির যে পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটাও তো নর এবং মাদী পশুর মিলন। মানুষ তার স্বার্থপরতার কারণে মাদী ঘোড়াকে নর ঘোড়ার সাথে মিলনের এবং স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ না দিয়ে তার থেকে কেবল বংশৃদ্ধির উদ্দেশ্যই হাসিল করে। এখন মানুষও যদি তার নারীকূলের সাথে একই আচরণ করতে শুরু করে, তবে এটা মানবতার চরম অধপতন ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজকের যেসব 'ফ্যাশন বিলাসী' নারী পুরুষদের থেকে নির্ভরতা মুক্ত থাকতে চায়, প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম চিন্তা ও যৌন পরিবেশ তাদের প্রকৃতিকেই বিকৃত করে দিয়েছে। তা নাহলে তারা যদি সঠিক মানব প্রকৃতির উপরই অবস্থান করতো, তবে এ ধরনের হীন নিকৃষ্ট বাসনা তাদের অন্তরে স্থান দেয়া তো দূরের কথা, এহেন প্রস্তাবের কথা তারা শুনতেও চাইতোনা। শুধুমাত্র সন্তান জন্ম দেয়াই নারীর কাজ নয়, বরং নারী-পুরুষের সম্পর্ক মানব সভ্যতার প্রাকৃতিক বুনিয়াদ। আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই মানুষকে নারী ও পুরুয করে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, পরস্পর মিলিত হয়ে ঘর বাঁধে এবং ঘর থেকে বংশ ও বংশ থেকে সমাজ গঠিত ও বিকশিত হয়। এ মহান উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করে নারীদেরকে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বানানোতো আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়ারই শামিল, যাকে কুরআনে শয়তানী কর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেবল ঐসব সন্তানই বৈধ সন্তান, যারা বিবাহিত দম্পতির মিলনের মাধ্যমে জন্মলাভ করে। এরাই উত্তরাধিকার লাভকারী এবং বংশধারা সংরক্ষণকারী। যন্ত্রের সাহায্যে সন্তান জন্মদানকে বৈধ বলা যেতে পারেনা। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে হারামই বলা হবে। এরূপ সন্তান হবে পিতৃসূত্রবিহীন। পিতার উত্তরাধিকার থেকে সে হবে বঞ্চিত। আর এ হবে অকাট্যভাবে তার অধিকার বিনষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

অতপর একথাটাও চিন্তা করে দেখুন, যে শিশুর পিতৃত্বের দাবীদার কেউ থাকবেনা তার লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? কেবল মাত্র মা? আল্লাহ্ তায়ালা মানব শিশুর জন্যে মাতা পিতা, চাচা, মামা এবং দাদা নানা প্রভৃতি রূপে যেসব মুরব্বীদের সৃষ্টি করেছেন তাদের অর্ধেককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে কেবল মাতৃত্বের ধারার উপর তার যিম্মাদারী অর্পণ কি সুস্পষ্ট যুলুম নয়? পৃথিবী থেকে পিতার মুহব্বত, যিম্মাদারী এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্টকে নির্মূল করে দেয়ার মধ্যে মানবতার কোনো সেবা এবং কল্যাণ নিহিত আছে কি? নারী তার মাতৃত্বের যিম্মাদারীর উপর বহাল থাকবে কিন্তু পুরুষ চিরতরে পিতৃত্বের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এটাকি কখনো ইনসাফ হতে পারে? এই কার্যধারা যদি চালু হয়ে, যায় তাহলে নারীরা একদিন দাবী করে বসবে যে, এমন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার যাতে করে মানবশিশু আমাদের গর্ভে লালিত হওয়ার পরিবর্তে 'টেষ্ট টিউবে' লালিত হয়। অর্থাৎ মানুষ রাসায়নিক যন্ত্রপাতিতে পয়দা হতে থাকবে। এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পূর্ব পর্যন্ত নারীরা চাইবে যে, তাদের কেবল সন্তান জন্ম দেয়ার কষ্টটাই দেয়া হোক, এরপর মাতৃত্বের কোনো দায়িত্ব পালনে তারা প্রস্তুত থাকবেনা।

এ অবস্থা চালু হয়ে গেলে মানবশিশু 'গণ উৎপাদন' (Mass Production) নীতির ভিত্তিতে ফ্যাক্টরির ছাঁচে তৈরি হয়ে বের হবে যেমন করে বর্তমান যুগে জুতা আর মোজা তৈরি হচ্ছে। এটা হবে মানবতার অধপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়। মানুষ উৎপাদানের এসব কারখানা থেকে মানুষ নয় বরং দুপায়ী জানোয়ার জন্ম নেবে যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবীয় মর্যাদা এবং মানবীয় পবিত্র অনুভূতি ও চেতনা পর্যন্ত থাকবেনা। তার মধ্যে মানবীয় চরিত্রের সেইসব বহুবিধ গুণ ও বৈশিষ্ট পয়দা হবেনা, যা সমাজ ও সভ্যতার বহুবিধ প্রয়োজনের জন্যে অপরিহার্য। এসব কারখানা থেকে কোনো এরিস্টটল, ইবনে সীনা, গাযালী, রাযী, হেগেল এবং ক্যান্ট সৃষ্টি হওয়ার প্রত্যাশা করা যেতে পারেনা। আমার মতে, বস্তুবাদী সমাজ সভ্যতার

আওতায় বাস করার ফলে মানুষের মন মস্তিষ্কে এসব কুরুচিপূর্ণ ধ্বংসাত্মক ধ্যান ধারণা পয়দা হয়। মানুষের মনমস্তিষ্কে এ ধরনের ধ্যান ধারণা পয়দা হওয়াটাই একথা প্রমাণ করে যে, এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানুষের মন মগজে স্বয়ং মানুষের উচ্চ মর্যাদাকেই হীন ও লাঞ্ছিত করে দিয়েছে। (রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খন্ড)

গর্ভপাত

প্রশ্ন ঃ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, তাদের থেকে এই শপথও নাও যে, তারা নিজেদের সন্তান হত্যা করবেনা। এই আয়াতের দৃষ্টিতে গর্ভপাতও কি সন্তান হত্যার সংজ্ঞায় পড়ে?

জবাব ঃ অধিক সন্তান হবার ভয়ে যে গর্ভপাত করানো হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সন্তান হত্যারই শামিল। তবে মায়ের জীবন যদি চরম সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং গর্ভপাতই মায়ের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় বলে ডাক্তার মনে করেন তবে এমতাবস্থায় তা বৈধ এবং অভিমতের বাস্তবতা ও অবাস্তবতার ব্যাপারে ডাক্তার দায়ী। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

অর্থনৈতিক কারণে গর্ভনিরোধ হযরত আদমের দেহাকৃতি

প্রশ্ন ঃ আমি আমার এক বন্ধুর দু'টো প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিনি। অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করবেন। প্রশ্ন দু'টো নিম্নরূপ ঃ

১. আপনি সূরা বনী ইসরাইলের ৩১ নং আয়াতের তাফসীরে ন্যায়বিচার করেননি, বরং এ আয়াতে গিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক মতলব সিদ্ধির অনুকূল মর্ম উদ্ধার করেছেন। কেননা আয়াতটিতে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর হত্যা তাকেই করা যায়, যার প্রাণ আছে। ভ্রূণে প্রাণ আসে তখনই, যখন মাতৃগর্ভে দুই বিপরীত ভ্রূণ মিলিত হয় এবং একটি সজীব বস্তুর জন্ম হয়। যেহেতু জন্মনিরোধের পদ্ধতিগুলো সাধারণ উল্লিখিত ভ্রূণ সম্মিলনের আগেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাই যে জিনিসের অস্তিত্ব বা প্রাণ আদৌ নেই সে জিনিসের হত্যা কিভাবে সংঘটিত হয়? আয়াতটি নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا –

'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে খাদ্যাভাবের ভয়ে হত্যা করোনা। আমি তাদেরকেও জীবিকা দিয়ে থাকি এবং তোমাদেরকেও। সন্তানদেরকে হত্যা করা একটি মস্তবড় গুনাহ।"

২. ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধীরা এ মতবাদটির বিরোধিতা করেছে এ জন্যে যে, তারা মানুষকে হযরত আদম আ.-এর বংশধর বলে বিশ্বাস করেনা। এ বিশ্বাস যদি সত্যও হয় তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, হযরত আদম আ.-এর শরীরের গঠন ও আকৃতি যে অবিকল বর্তমান মানুষের মতোই ছিলো, একথা জানার কোনো প্রামাণ্য সূত্র আপনার কাছে আছে কি? থাকলে সেটি কি? এমনওতো হতে পারে যে হযরত আদম আ.কে আল্লাহ যে আকৃতিতে তৈরি করেছিলেন, তা ডারউইনের বিবর্তনবাদের অনুরূপই ছিলো। অর্থাৎ তৎকালীন মানুষ UNI-CELLULAR অর্থাৎ এক কোষসম্পন্ন থেকে থাকতে পারে। হয়তো শুধু এতোটুকু পার্থক্য ছিলো যে, তিনি আপনা থেকে নয় বরং আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে করতে বর্তমান মনুষের আকৃতিতে উপনীত হয়েছিলেন।

জবাব ঃ আপনি আপনার বন্ধুর যে প্রশ্ন দু'টো পেশ করেছেন, তার জবাব নিম্নে দেয়া যাচ্ছে ঃ

১. আপনার বন্ধু সূরা বনী ইসরাইলের ৩১ নং আয়াতটি মনোযোগ দিয়ে পড়েননি। বরং আগে থেকে মনে যে ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আয়াতে শুধু সন্তান হত্যা করতেই নিষেধ করা হয়েছে। অথচ এ আয়াতে সন্তান হত্যাকে মারাত্মক গুনাহ্ আখ্যায়িত করার সাথে সাথে তার কারণ অর্থাৎ খাদ্যাভাবের ভয়কেও ভ্রান্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেই সাথে 'আমি তাদেরকেও খাদ্য দেবো এবং তোমাদেরকেও খাদ্য দেবো' একথা বলে এই মর্মে ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, সন্তান হত্যার মূলে যে খাদ্যাভাবের ভীতি সক্রিয় থাকে, তা মূলত 'জীবিকাদাতা' হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাহীনতারই নামান্তর। জীবিকাদাতারূপে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা থাকলে খাদ্যাভাবের ভীতিও তোমাদের থাকবেনা তোমরা সন্তান হত্যাও করবেনা। আমি টীকাতে এ কথারই ব্যাখ্যা করেছি। অথচ আপনার বন্ধু সে দিকে লক্ষ্য করেননি। ঐ টীকাতে আমি গর্ভনিরোধকে সন্তান হত্যা বলিনি। আমি বলেছি তা হলো, যে দারিদ্রভীতি আগেও সন্তান হত্যা ও গর্ভপাতে প্ররোচিত করতো, সেটাই এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণে

প্ররোচিত করে চলেছে। এজন্য অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের অভাব দেখা দেয়ার আশংকায় জন্মনিরোধ করা এ আয়াতের দৃষ্টিতে ভুল।

২. আপনার বন্ধু যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি বলবো, তিনি কুরআনের চেয়ে ডারউইনের প্রতি বেশী অনুরক্ত। তাইতো তিনি আদম সৃষ্টি সংক্রান্ত কুরআনের যাবতীয় বর্ণনা উপেক্ষা করে ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী হযরত আদমের এককোষবিশিষ্ট অণু (UNI-CELLULAR MOLECULE) হওয়াকে 'সম্ভব' বলে অভিহিত করেছেন (নেহায়েত দয়াপরবশ হয়ে ওটাকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলা থেকে বিরত থেকেছেন)। অতপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন কোন্ প্রামাণ্য সূত্রবলে আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আদম আ.-এর দেহাকৃতি বর্তমান মানুষের মতোই ছিলো? আমার উত্তর হলো ভদ্রমহোদয়ের মতে কুরআন যদি কোনো প্রামাণ্য সূত্র না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর সাথে আলোচনা নিরর্থক। কেননা নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির আলোকে হযরত আদমের দেহাকৃতি বর্তমান মানুষের অনুরূপ হওয়া যেমন 'সম্ভব', এক কোষধারী অণু হওয়াও ঠিক তেমনি 'সম্ভব'। সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে যখন দু'টোই সমান এবং একটাকে আর একটার ওপর অগ্রাধিকার দেয়ার সপক্ষে কোনো 'প্রামাণ্য সূত্র'ও নেই। তখন অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট করার কি দরকার? তবে তিনি যদি কুরআনকে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল প্রমাণের উৎস হিসেবে স্বীকার করেন, তাহলে একটু কষ্ট করে সূরা বাকারার ৩০-৩৯ আয়াত, সূরা আ'রাফের ১১-২৫ আয়াত, সূরা হিজরের ২৬-৪২ আয়াত, সূরা বনী ইসরাইলের ৬১-৬৫ আয়াত, সূরা তোয়াহার ১১৫-১২৩ আয়াত গভীর মনোনিবেশ সহকারে যেনো পড়েন এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদকেও সেই সাথে নজরে রাখেন। কুরআনের এই আয়াতগুলোতে হযরত আদম আ. সম্পর্কে যেসব বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা একটা এককোষ বিশিষ্ট অণুর সাথে লাগসই হতে পারে বলে কি তার বিবেক ভাবতে পারে?

এই সাথে আপনার বন্ধুকে আমি আরো একটা কথা বলা জরুরী মনে করি। তিনি যদি কুরআনকে জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎস ও নির্ভুল মাধ্যম মনে না করেন, তাহলে তার পক্ষে নিজেকে জনগণের সামনে মুসলমান হিসেবে পেশ করা নিজের বিবেক, নৈতিকতা ও সমাজের প্রতি এক নজিরবিহীন অবিচার ছাড়া আর কিছু নয়। সাচ্চা দিলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা সত্ত্বেও সেকথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ ও স্বীকার না

করে, নিজেকে মুসলমানদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে রেখে ক্রমাগত ধোঁকা দিতে থাকা আদৌ সততার পরিচায়ক নয়। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৭৭, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৫ম খন্ড)।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও চক্ষুদান

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ইসলাম কি সমাধান পেশ করে? জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য রকমারি ওষুধ ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতিকে কি আজও শরিয়ত বিরোধী আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে? একজন মুসলমান কি জীবদ্দশায় নিজের চক্ষু দান করতে পারে, যাতে মৃত্যুর পর তা কোনো চক্ষুরোগীর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে? এই ত্যাগ গুনাহর কাজ গণ্য হবে না তো? আর কিয়ামতের দিন এই ব্যক্তি অন্ধ হয়ে উঠবে না তো?

জবাব ঃ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ইসলাম শুধু একটা সমাধানই পেশ করে। সেটি হলো, আল্লাহ জীবিকার যেসব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তা সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করাও পরিমিতভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। যেসব উপকরণ এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, তা উদঘাটন করতে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জনসংখ্যা রোধের যে কোনো চেষ্টা - চাই তা সন্তান হত্যা হোক অথবা গর্ভপাত অথবা গর্ভরোধ এ সবই ভ্রান্ত এবং চরম ধ্বংসাত্মক। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের চারটি কুফল এমন যে, তা কোনো উপায়েই রোধ করা সম্ভব নয় ঃ

১. ব্যভিচারের ব্যাপকতা।

২. মানুষের ভেতর স্বার্থপরতা ও নিজের জীবনমান উন্নয়নের আকাংখা এতো তীব্র হয় যে, নিজের বৃদ্ধ মা বাপ, এতিম ভাই বোন এবং অন্যান্য অভাবী আত্মীয় স্বজনের অস্তিত্বই তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি নিজের খাবারে নিজের সন্তানদেরকে পর্যন্ত ভাগ বসাতে দিতে প্রস্তুত হয়না সে অন্যদেরকে কিভাবে শরীক করতে পারবে?

৩. একটি জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কমপক্ষে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন, তাও বৃদ্ধি পায়না। কেননা কতো শিশু জন্ম দিতে হবে, আর কতো দিতে হবেনা, তা নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা যখন ব্যক্তির হাতেই থাকবে এবং নতুন সন্তানের জন্ম দিয়ে জীবনযাপনের মান নামতে দেয়া যাবেনা এই মনোভাবের ভিত্তিতেই যখন সন্তানের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হবে, তখন শেষ পর্যন্ত তারা একটি জাতির জাতীয়

জনশক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যে পরিমাণ সন্তান জন্মানো দরকার তাও জন্মাতে প্রস্তুত হবেনা। এরূপ পরিস্থিতিতে কখনো কখনো জন্মহার মৃত্যুর হারের চেয়েও কমে যায়। ফ্রান্স এ ধরনের পরিণতি ভোগ করেছে। ফলে তাকে "বেশী সন্তান জন্ম দাও" আন্দোলন চালাতে হয়েছে এবং এজন্য পুরস্কার ঘোষণা করে জনগণকে উৎসাহিত করতে হয়েছে।

৪. এর ফলে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। এই পরিণতিও বিশেষত এমন একটি জাতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, যার আশপাশে নিজের চেয়ে কয়েকগুণ বড় একটি শত্রু জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক কেমন, তা সকলেরই জানা। আমেরিকার বন্ধুত্বের কারণে কম্যুনিস্ট দেশেগুলোর সাথেও তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে ভারত, চীন, রাশিয়া ও আফগানিস্তানের জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে ১৩ গুণ বেশী। এমতাবস্থায় যুদ্ধ করার যোগ্য লোকের সংখ্যা কমানো কতোটা বুদ্ধিমত্তার কাজ, তা যেকোনো কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের নিজেরই ভেবে দেখা উচিত।

চক্ষু দান করার ব্যাপারটা শুধু চক্ষু পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনা। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও রোগীদের কাজে লাগা বিচিত্র নয়। এগুলো দিয়ে অন্যান্য হিতকর কাজও হতে পারে। এই দরজা খুলে দিলে মুসলমানদের কবরে দাফন হওয়াই কঠিন হয়ে পড়বে। তাদের সমস্ত শরীরই চাঁদার খাতে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। ইসলামের মূলনীতি এইযে, মানুষ নিজের দেহের মালিক নয়। মৃত্যুর আগে নিজের দেহকে ভাগ-বাটোয়ারা করা বা চাঁদা দেয়ার ওসিয়ত করার তার কোনো অধিকার নেই। সে যতোক্ষণ বেঁচে থাকে, ততোক্ষণ দেহ তার ব্যবহারের আওতায় থাকে। মৃত্যুর পর এই দেহের আর তার কোনোই অধিকার থাকেনা যে, তার সম্পর্কে তার ওসিয়ত কার্যকর হবে। ইসলামী বিধান অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেহকে সসম্মানে কবরস্থ করাই জীবিত লোকদের কর্তব্য।

ইসলাম মানুষের লাশকে সম্মান করার যে নির্দেশ দিয়েছে তা আসলে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানেরই একটা অপরিহার্য অংশ। একবার যদি মানুষের লাশের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা শুধু মৃত মানুষের দেহের কতিপয় হিতকর অঙ্গকে জীবিত মানুষের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হওয়া পর্যন্তই সীমিত থাকবেনা। বরং ক্রমান্বয়ে মানুষের দেহের চর্বি দিয়ে সাবানও তৈরী হতে আরম্ভ করবে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়

জার্মানরা যেমন সত্যি সত্যিই তৈরি করেছিল)। মানুষের চামড়া তুলে জুতো, স্যুটকেস ও মানিব্যাগ বানানোর জন্য প্রক্রিয়াজাত করারও চেষ্টা চালানো হবে (মাদ্রাজের একটি ট্যানারী কয়েক বছর আগে এ পরিক্ষাও চালিয়েছে)। মানুষের হাড়, নাড়িভুড়ি ও অন্যান্য জিনিসও ব্যবহার করার কথা চিন্তা করা হবে। এমনকি এরপরে এক সময় মানুষ সেই আদিম বর্বরতার যুগে ফিরে যাবে যখন মানুষ মানুষের গোশত খেতো। একবার যদি মৃত মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করাকে বৈধ করা হয়, তাহলে আপনি কোন্ পর্যায়ে সীমানা চিহ্নিত করে তার দেহের অন্যান্য 'হিতকর' ব্যবহার রোধ করতে পারবেন এবং কোন্ যুক্তি দ্বারা এই বিধিনিষেধ আরোপ করাকে সঙ্গত বলে প্রমাণিত করবেন, তা আমার বুঝে আসেনা। (তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারি ১৯৬৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)।

৮

তালাক ও খুল'আ

বিয়ের পূর্বে তালাক

প্রশ্ন ঃ আমার এক অবিবাহিত বন্ধু সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে একবার বলে ফেলেছিল ঃ "আমি যে নারীকেই বিয়ে করিনা কেন, তাকে তিন তালাক দিলাম।" একথার জন্যে এখন সে খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। সে এখন বিয়ে করতে চায়। স্থানীয় উলামায়ে কিরাম বলেছেন, বিয়ে করার সাথে সাথেই স্ত্রীর উপর তার তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তাই এখন গোটা জীবন বিয়ের চেষ্টা করাটা তার জন্য একটা নিরর্থক প্রয়াসমাত্র। মেহেরবানী করে বলুন, এই বিপদ থেকে মুক্ত হবার কোনো পথ আছে কি নেই?

জবাব ঃ নিঃসন্দেহে হানাফী ফকীহগণের মত এটাই যে, এমতাবস্থায় যে নারীর সাথেই তার বিয়ে হবে, সাথে সাথে তার উপর তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু সকল ফিকাহর ইমামগণ এর সাথে একমত নন।

ইমাম শায়েফী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর মত হচ্ছে, কেবলমাত্র বিবাহের পরেই কোনো ব্যক্তি তালাকের অধিকার লাভ করে থাকে, বিবাহের পূর্বে নয়। কোনো ব্যক্তি যদি একথা বলে ঃ "ভবিষ্যতে আমি যে নারীকেই বিয়ে করি না কেন, তাকে তালাক দিলাম," তবে এটা হবে বাজে, নিরর্থক ও অকার্যকর কথা। এরূপ কথা আইনের আওতায় পড়েনা। হযরত আলী, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, হযরত জাবির ইবেন আবুদল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহুহু আনহুম থেকেও এ মতই বর্ণিত হয়েছে। "লা তালাকা ইল্লা মিন বাদে নিকাহিন - বিয়ের পর ছাড়া তালাক হয়না" - এই হাদিসটিও উক্ত মতের সমর্থন করে। ইমাম মালিক র.-এর মত হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট খান্দান ও কবিলার নারী সম্পর্কে যদি কেউ এ ধরনের কথা বলে, তবে তালাক কার্যকর হবে। কিন্তু সাধারণভাবে গোটা নারী সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি এ ধরনের কথা বলা হয়, তবে তালাক কার্যকর হবেনা। প্রথম অবস্থায় তো এ অবকাশ থাকে যে, সে ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট মহিলা কিংবা নির্দিষ্ট খান্দান ও কবিলার মহিলাদের বাইরের নারীদের বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থা তো সুন্নাত

বর্জনের শামিল এবং এটা হালাল জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ারই সমার্থক। (তরজমানুল কুরআন ঃ জানুয়ারি ১৯৫৬)

তাফহীমুল কুরআনেও মাওলানা মওদূদী এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। আমরা সে অংশটি এখানে সংযোজন করে দিলাম ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান বসৃরী, আলী ইবনে হুসাইন (জয়নুল আবেদীন), ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আলোচ্য আয়াতাংশ "যখন তোমরা বিয়ে করো এবং পরে তালাক দাও" থেকে এই দলিল পেশ করে বলেছেন যে, বিয়ের পর তালাক দিলেই তা কার্যকর হতে পারে। বিয়ের পূর্বে তালাক দেয়া অর্থহীন। সুতরাং কেউ যদি বলে ঃ "আমি অমুক নারীকে কিংবা অমুক বংশের অমুক ঘরের কোনো মহিলাকে অথবা যে কোনো মহিলাকে বিয়ে করলে সে তালাক হয়ে যাবে", তবে এরূপ কথা অর্থহীন। এতে কারো উপর তালাক কার্যকর হবেনা। একথার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করা হয় ঃ "মানুষ যার মালিক নয়, সে বিষয়ে তালাক দেয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করার কোনো অধিকার তার নেই" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)। নবী করীম সা. আরো বলেছেন ঃ "বিবাহের পূর্বে কোনো তালাক নেই" (ইবনে মাজাহ)।

কিন্তু ফিকাহবিদদের একটি বড় দলের মতে এ আয়াত ও হাদীস কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন কেউ তার স্ত্রী নয় এমন নারীকে বলে ঃ "তোমাকে তালাক দিলাম" কিংবা "তোমাকে তালাক"। এমতাবস্থায় এরূপ কথা অবশ্যি অর্থহীন হবে। এর আইনগত কোনো ফল নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে ঃ "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি, তবে তোমাকে তালাক" এ ধরনের কথা বিয়ের পূর্বে তালাক দেয়া নয়, বরঞ্চ সেই নারী যখন তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, তখন তার উপর তালাক কার্যকর হওয়ার কথাই এখানে ঘোষিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কাজেই এ ধরনের কথা অর্থহীন নয়। যেসব ফিকাহবিদ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে আবার একথা নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এ ধরনের তালাক দেয়ার ব্যাপকতা কতোখানি?

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম জুফার বলেন, কেউ যদি নির্দিষ্টভাবে কোনো নারীর কথা বলে কিংবা সাধারণভাবে বলে যে, "আমি যে নারীকেই বিবাহ করিনা কেন সে-ই তালাক" তবে এ উভয় অবস্থাতেই (বিবাহের পরপরই) তালাক হয়ে যাবে। আবু বকর জাচ্ছাস স্বীয় কিতাবে হযরত উমর রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., ইব্রাহীম নখয়ী, মুজাহিদ ও উমার ইবনে আবদুল আযীযের মত এটাই বলে উল্লেখ করেছেন।

সুফিয়ান সওরী ও উসমান আলবাত্তী বলেন, কেবল এরূপ বললেই তালাক কার্যকর হবে ঃ "আমি যদি অমুক নারীকে বিবাহ করি, তবে সে তালাক"।

হাসান ইবনে সালেহ, লাইস ইবনে সাদ এবং শা'বী বলেন, এই ধরনের তালাক সাধারণত ব্যাপকভাবেও কার্যকর হতে পারে। তবে শর্ত এইযে, তাতে কোনো না কোনো ধরনের বিশেষত্ব থাকবে হবে। যেমন কেউ যদি বলে ঃ "আমি যদি অমুক পরিবার, অমুক গোত্র, অমুক শহর, কিংবা জাতির কোনো নারীকে বিবাহ করি, তবে সে তালাক।"

ইবনে আবী লায়লা ও ইমাম মালিক উক্ত মতের সাথে বিরোধ করে অধিক শর্তারোপ করেছেন। তাঁদের মতে এরূপ কথায় মিয়াদ নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। যেমন, কেউ যদি বলে ঃ "আমি যদি এই বছর কিংবা আগামী দশ বছরের মধ্যে অমুক নারীকে কিংবা অমুক লোকদের মেয়ে বিয়ে করি, তবে তার উপর তালাক"। তবে এ তালাক কার্যকর হবে, অন্যথায় নয়। ইমাম মালিক আরো বলেন ঃ এই মিয়াদ যদি এতোদূর লম্বা হয় যে, ততোদিন তার বেঁচে থাকারও আশা করা যায় না, তবে তার এরূপ কথা অর্থহীন।"] তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আহযাব ঃ টীকা ঃ ৮৬-র শেষাংশ (অনুবাদক), রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড।

তিন তালাক

প্রশ্ন ঃ একসাথে তিন তালাক বললে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে কি? কেউ কেউ বলেন, একসাথে যতোবারই তালাক উচ্চারণ করা হোকনা কেন, তা মূলত এক তালাক বলেই গণ্য হবে।

জবাব ঃ এ হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমীয়ার মত। আহলে হাদিসও এ মতেরই অনুসারী। শীয়া মাযহাবের মতও এটাই। কিন্তু চার ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, তিন তালাক একত্রেই দেয়া হোক কিংবা তা তিন তহুরে দেয়া হোক, সর্বাবস্থায়ই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তিন তালাক একত্রে দেয়া হলে ইদ্দতকালে পুন গ্রহণের অবকাশ থাকবেনা। এ কথাটি বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত। বলা হয় হযরত উমর রা. একত্রে তিন তালাক দেয়াকে এক তালাক মনে করতেন। কথাটি ঠিক নয়। চার ইমাম যে মতামত প্রদান করেছেন তা হাদীসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোক্ত কথাটি হযরত উমরের রা. কথা বলে চালিয়ে দেয়াটা তার প্রতি একটা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত উমর রা. শরীয়তের কোনো পরিবর্তন সাধনের কোনো অধিকার রাখতেননা। তিনি এমনটি করলে সাহাবয়ে কিরাম রা. তা কখনো বরদাশত করতেননা। তাছাড়া এমনটি করলে তিনি খলীফায়ে রাশেদও হতে পারতেননা। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

দুই ও তিন তালাকের বিধান

প্রশ্ন ঃ দু'বছর পূর্বে এক ব্যক্তি রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে বললো, আমি তোমাকে প্রথম তালাক দিলাম। দু'বছর পর ঝগড়া ঝাটির সময় সে পুনরায় বললো, আমি তোমাকে দ্বিতীয় তালাক দিলাম। এরূপ তালাকের শরয়ী বিধান কি?

জবাব ঃ এটা পরিষ্কার কথা যে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। এখন জীবনে কখনো তার মুখ থেকে তার বিবির জন্যে তালাক শব্দটি বের হলেই পরিপূর্ণ তালাক হয়ে যাবে। কারণ এর ফলে তিন তালাক কার্যকর হয়ে গেলো। সুতরাং তৃতীয়বার তালাক শব্দ উচ্চারণ করার পূর্বে তাকে ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে, সত্যি সে চিরজীবনের জন্যে তার বিবিকে ত্যাগ করবে কি না? (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

ক্রোধান্বিত হয়ে স্ত্রী তালাক দেয়া

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! কেউ যদি অধিক ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে এর ফায়সালা কি?

জবাব ঃ অধিক খুশীর বশবর্তী হয়ে কেউ তালাক দেয় নাকি? এই ব্যক্তি যদি আগামীকাল ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে হত্যা করে আর বলে হত্যা হয়নি, কারণ হত্যার কাজ সে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে করেছিল। তবে কি আপনি তার এ বক্তব্য মেনে নেবেন? সুতরাং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

খুলা'র ইদ্দত

প্রশ্ন ঃ আপনার লিখিত "তাফহীমুল কুরআন"-এর প্রথম খন্ডে সূরা বাকারায় ১৭৬ পৃঃ লেখা হয়েছে যে, খুলা'র (স্ত্রী কর্তৃক স্বেচ্ছায় স্বামীর নিকট থেকে তালাক গ্রহণ) ক্ষেত্রে এক হায়েজ পরিমাণ সময় ইদ্দত পালন করতে হবে। আসলে এটা ইদ্দতই নয়, বরং এটা কেবল জরায়ুকে বীর্যমুক্ত করার জন্যই নির্দ্ধারিত হয়েছে ।

জিজ্ঞাস্য এইযে, আপনি এই মতের সপক্ষে কোনো দলিল দেননি। অথচ এটা আয়াতের বক্তব্য, বিশেষজ্ঞদের উক্তি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তির বিরোধী। যেমন ঃ

১. আব্দুর রাজ্জাক র. বর্ণনা করেছেন যে, খুলা এক তালাকের সমান।
২. দার কুতনী এবং ইবনে আ'দী বলেন যে, রসূল সা. খুলাকে এক তালাকের সমান গণ্য করেছেন।
৩. ইবনে ওমর রা.-এর বরাত দিয়ে মালেক বর্ণনা করেন যে, খুলা গ্রহণকারিণী তালাকপ্রাপ্তার মতোই ইদ্দত পালন করবে।

একমাত্র আবু দাউদের একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, খুলার ইদ্দত এক হায়েজের সমান। কিন্তু এটা বর্ণনাকারীদের উক্তি বলে মনে করা হয়েছে। এটা কুরআনের উক্তিরও পরিপন্থী। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ –

"তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন হায়েজ পরিমাণ ইদ্দত পালন করবে।"

অনুগ্রহপূর্বক প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর বরাত ও যুক্তিপ্রমাণ সহকারে সমস্যাটির সূক্ষ্ম বিচার এমনভাবে করবেন যাতে এ সংক্রান্ত সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। কুরআন ও হাদীসের উক্তিসমূহের ব্যাপকতর মর্ম বহাল থাকে, হাদীস বিশারদগণের মন্তব্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয় এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণটি সন্তোষজনক হয়।

জবাব ঃ 'খুলা' গ্রহণকারিণীর ইদ্দত সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ফেকাহবিদগণের একটি বিরাট গোষ্ঠীর মতে এই ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দতের মতোই। অপর একটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠীর মতে তা এক হায়েজ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। শেষোক্ত মতের সমর্থনে একাধিক হাদীস পাওয়া যায়। নাসায়ী ও তাবারানী রুবাই বিনতে মুয়াওয়াজের রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এই মর্মে যে, সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীর খুলার ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে যেনো এক হায়েজের সমান ইদ্দত পালন করে, অতঃপর বাপের বাড়ী চলে যায়।

আবু দাউদ ও তিরমিজী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন যে, উক্ত সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীকে রসূল সা. নির্দেশ দিলেন যে, এক হায়েজ পরিমাণ ইদ্দত পালন করো।

তাছাড়া তিরমিজী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা রুবাই বিনতে মুওয়াওয়াজের অপর একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যার বক্তব্য অনুরূপ। একই মর্মে ইবনে আবি শায়বা ইবনে ওমরের বরাত দিয়ে হযরত ওসমানের একটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছেন। সেই সাথে তিনি একথাও লিখেছেন যে, ইতিপূর্বে ইবনে ওমর খুলার ইদ্দত তিন হায়েজের সমান মনে করতেন। কিন্তু হযরত ওসমানের এই সিদ্ধান্তের পর তিনি নিজের মত পাল্টান এবং এক হায়েজের ফতোয়া দিতে থাকেন। অনুরূপভাবে ইবনে আবি শায়বা ইবনে আব্বাসের এই মর্মে ফতোয়া উদ্ধৃত করেছেন যে, খুলা গ্রহণকারিণীর ইদ্দত এক হায়েজ। ইবনে মাজা রুবাই বিনতে মুওয়াওয়াজের বরাত দিয়ে হযরত ওসমানের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে হযরত ওসমানের এ উক্তিও রয়েছে যে, "আমি এ ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালাই অনুসরণ করি।"

আশা করি এসকল উদ্ধৃতি দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন। (তরজমানুল কুরআন, মুহররম-সফর, ১৩৬৭ হিঃ/অক্টোবর ১৯৫৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)।

পিতামাতার আদেশে স্ত্রী তালাক দেয়া যায় কি?

প্রশ্ন ঃ পূর্ববর্তী একটি সংখ্যায় এক প্রশ্নের জবাবে আপনি বলেছিলেন, বাবা মা যদি পুত্রকে তার স্ত্রী তালাক দেবার আদেশ দেয়, তবে কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই তালাক দেয়া যাবে, যে ক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত কোনো কারণ বর্তমান থাকে। আপনি আরো বলেছেন, হযরত উমার রা. যে তার পুত্রকে স্ত্রী তালাক দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতেও শরীয়ত সম্মত কারণ ছিলো।

কিন্তু এ জবাবে আমার এ সংক্রান্ত সংশয় দূর হয়নি। এ প্রসঙ্গে অন্য কিছু হাদিস থেকে জানা যায়, পিতামাতা আদেশ করার সাথে সাথে নির্দ্বিধায় স্ত্রী তালাক দিতে হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত সেই বিশুদ্ধ হাদীসটি, যাতে তিনি পুত্র ইসমাঈল আ.কে তার দরজার চৌকাঠ পাল্টাবার আদেশ দেন (অর্থাৎ তার স্ত্রীকে তালাক দেবার আদেশ দেন)। পিতার আদেশ তাঁর নিকট পৌঁছার সাথে সাথে তিনি তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন এবং দ্বিতীয় বিয়ে করনে। এ হাদীস থেকে তো একথাই প্রমাণ হয় যে, পিতামাতার আদেশ শোনার সাথে সাথে বিনাবাক্য ব্যয়ে স্ত্রী তালাক দিতে হবে। অন্যথায় গুনাহ্গার হবে।

জবাব ঃ এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সংখ্যায় আমি যে জবাব দিয়েছিলাম, তা পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। শরীয়াহ তালাককে নিকৃষ্টতম বৈধ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। তাই, শরয়ী কারণ ছাড়া তালাক প্রদান করলে আল্লাহর নিকট অবশ্যি অপারাধী গুনাহগার হতে হবে। এ ধরনের তালাকের অশুভ প্রতিক্রিয়া কেবল স্বামী পর্যন্তই সীমিত থাকেনা। বরঞ্চ এ ধরনের তালাক পিতামাতার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রমাণ। এ ধরনের তালাক দ্বারা স্ত্রী এবং সন্তানের অধিকারও ক্ষুণ্ন হয়, তারা কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, স্রষ্টার বিধান অমান্য করে সৃষ্টির হুকুম পালন করা যাবেনা। বিনা কারণে তালাক দেয়াকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করা এবং অপরকে কষ্টে নিপতিত করাকে আল্লাহ মোটেও পছন্দ করেননা।

হযরত ওমর রা. তাঁর পুত্রকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে যে সম্ভাব্য কল্যাণ ও বিবেচনার কথা বলেছি, সেকথা অপরাপর মুহাদ্দিসগণও স্বীকার

করেছেন। যেমন- শাইখ আব্দুর রহমান আল বান্না তাঁর মুসনাদে আহমদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুর রব্বানীর তালাক অধ্যায়ে এই হাদীসটির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ

"একথা সুস্পষ্ট, হযরত ওমর রা. এ কারণেই মহিলাটিকে অপছন্দ করেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে সে তাঁর পুত্রের উপযুক্ত ছিলোনা। এ নির্দেশের ক্ষেত্রে হযরত ওমর রা. এর বিবেচনায় অবশ্যি কোনো কল্যাণ ছিলো। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামও লাভ করতেন। হযরত ওমরের নির্দেশ সঠিক না হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আবদুল্লাহ রা.কে এ তালাকের অনুমতি দিতেননা, এটাও বিবেচনার বিষয়।"

মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর বিখ্যাত 'মিরকাত' গ্রন্থের 'ঈমান' অধ্যায়ের 'কবিরা গুনাহ' পরিচ্ছেদে লিখেছেন ঃ

মিশকাতের যে হাদিসটিতে বলা হয়েছে, তোমরা পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করোনা এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করোনা এমনকি তারা যদি তোমাকে পরিজন ও সম্পদ ত্যাগ করতেও বলেন। এ হাদীসটি দ্বারা পিতা পুত্রকে স্ত্রী তালাক দেবার নির্দেশ দিলে তা মেনে নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েনা, এই পুত্রবধুর বর্তমানে পিতামাতার যতো কষ্টই হোকনা কেন। কারণ এই ধরনের তালাকে পুত্র কষ্টে নিপতিত হয়। এরূপ অবস্থায় তাদের আনুগত্য করা যেতে পারেনা। তারা যদি পুত্রকে ভালোই বাসেন তবে এই ভালোবাসার দাবি তো হলো শরয়ী কারণ ছাড়া তারা পুত্রকে স্ত্রী তালাক দিতে বলবেননা। তারা পুত্রের কষ্টের কথা অনুভব করবেন। এমতাবস্থায়, তালাক দিতে বলাটা তাদের অজ্ঞতা। অতএব এ ধরণের আদেশ গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত ইব্রাহীম আ. কর্তৃক পুত্র ইসমাঈল আ.কে তাঁর স্ত্রী তালাক দেবার যে নির্দেশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার পেছনে শরয়ী কারণ বর্তমান ছিলো বলে ধরে নিতে হবে। একজন নবী বিনা কারণে তাঁর পুত্রকে স্ত্রী তালাক দিতে বলবেন তা কিছুতেই কল্পনা করা যায়না। একই কথা হযরত উমরের ব্যাপারেও। তিনি তাঁর এক পুত্রকে স্ত্রী তালাক দিতে বলেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর রা. শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া এ ধরণের নির্দেশ দিয়ে থাকবেন বলে মেনে নেয়া যায়না।

এ কথাগুলো আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে বলছিনা। বরঞ্চ এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোতেই এর সমর্থন রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আ. সংক্রান্ত হাদীস বুখারীর 'আম্বিয়া' অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এ হাদীস থেকে জানা যায়, ইসমাঈল আ. এবং তাঁর মাকে আরবের মরুভূমিতে রেখে আসার পর হযরত ইব্রাহীম আ. মাঝে মধ্যে তাঁদের খোঁজ খবর নেবার জন্যে সেখানে যেতেন। ইসমাঈল আ.-এর বিয়ের পর

একবার তিনি সেখানে যান। তখন ঘরে কেবল ইসমাঈলের স্ত্রী ছিলেন। তিনি শ্বশুরকে চিনতেননা । হযরত ইব্রাহীম আ. তার কাছে তাদের খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমরা অত্যন্ত দুরবস্থায় আছি। দারিদ্র্য এবং বিপদাপদে নিমজ্জিত আছি।' বধূ অভিযোগের সুরে কথাগুলো বললেন।

কিন্তু একজন নবীর স্ত্রী এবং একজন নবীর পুত্রবধূর পক্ষে এতোটা অধৈর্য হয়ে পড়া কিছুতেই ঠিক হয়নি। এতোটা লাগামহীন কথাবার্তা বলা মোটেও উচিত হয়নি। একজন বৃদ্ধ অপরিচিত মেহমান তার ঘরে এলো আর তিনি তাঁর সাথে এ ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করলেন, নিজেদের অভাব অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরতে শুরু করলেন, এমনটি কিছুতেই তার জন্যে মানানসই হয়নি। এ কারণে হযরত ইব্রাহীম আ. সিদ্ধান্ত নিলেন, এ মেয়ে আমাদের সংসারের উপযোগী নয়। তিনি তাকে বলে এলেন, ইসমাঈল ফিরে এলে তাকে আমার সালাম বলবে এবং তার ঘরের কপাট পাল্টাতে বলবে। ইসমাঈল ফিরে এলে বউ তাকে বললেন, এই এই ধরনের একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন এবং তিনি এই এই কথা বলে গেছেন। বউ পুরো ঘটনা তাঁকে বললেন। ইসমাঈল পিতার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝে নিলেন এবং স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। হাদীস থেকে আরো জানা যায়, ইসমাঈল আবার বিয়ে করেন এবং ইব্রাহীম আ. পুনরায় তাঁদের দেখতে আসেন। এবারও ইসমাঈল বাড়ীতে ছিলেননা। ইব্রাহীম আ. এ বউকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু এবং সৎস্বভাবের অধিকারীণী দেখতে পান। অপরিচিত বৃদ্ধকে তিনি চিনেননি। কিন্তু তিনি তাঁর সাথে অত্যন্ত মার্যাদাব্য ক ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, আমরা ভালো আছি। সুন্দরভাবে আমাদের দিনাতিপাত হচ্ছে। তিনি সাথে সাথে আল্লাহর প্রশংসাও করেন। অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। পানি, দুধ, গোশত সবই পাওয়া যায়। আপনি তশরীফ রাখুন, আমি আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করছি।"

হযরহ ইব্রাহীম আ. এই বউয়ের জন্যে কল্যাণের দোয়া করলেন। বললেন, 'তোমার স্বামী এলে বলবে, ঘরের কপাট যেনো ঠিক রাখে।' এই বউটির চারিত্রিক সৌন্দর্য একথা থেকেও ফুটে উঠে, ইসমাঈল ঘরে ফিরে এলে তিনি তাকে বলেন, আপনি যাওয়ার পর অত্যন্ত ভালো ও সম্মানিত একজন বুযুর্গ তশরীফ এনেছিলেন। এরপর বিস্তারিত ঘটনা তিনি স্বামীকে বলেন।

এ বিস্তারিত কাহিনী থেকে জানা যায়, হযরত ইব্রাহীম আ. এমনি এমনি ঘরের কপাট (অর্থাৎ - স্ত্রী) পরিরর্তন করতে হুকুম দেননি। বরঞ্চ তিনি

আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই কাজে লাগিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর পুত্রকে একটি উত্তম স্ত্রী দান করলেন, যিনি সর্বদিক থেকে একজন নবীর স্ত্রী হবার উপযুক্ত।

এই বিস্তারিত আলোচনার পরও আমার মতে এই বিষয়ের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী হলো, বাবা কিংবা মা যদি পুত্রের কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেবার দাবি করে, তবে এক্ষেত্রে ছেলের জন্যে করণীয় হলো ঃ তাদের দাবি বা আদেশের সপক্ষে যদি শরীয়তসম্মত যুক্তি থাকে, তবে ছেলে স্ত্রী তালাক দিয়ে দেবে, অন্যথায় ছেলের জন্যে তাদের দাবির কারণে স্ত্রী তালাক দেয়া জরুরি নয়। (তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৪, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড)।

●

৯

নারীর পর্দা

পর্দা প্রসংগ (একটি বক্তৃতার অংশ)

পর্দার ব্যাপারে উঁচু ঘরের নারীদের যে আশংকার কথা আপনি প্রকাশ করেছেন, তার জবাবে প্রথমে সে মহিলাদের আমি সান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দিতে চাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ জামায়াত ক্ষমতায় গেলে কোনো পুলিশ জোর-জবরদস্তি করে আপনাদের বোরকা পরিয়ে দেবেনা। অতপর আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, বিগত কয়েক দশকে আপনারা কি কারণে বোরকা ছেড়েছেন? পুলিশ বহিনী রাস্তায় রাস্তায় অভিযান চালিয়ে আপনাদের বোরকা খুলে নিয়েছে কি? যদি তা না হয়, বরং পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির প্রভাবে এবং পরিবেশের চাপে আপনারা বোরকা ছেড়ে থাকেন, তবে ইনশাআল্লাহ যখন ইসলামী শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির স্থলে ইসলামী সভ্যতা সস্কৃতি চালু হবে এবং পরিবেশ পাল্টে যাবে, তখন এসব পোশাক পরিধান করতে অবশ্যি আপনারা লজ্জা বোধ করবেন, এখন যা পরে বেড়াচ্ছেন।

প্রথমে যখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনো মহিলাদের মেরে ধরে বাধ্য করে পর্দা করানো হয়নি। বরং আল্লাহ এবং রসূলের সা. শিক্ষা যখন মহিলাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বেলে দিয়েছিল, তখন তাদের এতোটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট হয়েছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. বেপর্দা পছন্দ করেন না। এতে করে তারা নিজেরাই সানন্দে পর্দা গ্রহণ করে নিয়েছিল। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ২য় খন্ড)।

পর্দা ও সহশিক্ষা

প্রশ্ন ঃ মাওলানা, আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। পর্দা করার পক্ষপাতি। কিন্তু মেডিকেল কলেজে রয়েছে সহশিক্ষা। এমতাবস্থায় আমি কি করবো?

উত্তর ঃ নারীদেরকে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হোক, এটা আমরা চাই। কিন্তু তাদের জন্যে অবশ্যি পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যতোদিন এটা হচ্ছে না এবং নারীদেরকে সহশিক্ষার অধীনেই মেডিকেল

কলেজে পড়তে বাধ্য হতে হয়, ততোদিন তাদেরকে ইসলামের সীমাসমূহের প্রতি অধিক অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত। পর্দার সাথে কলেজে যাওয়া-আসা উচিত। মুখ এবং হাতের কেবল ততোটুকুই খোলা উচিত, যেটুকু খোলা ছাড়া কোনো অবস্থাতেই শিক্ষা গ্রহণ করা যায়না। শিক্ষক এবং ছাত্রদের সাথে মেলা-মেশা করা উচিত নয়। এরচেয়ে বেশি কোনো পরামর্শ দিতে পারছি না।

পর্দা সম্পর্কে কতিপয় বাস্তব প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ আপনার পর্দা (পর্দা ও ইসলাম) গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর বিগত কয়েক সপ্তাহ্ থেকে আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের পারিবারিক জীবনকে ইসলামী আইন ও বিধানের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা শুরু করেছি। আমাদের এই নতুন দৃষ্টিভংগির কারণে আমাদের গোটা খান্দান বিশেষ করে আমাদের আব্বা আম্মা আমাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট। শরীয়তের পূর্ণ নিয়ম নীতি অনুযায়ী পর্দা ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে তারা খুবই বিতৃষ্ণ। কখনো প্রশ্ন জাগে আমরাই কোনো ব্যাপারে ভ্রান্তিতে আছি কিনা? তাই সান্ত্বনার জন্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চাই ঃ

১. "নারীদের জন্যে তাদের পিতা এবং পুত্রদের সামনে পর্দা না করলে কোনো দোষ নেই......" সূরা আহ্যাবের এ আয়াত দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এখানে যেসব নিকটাত্মীয়ের কথা উল্লেখ হয়েছে, তাদের ছাড়া নারীদের যে কোনোভাবে অন্য যে কোনো পুরুষের সামনে আসা (চরম বাধ্য হওয়া ছাড়া) প্রত্যক্ষভাবে গুনাহের কাজ। এ ব্যাপারে গায়রে মাহ্রাম আত্মীয় এবং গায়রে মাহ্রাম ভিন পুরুষ সম্পূর্ণ সমান। আমার ধারণা কি সঠিক?

২. কোনো নারীর জন্যে গায়রে মাহ্রাম নিকটাত্মীয়ের সম্মুখে আসা কি বৈধ? (যেমন চাচা, ভাই বা খালা জীবিত থাকা অবস্থায় খালু)। এটা যদি জায়েয হয় তবে তা কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ পন্থায় জায়েয?

৩. কোনো গায়রে মাহ্রাম আত্মীয়ের সাথে যদি বাধ্য হয়ে একই বাড়িতে বসবাস করতে হয় কিংবা কোনো গায়রে মাহ্রাম আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব যদি মেহমান হয়ে আসে এমতাবস্থায় পর্দা করার নিয়ম নীতি কি? এমনি করে কোনো নিকটাত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবের বাসায় গেলে যদি নারীরা সামনে আসে তবে কি করতে হবে?

৪. যদি যুবক কর্মচারী কাজে কর্মে বাসায় যাতায়াত করে তবে এতমতাবস্থায় মহিলাদের জন্যে যে অবকাশ রয়েছে তা আমার জানা আছে। কিন্তু যুবতী মহিলারা কি কেবল আমাদের নিয়্যত পাক আছে, একথা বলে তাদের সম্মুখীন হতে পারে?

৫. আল্লাহ ও রসূলের সা. বিধান মুতাবেক পর্দা অবলম্বনের ব্যাপারে যদি কারো মা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, তবে কি তাঁর নির্দেশ অমান্য করা যাবে? অথচ জান্নাত তাঁরই পদতলে?

৬. নারী পুরুষের সম্মিলিত সভা সমিতিতে নারীদের জন্যে কি নিকাব পরে বক্তৃতা করা বৈধ? হাদীসের দৃষ্টিতে তো গায়রে মাহরাম পুরুষদের কানে নারীদের কণ্ঠস্বর পৌঁছা পছন্দনীয় বলে মনে হয়না।

৭. নারীরা কি ডাক্তার, নার্স বা শিক্ষিকা হতে পারে? যেমন আমাদের দেশের নেতারা দেশবাসীর নিকট আপীল করতে গিয়ে বলে থাকেন, আমাদের নারী সমাজকে সকল কাজে অংশ নিয়ে অতীতের যাবতীয় অবহেলা ও ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীরা কি এসব পেশা অবলম্বন করতে পারে? এসব পেশা অবলম্বন করলে তাদেরকে পর্দার মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে, নাকি প্রয়োজনে পর্দার বাইরে আসতে পারবে?

৮. নারীরা কি মুখমন্ডল উম্মুক্ত করে বা নিকাব পরে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে?

জবাব ঃ

১. আপনি কুরআন মজীদের মূল বাক্য ভালোভাবে চিন্তা করে দেখেননি। আপনি যে আয়াতের বরাত দিয়েছেন, তা সূরায়ে আহযাবে নয়, বরং সূরা নূরে আয়াতটি রয়েছে। আয়াতটি এরকম ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ.......-

অর্থাৎ - এ লোকদের ছাড়া আর কারো সামনে তারা নিজেদের সাজ সজ্জা প্রদর্শন করবেনা।' অন্য কথায় সেজেগুজে তারা গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে আসবেনা। অপরদিকে ঘর থেকে বের হবার ক্ষেত্রে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَ بِيْبِهِنَّ-

অর্থাৎ - "তারা নিজেদের উপর ঘোমটার মতো করে নিজেদের চাদর ঝুলিয়ে দেবে।"

এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলে জানা যায় যে, পুরুষদের তিনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর পুরুষের জন্যে পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে। এক প্রকার পুরুষ হলো সেইসব মাহরাম আত্মীয় স্বজন যাদের কথা সূরা নুরে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার পুরুষ হলো সম্পূর্ণ ভিন পুরুষ, যাদের সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সূরা আহযাবে। তৃতীয় হলো, এ দুয়ের মধ্যবর্তী ঐসব লোক, যারা না মাহরাম আর না ভিন পুরুষ। প্রথম প্রকার পুরুষদের সামনে নারীরা

সাজ সৌন্দর্য প্রকাশের সাথে আসতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার পুরুষদের মুখমন্ডল পর্যন্ত দেখানো যেতে পারেনা। আর তৃতীয় প্রকার লোকদের থেকে পর্দা করার ধরন হবে উপরোক্ত দু'ধরনের লোকদের মাঝামাঝি। অর্থাৎ তাদের থেকে পর্দা করার ধরণ সম্পূর্ণ ভিন পুরুষদের মতোও হবেনা আর তাদের সামনে সাজ সৌন্দয্যও প্রকাশ করা যাবেনা।

২. সম্মুখে আসার দু'টি অর্থ হয়। একটি অর্থ তো এই যে, এমন স্বাধীন ও সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করে তাদের সামনে যাওয়া, (যেভাবে কেবল বাপ ভাই প্রমুখ মাহরাম আত্মীয়দের সামনেই যাওয়া যায়) বল্গাহীনভাবে বসে তাদের সাথে কথা-বার্তা বলা, হাসি-ঠাট্টা করা এমনকি নির্জনে এবং একাকী তাদের সাথে মেলা মেশা ও চলাফেরা করা। কোনো ধরণের গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথেই এমনটি করা জায়জ নয়, চাই সে আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়। এর আরেকটি অর্থ হলো, নারীদের তাদের সাজ সৌন্দর্য চাদর ইত্যাদি দ্বারা লুকিয়ে, মাথা ঢেকে কেবলমাত্র মুখমন্ডল ও হাত খোলা রেখে কারো সম্মুখে আসা। তাও নিজেকে প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নয়, বরঞ্চ সেসব অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরে যা যৌথ পারিবারিক জীবনে দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বাধীন ও মুক্তভাবে মেলা মেশা করা যাবেনা। তার কাছে একাকীও থাকা যাবেনা। তার সামনাসামনি কেবল এভাবেই হবে, যেমন তার সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করবে কিংবা একান্ত জরুরী কোনো কথা থাকলে তা বলে দেবে বা জিজ্ঞাসা করে নেবে। এ সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে গায়রে মাহরাম আত্মীয় স্বজনের সামনে যাওয়ার শরয়ী অনুমতি আছে বা অন্তত নিষেধাজ্ঞা নেই। আজকের মুসলিম সমাজে চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই প্রভৃতির সাথে যেভাবে হাস্য রসিকতা ও চরম বল্গাহীন মেলামেশার প্রচলন দেখা দিয়েছে এবং মুসলিম মেয়েরা এ ধরনের আত্মীয় স্বজনের সামনে যেভাবে সাজ সজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, ইসলামী শরীয়তে এরূপ সীমালংঘনকে জায়েয করার কোনো কারণ নেই।

৩. এসব অবস্থায় যদি উভয় পক্ষ থেকে শরীয়তের বিধি বিধান মেনে চলার ইচ্ছা থাকে, তবে তাদের জন্যে সঠিক কর্মপন্থা হলো, যখন কোনো গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয় বা আপনজন ঘরে প্রবেশ করতে যাবেন, তখন তিনি শরয়ী বিধান মুতাবেক অনুমতি প্রার্থনা করবেন।[১]

---

১. বড়ই পরিতাপের বিষয়, অনুমতি প্রার্থনা করার এই কুরআন সুন্নাহর নির্দেশকে মুসলমানরা বর্তমানে তাদের সমাজ থেকে নির্বাসন দিয়েছে। বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করাকে স্বাধীনতার নিদর্শন মনে করা হয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বয়ং ঘরের লোকদেরকে এমনকি পিতা, পুত্র এবং ভাইদের উপরও এ কর্তব্য রয়েছে, তারা যখন ঘরে প্রবেশ করবেন, তখন অন্তত গলা খাকারি বা কোনো আওয়ায দেবেন, যাতে করে ঘরের মহিলারা বুঝতে পারে কোনো পুরুষ আসছে।

অতপর আওয়ায শুনামাত্র মহিলাদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা কোনো কিছু দিয়ে নিজেদের সাজ সৌন্দর্য ঢেকে নেবে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর একান্ত অপরিহার্যতার কারণে গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয়দের সামনে মুখমন্ডল ও হাত খোলা থাকার মধ্যে কোনো দোষ নেই। এমনি করে একান্ত জরুরতে তাদের সাথে সাদামাটা ও নিরসভাবে কথা বলার মধ্যেও কোনো দোষ নেই। অবশ্য খোলা ও স্বাধীনভাবে মেলামেশা ও হাস্য রসিকতা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

৪. চাকর ও কর্মচারীদের ব্যাপারে আমার গবেষণা হলো, গৃহকর্তার দৃষ্টিতে যেসব ভৃত্য ও চাকর - غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ এর সংজ্ঞায় পড়বে (অর্থাৎ মনিবের ঘরের মহিলাদের সম্পর্কে যাদের অন্তরে কোনো প্রকার কুচিন্তা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা নেই) তাদেরকে ঘরে যাতায়াত ও কাজ করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যেসব কর্মচারি ও চাকরের ব্যাপারে গৃহকর্তার ধারণা এরূপ হবেনা, তাদের জন্যে ঘরে আসা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে কর্তার ইজতিহাদ নির্ভরযোগ্য। অবশ্য শর্ত হলো, শরীয়তের বিধান অনুসরণের ইচ্ছা তার থাকতে হবে এবং বেপরোয়াভাবে তিনি শরীয়তের বিধান লংঘন করবেন না।

৫. অবশ্যি মায়ের পদতলে জান্নাত। কিন্তু নির্দেশ কেবল সেই মায়েরই মানা যাবে, যিনি জান্নাতীদের মতো কাজ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের বিধান যিনি মেনে চলেন এবং নিজের নফস এবং বংশীয় প্রথার জন্যে শরীয়তকে কোরবানী দেননা। আর যে মা এর বিপরীত বৈশিষ্টের অধিকারী হন, তাঁর খিদমত অবশ্যি করতে হবে, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী কাজে তাঁর আনুগত্য করা যেতে পারেনা। খোদায়ী শরীয়তের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বীয় নফস ও প্রথার শরীয়তকে তার উপর প্রাধান্য দিয়ে তো তিনি নিজের পা-ই জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন। অতঃপর তার পদতলে জান্নাত কিভাবে হতে পারে?

৬. পূর্ণাংগ শরয়ী পর্দার সাথে কোনো কোনো অবস্থায় পুরুষদের উদ্দেশ্যে নারীদের বক্তৃতা করা জায়েয। কিন্তু সাধারণভাবে এটা জায়েয নয়। কোন্ লোকদের মধ্যে কি অবস্থায় এটা জায়েয, তা ফায়সালা করা কেবল ঐসব লোকদেরই কাজ যারা একদিকে পরিবেশ পরিস্থিতিকে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝার ও মূল্যায়ন করার যোগ্যতাও রাখেন, অপরদিকে যাদের মধ্যে শরীয়ত মুতাবিক জীবন যাপন করার নিয়্যতও বর্তমান।

৭. আপনি নেতাদের কথা উল্লেখ করে যে প্রশ্ন করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, এইসব নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুসারী মুসলমানরা আজকাল যে জিনিসের অনুসরণ অনুবর্তন করছে, যদি সেটার নামই

ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি হয়ে থাকে, তবে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে তো আর কোনো পার্থক্যই থাকেনা। এমতাবস্থায় মুসমানদেরকেও সেইসব কিছুই করতে হবে যা কিছু আজকাল পাশ্চাত্যবাসী করছে। আর ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি যদি সেই সভ্যতা সংস্কৃতির নাম হয়ে থাকে যা শিখিয়েছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তবে আজকালকার মেডিক্যাল কলেজ, সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হাসপাতালসমূহে মুসলমান মেয়েদের পাঠানোর চাইতে তাদের কবরে নিয়ে দাফন করে দেয়া লাখোগুণ বেহতের। বর্তমানের মহিলা কলেজগুলোতে গিয়ে শিক্ষালাভ করে শিক্ষিকা হবার ব্যাপারটাও তার চাইতে কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। অবশ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যদি আমাদের হাতে আসে এবং আমরা আমাদের পন্থায় মেয়েদের শিক্ষাদান করে তাদের দ্বারা সমাজের প্রয়োজনীয় খিদমত নেয়ার সুযোগ পাই তবে অবশ্যি আমরা তার ব্যবস্থা করবো। আমরা ইসলামের বিধান মোতাবেক মেয়েদেরকে ডাক্তারী, সার্জারী, ধাত্রীবিদ্যা, নার্সিং এবং সন্তান লালন পালনের শিক্ষা প্রদান করবো। অন্যান্য বিষয়ে তাদের উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আমরা তাদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তৈরী করবো এবং ইসলামের বিধান মোতাবেক তাদের দ্বারা সমাজের অন্যান্য খিদমতও নেবো। এ প্রসংগে একথাও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া দরকার, আমরা মুসলমানরা পাশ্চাত্যের এই দৃষ্টিভংগিরও সমর্থক নই যে, নার্সিং পেশা কেবল নারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকবে এবং পুরুষ ও মহিলাদের উভয় ধরনের হাসপাতালে কেবল মেয়েদেরই নার্স হতে হবে। আমাদের নিকট এ মতের কোনো বিবেক ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। মহিলা সেবিকাদের জন্যে পুরুষ রোগীর সেসব সেবা করা নৈতিক দৃষ্টিতে চরম লজ্জাকর যা করতে পুরুষ নার্সরাও লজ্জা অনুভব করে। এই নীতির ভিত্তিতে আমরা মুসলমানরা যদি মেয়েদের চিকিৎসা কাজের জন্য তৈরি করি, তবে তাদের দ্বারা কেবল নারীদের চিকিৎসা ও সেবার কাজই নেয়া হবে। সাধারণভাবে নারী পুরুষ সকলের চিকিৎসা ও সেবা তাদের দ্বারা করানো হবেনা। আমাদের মতে পুরুষদের হাসপাতালসমূহের জন্যে কেবল পুরুষরাই নার্স হওয়া উচিত।

৮. যুদ্ধকালে নার্সিং, আহতদের সেবা, মুজাহিদদের খানা তৈরী করা, অস্ত্র এবং রসদ সরবরাহ, সংবাদ আদান প্রদান ইত্যাদি খিদমত আঞ্জাম দেয়া নারীদের জন্যে জায়েয। পর্দার বিধান নাযিল হবার পূর্বে নারীরা এসব খিদমত আঞ্জাম দিতেন, পরেও দিয়ে এসেছেন এবং

বর্তমানেও দিতে পারেন। তবে শর্ত হলো, সেনাবাহিনীকে ইসলামী সেনাবাহিনী হতে হবে, খোদার বিধানের অনুসারী হতে হবে এবং সেইসব দুষ্কর্ম থেকে পবিত্র থাকতে হবে যেসব ব্যাপারে আজকের সেনাবাহিনী কুখ্যাতি অর্জন করেছে। W.A.C.I ধরনের নিষ্পাপ নামের ছত্রছায়ায় মেয়েদের ভর্তি করে নিয়ে দুশ্চরিত্রের সিপাহী ও অফিসারদের অশ্লীল কাজের খিদমতে নিয়োগ করা এক চরম শয়তানী কর্ম, যার সামান্যতম অবকাশও ইসলামে নেই।[1] (তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান ১৩৬৫, আগষ্ট ১৯৪৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড)।

পর্দা সম্পর্কে জনৈক মহিলার কিছু প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ আমি আপনার পুস্তক 'দীনিয়াত' (বাংলায় 'ইসলাম পরিচিতি' ও ইংরেজিতে "Twards Understanding Islam" নামে প্রকাশিত) এর ইংরেজি অনুবাদ পড়ছিলাম। ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আপনার সকল বক্তব্যের সাথে আমি একমত ছিলাম। এই পৃষ্ঠায় আপনার এ উক্তিটা দেখলাম যে, 'মহিলাদের যদি অনিবার্য প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হয়, তাহলে সাদাসিধে ধরনের কাপড় পরে এবং শরীরকে ভালোমতো ঢেকে বেরুবে। মুখমন্ডল ও হাত বের করার যদি অত্যধিক প্রয়োজন না হয় তবে তাও ঢেকে রাখবে।' এর পরবর্তী পৃষ্ঠাতেই দেখলাম লেখা রয়েছে, 'কোনো নারী (স্বামী ছাড়া) আর কারোর সামনে নিজের হাত ও মুখ ছাড়া শরীরের আর কোনো অংশ বের করবেননা, চাই সে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হোক না কেন।' প্রথমত আপনার উক্ত দু'টো উক্তিতে আমি বৈপরিত্য দেখতে পাই। দ্বিতীয়ত আপনার প্রথম উক্তি আমার মতে সূরা নূরের ২৪নং আয়াতের পরিপন্থী। অধিকন্তু যে হাদীসে রসূল সা. হযরত আসমা রা.কে বলেছিলেন যে, "কোনো মেয়ে যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তখন হাত আর মুখ ছাড়া তার শরীরের কোনো অংশ দেখা যাওয়া চাইনা", সেই হাদীসের সাথেও এ কথার মিল নেই।

পুস্তকের শেষাংশে আপনি লিখেছেন, 'শরীয়তের বিধান কোনো বিশেষ জাতি এবং বিশেষ যুগের প্রচলিত রীতি প্রথার ভিত্তিতে তৈরী হয়নি, আর তা কোনো বিশেষ জাতি বা বিশেষ যুগের লোকদের জন্যেও নয়।' অথচ

---

১. বর্তমান যুগের সেনাবাহিনীর চরম অধঃপতিত নৈতিক অবস্থা এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, বিগত বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকান সেনাবাহিনী জাপানে এক লক্ষ, ইংল্যান্ডে ৭০ হাজার এবং জার্মানীতে ৫০ হাজার জারজ সন্তান জন্ম দিয়েছে। সোভিয়েত বাহিনী কেবলমাত্র পূর্ব বার্লিনেই ২৯ হাজার জারজ সন্তান জন্ম দিয়েছে। এ হচ্ছে শুধুমাত্র সেইসব সন্তানদের হিসাব, ১৯৫২ সালের শেষ নাগাদ যাদের গণনা করা হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে, এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের যুগে কতো ব্যাপক বদকর্ম করার পর এ পরিণতি দাঁড়িয়েছে।

কুরআন পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পর্দা নিছক একটা প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার এবং ইসলামের শিক্ষার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি যে ইসলামী আইনের ভুল ব্যাখা দিয়ে বহু লোককে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এটা কি আপনি স্বীকার করবেন? আমরা ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করা দেখতে চাইনা, যাতে এ যুগের তরুণ সমাজ ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। ইসলাম যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তাছাড়া বাড়তি কিছু মনগড়া বিধিনিষেধ আরোপ করার অধিকার কি কারো আছে? (আমেরিকা থেকে পাঠানো জনৈক মুসলিম মহিলার ইংরেজীতে লেখা চিঠির অনুবাদ)

জবাব ঃ আমি আপনার স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করি। তবে আমার মনে হয়, আপনি আমার বক্তব্যকে যথাযথভাবে বুঝতে পরেননি। ১৮২ ও ১৮৩ পৃষ্ঠায় আমি যা বলেছি, তাতে কোনো বৈপরিত্য নেই। নারীর জন্যে শরীয়তের বিধান তিন অংশে বিভক্ত।

১. মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া শরীরের কোনো অংশ স্বামী ছাড়া আর কারোর সামনে খোলা চলবেনা। কেননা ওগুলো 'ছতর'। ছতর শুধু স্বামীর সামনেই খোলা যায়।

২. সূরা নূরের ৩১নং আয়াতে যেসব আত্মীয়ের উল্লেখ রয়েছে, তাদের সকলের সামনে মুখ ও হাত খোলা যায় এবং তাদের সকলের সামনে সাজসজ্জাসহ আসা যায়।

৩. আত্মীয় ছাড়া সাধারণ বেগানা পুরুষদের সামনে নারীকে নিজের সাজসজ্জাও ঢেকে রাখতে হবে, যেমন উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে। আর মুখমন্ডলও ঢেকে রাখতে হবে যেমন ৩৩নং সূরার ৫৩ থেকে ৫৫নং আয়াতসমূহে এবং ৫৯নং আয়াতে বলা হয়েছে।

ইংরেজি অনুবাদকরা সাধারণত এ আয়াতগুলোর অনুবাদে ঘাপলা বাঁধিয়ে বসেন। আপনি যদি আরবী জানেন তাহলে আপনার নিজের এ আয়াতগুলো মূল আরবীতেই পড়ে দেখা উচিত। এ আয়াতগুলো পড়লে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বামী, আত্মীয় স্বজন ও বেগানা পুরুষদের ব্যাপারে কুরআন নারীদের জন্য আলাদা আলাদা বিধান দেয়। বেগানা পুরুষদের থেকে তাদেরকে পুরোপুরি পর্দা পালন করার নির্দেশ দেয়।

আপনার এ ধারণা ঠিক নয় যে, পর্দা নিছক সামাজিক প্রথাভিত্তিক। কুরআন নাযিল হওয়ার আগে আরবরা হিজাব তথা পর্দার সাথে মোটেই পরিচিত ছিলোনা। কুরআনই সর্বপ্রথম তাদের জন্য এ বিধান প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই পর্দা চালু ছিলো। পৃথিবীর আর কোনো জাতি এটা কখনো মেনে চলতোনা, আজো চলেনা। তাহলে

আপনার মতে মুসলমানদের মধ্যে পর্দার আকারে যে 'প্রথাটা' চালু হয়ে গেলো, তা কাদের প্রথা?

আপনার এ ধারণা ঠিক যে, মনগড়াভাবে কোনো অন্যায় বিধি নিষেধ আরোপ করার অধিকার কারোর নেই। কিন্তু যেসব বিধি নিষেধ কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত, কোনো মুসলমানের আধুনিকতার বলে তা লংঘন করার চিন্তাও করা যায়না। আমি জানিনা আপনি উর্দু জানেন কিনা। যদি উর্দু পড়তে পারেন তাহলে আমার প্রণীত 'পর্দা' এবং সূরা নূর ও সূরা আহ্যাবের তাফসীর অধ্যয়ন করুন। তাহলে পর্দার বিধান কুরআনের কোন্ কোন্ আয়াত এবং রসূল সা.-এর কোন্ কোন্ হাদীসের আলোকে প্রণীত, তা আপনি জানতে পারবেন। সেই সাথে এটাও আপনি জানতে পারবেন যে, এসব বিধিনিষেধ পরবর্তীকালের লোকেরা সংযোজন করেছে, না আল্লাহ ও তার রসূল স্বয়ং তা প্রবর্তন করেছেন। (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৫ম খন্ড)।

বোরকা কি পর্দার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে

প্রশ্ন ঃ আমি দীর্ঘদিন থেকে আপনার দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে মানসিক ও আন্তরিক পর্যায়ে জড়িত আছি। পর্দা সম্পর্কে আপনার জ্ঞানগর্ব রচনাবলী পাঠ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু পরিশেষে দেখছি আপনি প্রচলিত বোরকারও সমর্থন করেছেন। এ ব্যাপারে মনে কিছুটা খট্‌কা জাগে। মেহেরবানী করে এর উপর আলোকপাত করে কৃতজ্ঞ করবেন।

পর্দার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ক্ষেত্রে উচ্ছৃংখলতার গতিরোধ করা। বলা বাহুল্য, এ আকর্ষণ নর-নারী উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায় (যদিও উভয়ের ক্ষেত্রে এর প্রকৃতিগত পার্থক্য অনস্বীকার্য)। এ জন্যেই পর্দার আসল প্রাণশক্তি দৃষ্টি আনত করার নির্দেশ নর-নারী উভয়কে দান করা হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য যে, বোরকার আড়াল থেকে অধিকাংশ মহিলা 'দৃষ্টির যিনায়' লিপ্ত হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, তারা এই মনে করে নিশ্চিন্ত থাকে যে, তারা পুরুষদেরকে দেখছে কিন্তু পুরুষরা তাদেরকে দেখছেনা এবং তারা যে পুরুষদেরকে দেখছে এটা পুরুষরা টেরও পাচ্ছেনা। কাজেই এই ধরনের মেয়েদের মধ্যে লজ্জাশীলতা - যা নারী সমাজের আসল সম্পদ - অত্যন্ত কমে যায়।

উপরন্তু বোরকা পরিধান করে মধ্যবিত্ত পরিবারের কোনো মেয়ে নিজের কাজকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করতেও পারেনা। সফরের সময় গাড়ি-বাস প্রভৃতিতে উঠা-নামা করা বোরকা পরিহিতা মহিলার জন্যে বিপদমুক্ত নয়।

পূর্ণাঙ্গ পর্দার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রচলিত বোরকার

চাইতে অধিক উপযোগী কোনো পর্দার পদ্ধতির প্রচলন কি উত্তম হবেনা? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আজ থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গ্রাম্য মেয়েরা নিজেদেরকে একটি চাদরের মধ্যে ঢেকে রাখতো। চাদরের মধ্য থেকে কোনো পুরুষকে অনবরত দেখার সাহস তারা করতে পারতোনা এবং তাদের নিকট থেকে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের লজ্জাশীলতার পরিচয় পাওয়া যেতো। আমি মনে করি প্রচলিত বোরকার চাইতে ওই চাদরেই চমৎকার 'পর্দা' হতো। আপনার অত্যধিক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আপনাকে কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হলাম।

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নের মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে মিশ্রিত করে ফেলেছেন। এক একটি বিষয়কে পৃথক করে নিয়ে তার উপর পৃথকভাবে চিন্তা করে মত প্রতিষ্ঠিত করাই ভালো মনে করি। প্রথম যে বিষয়টির উপর চিন্তা করা দরকার তাহলো, দৃষ্টি আনত করার নির্দেশ ও নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কি কোনো মহিলাকে কোনো পরপুরষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে? আপনি বোরকার নেকাবের উপর আপত্তি করেছেন, কারণ তা কোনো পুরুষকে নারীর উপর দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত রাখে বটে, কিন্তু নারীকে অবৈধ দৃষ্টি থেকে বিরত রাখেনা। কিন্তু এ দোষ কেবল নেকাবে নেই, চাদরেও আছে। মেয়েরা চাদরে মুখ ঢেকে বাইরে যাবার সময় পথ দেখার জন্যে চোখ দিয়ে সামনের দিকে দেখতে পারে কমপক্ষে এতোটুকু অংশ খুলে রাখা উচিত, শরীয়ত এর অনুমতি দেয়। উপরন্তু এ দোষ অনেকের স্বভাবজাত। যেমন আপনারা পথ চলার সময় মানুষের দরজা-জানালার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। বরং যে জায়গা থেকেই কোনো মেয়ে বাইরে উঁকি দিতে পারে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেও এ দোষ রয়েছে। আপনি নিজেই বলুন, এ পথগুলোকে আপনি কিভাবে বন্ধ করতে পারেন? শরীয়তও কি সত্যি এসমস্ত পথ বন্ধ করার দাবি করে? উপরন্তু ওই 'পর্দা ও ইসলাম' গ্রন্থেই আমি এমনসব হাদীস উদ্ধৃত করেছি যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হযরত আয়োশাকে রা. হাবশীদের খেলা দেখিয়েছিলেন। সেখানে আমি একথাও প্রমাণ করেছি যে, পুরষদের জন্যে মেয়েদের দেখা এবং মেয়েদের জন্যে পুরুষদের দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে সমান নয় এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এ দুয়ের অবস্থা সমান নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, বোরকা নিজেই যদি আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাময় না হয় এবং সাদাসিধে ধরনের ও সৌন্দর্যহীন হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিরুদ্ধে কোনো আপত্তির অবকাশ আছে কি? এ বোরকা কি শরীয়তের কোনো দাবিই পূর্ণ করেনা? যদি পূর্ণ করে থাকে, তাহলে আমাদের নিকট অবৈধতার সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে কি? তবে আপনার

মতে যদি অন্যকিছু অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে শরীয়তের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, তবে তা একটি স্বতন্ত্র কথা। এ জন্যে যদি তেমন কোনো বস্তু থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যি তা পেশ করতে পারেন। কিন্তু বোরকাকে অবৈধ বলা কোনোক্রমেই ঠিক নয়।

বোরকা পরিধান করে চলাফেরা করা ও বাস-গাড়ি প্রভৃতি যানবাহনে উঠা-নামা করার ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধার কথা আপনি বর্ণনা করেছেন, বৈধতা ও অবৈধতা আলোচনার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার মতে চাদরে এর চাইতে অসুবিধা অনেক কম বা মোটেই নেই, তাহলে আপনি মেয়েদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করুন। তারা পরিক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে যদি একে অধিকতর সংগত বলে বুঝতে পারে, তাহলে একে গ্রহণ করবেনা কেন? (তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

গায়েরে মহরাম নিকটাত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের থেকে পর্দা করার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ স্বামী কি স্ত্রীকে কোনো গায়ের মাহরাম আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে পর্দাহীন অবস্থায় আসতে বাধ্য করতে পারেন? শ্বশুরালয় এবং পিত্রালয়ের এমনসব গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয়ের থেকে পর্দা করা উচিত কিনা, আমাদের আজকালকার সামাজিক ব্যবস্থায় যাদের থেকে মহিলারা সাধারণত পর্দা করেনা। এদের থেকে যদি পর্দা করতে হয়, তবে তার সীমা কি?

জবাব ঃ আল্লাহ ও রসূলের সা. বিধানের বিপরীত কোনো নির্দেশ দেয়ার অধিকার স্বামীর নেই। স্বামী যদি এরূপ নির্দেশ দেয়, তবে একজন মুসলমান নারীর কর্তব্য হলো, তার সে হুকুম অস্বীকার করা। সূরা নূরের চতুর্থ রুকূতে যেসব আত্মীয়ের সামনে একজন মুসলমান নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে তাদের তালিকা দেয়া হয়েছে। এদের ছাড়া অন্য কারো সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের নির্দেশ দেয়া কোনো মুসলমানের ক্ষমতার বাইরে।

শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ে নারীদেরকে সাধারণত যেসব গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয়দের সাথে সামাজিক জীবন যাপন করতে হয় তাদের থেকে পর্দা করার ধরন ঠিক সেরকম নয় যেরকম পর্দা করতে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পুরুষদের থেকে। সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, সাদামাটা পোষাকে পূর্ণ সতরের সাথে নারীরা তাদের গায়রে মাহরাম আত্মীয়দের সামনে আসতে পারে। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে যতোক্ষণ না থাকলেই নয় তার চাইতে অধিক সময় তাদের সামনে থাকা যাবেনা।

আজকাল আমাদের সমাজে বেপরোয়া মেলামেশা, একত্রে বসে হাস্যরসিকতা এবং একান্তে বসে আলাপ আলোচনার যে কুপ্রথা চালু

হয়েছে তা শরয়ী বিধানের সম্পূর্ণ খেলাপ। কোনো কোনো আত্মীয় যেমন দেবরদের সাথে এ ধরনের মেলামেশার ব্যাপারে হাদীসের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে সাংঘাতিক বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান আমি বলে দিয়েছি। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে প্রথাগতভাবে যে শরীয়ত বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার জন্যে বিরাট সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। একদিকে অনেক মুসলমান ভিন্ন পুরুষদের সাথে পর্দা করার ব্যাপারে শরীয়তের দাবির চাইতেও এগিয়ে যায়। অপরদিকে এরাই আত্মীয়দের সাথে মেলা মেশার ব্যাপারে শরীয়তের যাবতীয় সীমা লংঘন করে। এ ব্যাপারে কেউ যদি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যথাযথ আমল করার উদ্যোগ নেন, তবে হয়তো বহু বংশীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া তিনি তা পারবেননা। (তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাবান ১৩৬৪, জুলই-আগষ্ট ১৯৪৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খন্ড)

পর্দা ও নিজ পছন্দমত বিবাহ

প্রশ্ন ঃ ইসলামী পর্দার কারণে একদিকে যেমন আমরা অগণিত উপকার লাভ করেছি, তেমনি এতে দু'টি এমন ক্ষতিও আছে, যার জন্যে সবর ও শুকর আদায় করে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া কোনো সমাধান নজরে পড়েনা।

প্রথম এইযে, একজন শিক্ষিত লোকের নিজস্ব এমন বিশেষ কিছু রুচি আছে, যার কারণে নিজের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করার সময় সে পাত্রীর বিশেষ চারিত্রিক অবস্থা ও রুচির আশা করে। স্বভাবগতভাবে সে একথার আকাঙ্খী যে, বিয়ে করার জন্যে নিজ মর্জিমতো সাথী বেচে নেবেন। কিন্তু ইসলামী পর্দার কারণে কোনো যুবক বা যুবতীর পক্ষে নিজ মর্জিমতো আপন সাথী বেছে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বরং সে এ ব্যাপারে মা, খালা ইত্যাকার অন্য লোকদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য। আমাদের জাতির শিক্ষার অবস্থা তো এইযে, সাধারণত মা বাপ অশিক্ষিত আর সন্তান শিক্ষিত। এখন অশিক্ষিত মা বাপের কাছে এ আশা করা একেবারেই অর্থহীন যে, তার জন্যে যথোপযোগী কোনো পাত্রী তালাশ করে দেবেন। এ পরিস্থিতি এমন ব্যক্তির পক্ষে বড়ই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, যে নিজের সমস্যা নিজে বুঝে এবং নিজেই সমাধান করার যোগ্যতা রাখে।

অন্যদিকে, একটি মেয়ে, যে ঘর থেকে বের না হওয়ারই শিক্ষা পেয়েছে, সে কেমন করে এতোটা প্রশস্ত দৃষ্টি, উদারতা এবং সাধারণ বুদ্ধির

অধিকারী হবে, যদ্বারা সে বাচ্চাদের উত্তমভাবে লালনপালন করতে পারে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় বুঝবার মতো তার সঠিক জ্ঞানই তো হতে পারেনা, বরং প্রকৃত ব্যাপার এইযে, একজন বেপর্দা মেয়ে যতোটা শিক্ষালাভ করেছে সে যদি ততোটা শিক্ষার অধিকারীও হয়, তবুও তার মনস্তাত্ত্বিক যোগ্যতা কমই হবে। কারণ লব্ধ জ্ঞান বাস্তবে পরখ করার সুযোগই তার হয়নি। আশা করি আপনি এ সমস্যাটির উপর আলোকপাত করে বাধিত করবেন।

জবাব ঃ প্রথমত, আপনি ইসলামে পর্দার যেসব ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো এমন ত্রুটি নয়, যার কারণে মানুষ এমন মুশকিল অবস্থায় পড়ে যাবে, যার কোনো সমাধানই নেই। দ্বিতীয়ত, পার্থিব জিন্দেগীতে এমন কোন বিষয় আছে, যার মধ্যে কোনো না কোনো দিক থেকে কোনো ত্রুটি বা কমতি নেই? কিন্তু কোনো জিনিসের উপকারী বা অপকারী হওয়ার ফয়সালা শুধুমাত্র একটি বা দু'টি দিকের ভিত্তিতেই করা যায়না, বরং দেখতে হবে যে, সমষ্টিগতভাবে এর উপকার বেশি, না অপকার বেশি। পর্দার ব্যাপারেও এই নীতিই অবলম্বন করতে হবে। আপনার বিবেচনায়ও ইসলামী পর্দা অসংখ্য দিক দিয়ে উপকারী। কিন্তু বিয়ে শাদীর প্রশ্নে নিজ পছন্দমত বাছাইয়ের স্বাধীনতা পাওয়া যায়না, শুধুমাত্র এতোটুকু জটিলতার কারণে পর্দার উপকারকে কম করে দেখা বা এর থেকে বন্ধনমুক্ত হওয়া সংগত নয়। বরং প্রত্যেক ছেলেকে মেয়ে দেখার এবং প্রত্যেক মেয়েকে ছেলে দেখার খোলাখুলি অধিকার দিলে তার এমন কুফল দেখা দিতে শুরু করবে, যা ধারণাও করা যায়না এবং এর দ্বারা ওই পারিবারিক ব্যবস্থা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, যা সমাজকে মজবুত ও পবিত্র রাখার রক্ষাকবচ। এই ধরনের একটি কাল্পনিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অসংখ্য বাস্তব সমস্যার দরজা খুলে যাবে।

আপনার ধারণা যে, একজন পর্দানশীন মেয়ে প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন বা উদার হতে পারেনা, এটা আদৌ ঠিক নয়। আর এটাকে সঠিক বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তাতে পর্দার কোনো দোষ নেই। একজন মেয়ে পর্দার মধ্যে থেকেও জ্ঞান, বিজ্ঞানে পারদর্শিনী হতে পারে। বিপরীতে একজন মেয়ে পর্দার বাইরে গিয়েও জ্ঞান, বুদ্ধি, উদারতা ও হৃদয়ের প্রশস্ততার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে। তবে হাঁ, একজন বেপর্দা মেয়ে জ্ঞান বুদ্ধির দিক দিয়ে না হলেও মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে অধিক প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্না হতে পারে, এ ব্যাপারে তাদের প্রাধান্য আছেই। এমতাবস্থায় জীবন সংগি নির্বাচন করার ব্যাপারে যদি তার সাফল্য এসেও যায়, তবু যে

নযর একবার প্রশস্ত হয়ে গেছে, তাকে গুটিয়ে এনে একটি কিন্দ্রবিন্দুতে সীমাবদ্ধ করা সহজ ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার জবাব পেলাম। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য হলাম এজন্য যে, আপনি আলোচ্য সমস্যাটিকে একেবারেই একটি মামুলী সমস্যা হিসেবে ধরে নিয়েছেন। সফল বিবাহের আকাঙ্খা একটি বৈধ চাহিদা। তার জন্য এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা, যার ফলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজ পছন্দ মতো কোনো পাত্রী বাছাই করার পথ বন্ধ হয়ে যায়, এটাকে আমি মানবিক আনন্দ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে ক্ষতিকর এবং স্বভাবধর্ম বিরোধী বলে মনে করি।

আমি যতোটা বুঝতে পেরেছি, তাতে আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী মেয়েরা বড়জোর একটি বাড়ীর ব্যবস্থাপক এবং স্বামীর ও নিজের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্তির একটি উপায় হতে পারে, কিন্তু নিজ পছন্দ ও রুচিমত বিয়ে করার মধ্যে দুই ব্যক্তির পরস্পরকে একে অপরের নিকট সোপর্দ করার এবং জীবনের দায়িত্বসমূহ পালন করার যে সম্ভাবনা বর্তমান থাকে, নিজের পছন্দ এবং বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্য কারো নির্বাচন অনুযায়ী বিয়ে করে নেয়ার অবস্থায় সেটা নস্যাৎ হয়ে যায়। আমি মনে করি, একজন যুবক শুধুমাত্র যৌন সম্ভোগের আকাঙ্খী নয়, সে কারো জন্যে কিছু ত্যাগও স্বীকার করতে চায়, কাউকে ভালোবাসতে চায়, কাউকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আর এটাও চায় যে কেউ তার সন্তুষ্টিতে খুশী হোক। এই আবেগের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ এভাবে হতে পারে যে, এমন কোনো মেয়েকে সে বিয়ে করবে, যাকে সে তার শিক্ষা, অভ্যাস, কৃতিত্ব এবং অন্য গুণাবলীর ভিত্তিতে নিজ মত মতো লাভ করতে পারে (প্রকৃত মুহাব্বাত তো কারো গুণাবলী প্রত্যক্ষ করেই গড়ে উঠে, চেহারা সূরত দেখে নয়)। আর কাউকে বিয়ে করিয়ে দেয়ার পর তার কাছে সেই মেয়েকেই এমনভাবে পছন্দ করার দাবি করা, যেনো সে নিজে তাকে পছন্দ করেছে, এটা মূলত অবাস্তব কথা। এভাবে স্বাভাবিক ভালোবাসার পথ বন্ধ করে দেয়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, সে আবেগের ফলে নিজের জন্যে অন্য কোনো পথ খুঁজে নেয়।

পর্দার কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়ে আছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে নিজের জোড়া তালাশ করা সম্ভব নয়। পাত্রের বাপের পক্ষে পাত্রীর খোঁজখবর নেয়া সম্ভব নয় এবং কোনো মেয়ের মায়ের পক্ষে পাত্র সম্বন্ধে সরাসরি কিছু আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। কারণ, পর্দার কারণেই এসব ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং খোলাখুলি আলাপ আলোচনা সম্ভব নয় (পাত্র ও পাত্রীর মেলামেশা তো দূরের কথা)। ইসলাম যদি বেশী কিছু

স্বাধীনতা দিয়ে থাকে তা শুধু এতোটুকু যে, পাত্র পাত্রীর চেহারা দেখে নেবে, কিন্তু আমার বুঝে আসে না যে, কয়েক সেকেন্ডের জন্য কারো চেহারা দেখে নেয়াতে কিইবা এমন দেখা হয়।

এ সমস্যার অপর একটি দিকও আছে। আজকের সকল ওলামায়ে কিরাম একথা মেনে নিয়েছেন যে, বর্তমান যুগের প্রয়োজন পূরণার্থে মেয়েদের জ্ঞান অর্জন জরুরী। কিন্তু আমার তো এমন মনে হয় যে, মেয়েরা শুধু একটি কাজই করতে পারে, হয় তারা ইসলামের হুকুম আহকাম পালন করবে নতুবা জ্ঞান অর্জন করবে। পর্দার পাবন্দ থেকে ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ঐসব জ্ঞান, যার কারণে জরিপ করা এবং দূর দূরান্তের সফরের প্রয়োজন হয়, এসমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য মেয়েরা কিভাবে কাজ করতে পারে, সেটা আমার বোধগম্য নয়, বিশেষ করে যখন মেয়েদের জন্য মাহরাম পুরুষ সংগী ব্যতীত তিন দিনের অধিক সফর নিষিদ্ধ। সে কি সবখানে কোনো মাহরাম পুরুষকে সাথে নিয়ে বেড়াবে?

এসব জ্ঞান বিজ্ঞান একদিকে, অপরদিকে আমি ডাক্তারী এবং পর্দাকে পরস্পর বিরোধী মনে করি। প্রথমত, ডাক্তারী বিদ্যাটাই এমন যে, সেখানে চর্ম চক্ষু দ্বারা শরীরকে তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করার পর অভিজ্ঞতা পূর্ণ হয়। এ বিদ্যা লজ্জা শরমের এ অনুভূতিকে খতম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, যা প্রাচ্যের মেয়েদের মধ্যে আশা করা হয়, তা সে ডাক্তারী পর্দার মধ্যে থেকেই শেখা হোক, আর শিক্ষার্থী সব মহিলাই হোক না কেন! দ্বিতীয়ত, ডাক্তার হয়ে যাওয়ার পর একজন মহিলা ডাক্তারের পক্ষে রোগীদের উপসর্গাদি সম্পর্কে এতো বেশী খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজন হয় যে, তার ভিন্ন পুরুষের সংগে কথাবার্তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রশ্নই আসেনা। এসব জিনিসকে সামনে রেখে আমরা যদি মেয়েদেরকে ডাক্তার হতে না দেই, তাহলে আমাদের ঘরের অসুস্থ মেয়েদের প্রত্যেক রোগব্যাদির চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারের খিদমতের প্রয়োজন হবে এবং বর্তমানের হায়া শরমের দৃষ্টিকোণ অনুসারে একে তো আরও বেশী দূষণীয় বলে মনে করা হবে। শ্রদ্ধেয় মাওলানা! আপনি আমাকে বলুন সামাজিক ও তামাদ্দুনিক এইসব সমস্যাদির মধ্যে ইসলামী হুকুম আহকাম পালন করতে যে বাস্তব জটিলতা রয়েছে, তার সমাধান কি?

জবাব : আপনার দ্বিতীয় চিঠি পেলাম। বিয়ে শাদীর ব্যাপারে আপনি যে সংকটের উল্লেখ করেছেন, তাকে বাস্তব সংকট বলে ধরে নিলেও তার সমাধান কোর্টশীপ ব্যতীত আর কিই বা হতে পারে? হাঁ, এটা ঠিকই, জীবন সঙ্গিনী বানানোর পূর্বে পাত্রী ও পাত্রের পরস্পরের গুণাবলী, মেযাজ,

অভ্যাসসমূহ, চরিত্র এবং রুচি ও মনমানসিকতা সম্পর্কে জানার যে প্রয়োজন আপনি অনুভব করেন, সেটা যথার্থ। তবে এসব বিস্তারিত তথ্য দুচারটি সাক্ষাৎকারে, তাও আবার আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে, সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এর জন্য মাসের পর মাস পরস্পরের ক্রমাগত মেলামেশা, নির্জনে কথাবার্তা বলা, আনন্দ বিহারে বের হওয়া, সফরে একে অপরের সংগে থাকা এবং নির্দ্বিধায় বন্ধুত্বের পর্যায় পর্যন্ত সম্পর্ক স্থাপন করা অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষেই কি আপনি চান যে, যুবক যুবতীদেরকে এই ধরনের মেলামেশার সুযোগ প্রদান করা হোক? আপনার বিবেচনায় এই নিস্ফল দর্শনের ফলে যুবক যুবতীদের শতকরা কতোজন শুধু জীবনবন্ধু খুজে বের করার নিষ্ঠাপূর্ণ বাসনায় পরস্পরের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং এ সময়ের মধ্যে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নারী পুরুষের যৌন সম্ভোগের স্বাভাবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখবে, যা বিশেষ করে উঠতি বয়সে তাদেরকে উম্মাদ করে তোলে? আপনি যদি শুধু তর্কের খাতিরেই তর্ক না করতে চান, তাহলে আপনাকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ যুবক যুবতীর সংখ্যা আমাদের সমাজে শতকরা দুই তিন জনের বেশি হবেনা। আর তারাও যৌন বিকৃতি থেকে যে মুক্ত থাকতে পারবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই নিরিবিলি সুযোগে জৈবিক তাড়নার স্বাভাবিক চাহিদা তারা পূরণ করেই নিবে। এরপরও কি আপনি মনে করেন যে, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের আকাঙ্খী হয়ে যেসব ছেলেমেয়ে পরস্পরের সাথে খোলাখুলি মেলামেশা করবে, তারা একে অপরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বাছাই করে নেবে এবং এর নিশ্চয়তা রয়েছে? হতে পারে, এ ধরনের বন্ধুত্বের ফলে হয়ত শতকরা বিশ জনের বিয়ে হয়ে যাবে। তাহলে, বাকি শতকরা আশিজন অথবা অন্ততঃপক্ষে শতকরা পঞ্চাশ জনকে পুনরায় এ ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এমতাবস্থায় ঐ অভিজ্ঞতা লাভকালে আলোচ্য যুবক যুবতীদের মধ্যে বিয়ের আকাঙ্খায় স্থাপিত সম্পর্কের অবস্থা কি দাঁড়াবে এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে সমাজে যে সন্দেহপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তার ফলই বা কি দাঁড়াবে?

অতঃপর এটাও আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, পাত্রপাত্রীর জন্য এসব সুযোগের দরজা একবার খুলে দিলে নির্বাচনের ক্ষেত্রও বহুগুণে প্রশস্ত হয়ে যাবে। প্রতিটি ছেলে শুধুমাত্র একজন মেয়েকেই সম্ভাব্য স্ত্রী হিসেবে নির্বাচনের জন্য মনোনীত করে পরিক্ষা নিরিক্ষা চালাবেনা, আর এমনি করে মেয়েরাও সম্ভাব্য স্বামী হিসেবে গ্রহণের জন্য কোনো একজন পাত্রকেই পরিক্ষা নিরিক্ষা করবেনা, বরং বিয়ের বাজারে প্রত্যেক দিক থেকেই

একজন থেকে আরেকজন বেশি আকর্ষণীয় মাল হিসেবে আমদানী হবে, যা পরিক্ষা নিরিক্ষার বিভিন্ন স্তর পার হওয়ার পর প্রত্যেক পাত্রপাত্রী পরস্পরের জন্য আরও উন্নততর নির্বাচনী কলাকৌশল পেশ করতে থাকবে। এই কারণেই, প্রথম যে দু'জন পারস্পরিক পরিক্ষার জন্য মিলিত হয়েছিল, তারা শেষ পর্যন্ত পরিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে এবং পরিশেষে বিবাহ সম্পাদন পর্যন্ত পৌঁছবে, এ সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

এছাড়া, আরো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হলো বিয়ের পূর্বে রোমান্টিক কায়দায় ছেলে মেয়েরা যে কোর্টশীপ করে, তাতে উভয়েই পরস্পরকে তাদের জীবনের উজ্জল দিকগুলোই দেখায়। মাসের পর মাস ধরে মেলামেশা এবং গভীর বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তাদের দুর্বল দিকগুলো পরস্পরের কাছে পুরোপুরি ফুটে উঠেনা। এ সময়ের মধ্যে তাদের যৌন আকর্ষণ এতো বেশি বেড়ে যায় যে, তারা যথাসম্ভব শীঘ্রই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, আর এ উদ্দেশ্যে তারা উভয়েই পরস্পর এমন অঙ্গিকারবদ্ধ হয় এবং এতো বেশি মুহাব্বাত ও একাত্মতা প্রকাশ করে যে, বিয়ের পর জীবনের বাস্তব সংঘাতে এসে তাদের প্রেমিক প্রেমিকাসুলভ এ অভিনয় বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনা এবং শীঘ্রই পরস্পরের ব্যবহারে হতাশ হয়ে ছাড়াছাড়ির (তালাক) পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এর কারণ হলো, তারা উভয়ে পরস্পরের সে আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনা, যার অঙ্গিকার তারা একে অপরের সাথে ইতিপূর্বে করেছিল। এমতাবস্থায় তাদের সামনে পরস্পরের সেই সমস্ত দুর্বলতা ফুটে উঠে, যা পারস্পারিক বাস্তব অভিজ্ঞতা কালেই আত্মপ্রকাশ করে, এশ্‌ক বা মুহাব্বাতের অভিনয়যুগে সাধারণত কখনও প্রকাশ হতে পারেনা।

এখন আপনি এসব দিকগুলোও চিন্তা করে দেখুন। তারপর মুসলমানদের বর্তমান রীতিনীতির কাল্পনিক ত্রুটি এবং কোর্টশীপ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোর মধ্যে তুলনা করে দেখে নিজেই ফায়সালা করুন। এ দুই ধরনের ত্রুটির মধ্যে কোন্‌টি বেশি গ্রহণযোগ্য? এরপরও আপনি কোর্টশীপ গ্রহণযোগ্য মনে করলে আমার সাথে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। আপনার নিজেকেই এই ফায়সালা করতে হবে যে, যে ইসলাম এহেন পথে যাওয়ার আদৌ অনুমতি দেয়না, সেই ইসলামের সাথে আপনি সম্পর্ক রাখতে চান কি না? আপনি করতে চাইলে অন্য কোনো সমাজ তালাশ করুন। ইসলামের সাধারণ এবং প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেও আপনি জানতে পারবেন যে, সফল বিয়ের জন্য যে ব্যবস্থাকে আপনি হালাল করতে চান, ইসলামের পরিমন্ডলে এর বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

মেয়েদের শিক্ষাদিক্ষা সম্পর্কে আপনি যে জটিলতার উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে কোনো রায় কায়েম করার পূর্বে আপনি একথা বুঝে নিন যে, ফিতরত তথা প্রকৃতি নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছে। নিজ কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনের জন্য মেয়েদের যেসব উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রয়োজন, তা তাদেরকে অবশ্যই পেতে হবে এবং ইসলামের সীমার ভিতর রেখে তাদেরকে সে শিক্ষা পুরোপুরিই প্রদান করা যায়। একইভাবে ইসলাম নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করার পরও জ্ঞান ও মানগত দিক থেকে নারীদের উন্নতি সম্ভব, যা তাদের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা মুসলমানদের ত্রুটি, ইসলামের নয়। কিন্তু যে শিক্ষা মেয়েদেরকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করে, তা শুধু মেয়েদের জন্যই নয়, বরং গোটা মানবজাতির জন্য ধ্বংসাত্মক। কাজেই ইসলাম সে সুযোগ দিতে প্রস্তুত নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি আমার রচিত 'পর্দা' কিতাবখানি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন। (তরজমানুল কুরআন, খন্ড ৫৫, সংখ্যা ৪, জানুয়ারী ১৯৬১ ইং, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৪র্থ খন্ড)।

গায়রে মাহরামদের কবরে যাওয়া

প্রশ্ন ঃ মেয়েরা কি গায়রে মাহরাম পুরুষদের কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে?

জবাব ঃ সাধারণ কবরস্থানে যেতে মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

১০

সামাজিক অপরাধ

সামাজিক অপরাধের শাস্তি

প্রশ্ন ঃ খোদাদ্রোহী নাফরমান জাতিসমূহকে যেহেতু দুনিয়াতেই তাদের সামাজিক ও সামষ্টিক অপরাধের শাস্তি দিয়ে দেয়া আল্লাহর নীতি, সে কারণে প্রশ্ন জাগে পরকালে আবার তাদের হিসাব কিতাব নেয়া হবে কেন?

জবাব ঃ আসলে পৃথিবীতে ঐসব জাতি তাদের সামষ্টিক ও সামাজিক শাস্তি ভোগ করেনা। বরঞ্চ তারা যখন নিজেদের ফিতনা ফাসাদ দ্বারা কোনো জনপদকে বিপর্যস্ত করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের জীবনের অবকাশের যবনিকা টেনে দেন এবং পৃথিবী থেকে তাদের নির্মূল করে দেন। তাদের কৃতকর্মের এটা আসল ফায়সালা নয়, বরঞ্চ এটা এক ধরনের গ্রেফতারি। আসল ফায়সালা তো হবে পরকালে। এই গ্রেফতারি সেই মহাসত্যের নির্দশন যে, নিঃসন্দেহে কোনো মহাশক্তিমান এই বিশ্বজগতের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার পাকড়াও থেকে বাঁচা কারো পক্ষে এবং কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাবঃ ১ম খন্ড)।

কুরআনে বর্ণিত ব্যভিচারের দন্ড

প্রশ্ন ঃ আপনি আমার 'কুরআনে বর্ণিত চুরির দন্ড' প্রবন্ধটির উপর যে বক্তব্য রেখেছেন সে জন্য কৃতজ্ঞ। এখন এ ধরনের আরেকটি প্রবন্ধ কুরআনে বর্ণিত ব্যভিচারের দন্ড শিরোনামে পাঠালাম। আশা করি, এর উপর আপনার রায় প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্ চাইলে আপনার উভয় সমালোচনার জবাব একত্রে দেবো।

এখানে মোটামুটিভাবে এতোটুকু আরয করা জরুরি যে, কুরআনে সর্বাধিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে এবং ন্যূনতম শাস্তি বিচারকের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, আপনি আমার এ ব্যাখ্যার কোনো সমালোচনা করেননি। দুনিয়ায় কোন্ অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে আখিরাতের শাস্তি থেকে

অব্যাহতি দেয়, সে সম্পর্কেও আপনি কিছুই বলেননি।[১]

"আমি আমার আগের প্রবন্ধে (কুরআনে বর্ণিত চুরির সাজা) বলেছি, سَارِقَةُ দ্বারা চুরি করতে সাহায্যকারী স্ত্রী-পুরুষ সব ধরনের লোক বুঝায়। চোর যদি নারী হয় তবে سَارِقٌ শব্দের মধ্যে স্ত্রী চোর শামিল আছে। اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ এই আয়াতেও একই অবস্থা বিরাজমান। اَلزَّانِيَةُ (ব্যভিচারিণী) শব্দের মধ্যে যিনাকার্যে সাহায্যকারী সমস্ত লোক শামিল। সাহায্যকারীরা হতে পারে দালাল (স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই) অথবা যিনার প্রস্তাবক অথবা ব্যভিচারের ব্যবস্থাপক কিংবা উপস্থাপক ইত্যাদি।

চুরির শাস্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে سارقة কে سارق এর পর নেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে زاني -র আগে নেয়া হয়েছে زانية শব্দ কোনো সংগত করণে। আমার জানা মতে এর কারণ হলো - চুরি করার অপরাধে সবচেয়ে বড় অপরাধী হলো চোর। তৎপরবর্তী অপরাধী হলো চোরের সাহায্যকারীরা। কিন্তু ব্যভিচারের ব্যাপারে সহায়তা দানকারী (আর্থাৎ زانية ব্যভিচারী নারী পুরুষের চেয়ে বেশি অপরাধী। কেননা, তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যভিচার কার্যটি সংঘটিত হতে পারেনা। এ করণেই زانية শব্দটি অগ্রভাগে ব্যবহার করা হয়েছে।"

"কুরআনে ব্যভিচারের দু'টি শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এক. ব্যভিচারীদেরকে একশত বেত্রাঘাত করা। দুই. তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা, মু'মিনদের জামায়াত থেকে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া এবং তওবা করা ছাড়া মু'মিনকে বিবাহ করার অনুমতি না দেয়া"। কুরআনে অন্যান্য আহকামের আলোকে কোনো মু'মিন মুশরিক নারীকে বিবাহ করতে পারেনা।

অথচ এখানে সে হুকুমের খেলাফ বলে প্রতীয়মান হয়। এর জবাব হলো, এখানে মুশরিক ও মুশরিকাহ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক সংগম-সুখ উপভোগ করার ব্যাপারে নিজের স্বামীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে শরীক করে, সে মুশরিকাহ। আর যে পুরুষ নিজের স্ত্রীর সাথে ভিন্ন কোনো সংগম সুখ দান কারিণীকে শরীক করে সে মুশরিক।"

"কাজেই যানিয়াহ (যিনাকারিণী) ও মুশরিকাহর অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মুশরিকাহ হচ্ছে, স্বামীর বর্তমানে ব্যভিচারিণী। আর যানিয়াহ হলো, যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক ব্যভিচার কার্যে অন্যকে সাহায্য করে নিজকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। এমনিভাবে যানী (ব্যভিচারী) ও মুশরিক শব্দের

---

১. ব্যাখ্যা তলবকারীর উল্লিখিত প্রবন্ধের কতিপয় জরুরি উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদান করা হলো, যাতে সে আলোকে জবাব পর্যালোচনা করা যায়।

অর্থেও পার্থক্য আছে। যানী শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার স্ত্রী থাকুক বা নাই থাকুক। অন্যদিকে যার স্ত্রী আছে এমন ব্যভিচারী পুরুষকে মুশরিক বলে।" "যে আলেম সাহেবগণ আমার একথা মেনে নেবেননা, তারা ব্যভিচারের জন্যে কেবলমাত্র একটি শাস্তিরই প্রস্তাব করবেন। অর্থাৎ শত বেত্রাঘাত। বয়কট সম্পর্কিত দ্বিতীয় দন্ডটি তাদের মতে কোনো দন্ড হিসেবে বিবেচিত হবেনা।" "শত বেত্রাঘাত তো চরম সাজা। আমি আমার প্রবন্ধে (কুরআনে চুরির সাজা) লিখেছিলাম, চুরির চরম সাজা হলো, হাত কাটা আর ন্যূনতম সাজা বিচারকের বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল।" "অপরাধীর অবস্থার বিভিন্নতার উপর অপরাধ শক্ত ও হালকা হওয়া নির্ভর করা সত্ত্বেও এই নিয়মের বিরোধিতা করে সব অপরাধীর জন্যে একই শাস্তি নির্ধারণ এবং একই লাঠিতে সব ধরনের অপরাধীকে ধাওয়া করার বিধান ইসলামের দন্ডবিধি কিতাব অর্থাৎ কুরআন মজিদে কিভাবে থাকতে পারে?" "এ কারণেই খলিফা চতুষ্টয় এবং স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনার চরম অবস্থায় শত বেত্রাঘাতের শাস্তিকে অপর্যাপ্ত মনে করে অপরাধীকে রজম অর্থাৎ মৃতদন্ড প্রদান করার হুকুম জারী করেন।"... "আমাদের যুগে রজম জায়েয কি না? তবে অন্তত এতোটুকু তো জানা আছে যে, কুরআনে রজমের কোনো কথা উল্লেখ নেই। এমতবস্থায় তিলাওয়াত রহিত কিন্তু হুকুম বহাল, এ ধরনের একটি আয়াত হিসেবে এর আলোচনা করা হয়না কেন?"... "অবশ্য কন্যা ও ভাতিজীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে জীবিত রাখা বিবেকসম্মত নয়। তাই বিশেষ অবস্থায় ব্যভিচারের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের বিধান জারি করা দোষের নয়। তবে সেটা হবে শুধুই মৃত্যুদন্ড, রজম নয়। কেননা রজম তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু প্রদান করাকে বরদাশ্‌ত করতে পারেনা। ... যিনা এবং চুরি করার অপরাধের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, একথা এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবেনা। পার্থক্যটা হলো - চোরকে দন্ড দেয়ার আগেই তওবা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আর ব্যভিচারীকে শাস্তির পর।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ....

এখানে 'যালিকা' শব্দ দ্বারা সাজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যভিচারী কোনো অবস্থাতেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবেনা। কিন্তু চোর তওবা করে দন্ড থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে যদি বিচারক গ্রহণ করেন।"

জবাব ঃ "কুরআনে যিনার শাস্তি" শিরোনামের প্রবন্ধসহ চিঠি পেয়েছি। আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ মনোযোগ দিয়ে পড়ার পর আমি যে

সিদ্ধান্তে পৌছেছি তা হচ্ছে, (আমার এ বক্তব্যে আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেননা)। কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং শরয়ী আহকামের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে আপনি সেসব সাবধানতা অবলম্বন করেননি, যা একজন আল্লাহভীরু লোকের অবলম্বন করা উচিত। যদি আপনি আমার উপদেশ মানেন, তাহলে আমি আপনাকে দু'টি নীতিগত কথা বলবো। একটা হলো, আপনি নিজের মনমাফিক মতবাদ তৈরি করে নিয়ে তার সপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল খোঁজ করার পদ্ধতি ত্যাগ করুন। এর পরিবর্তে কুরআন ও হাদীস থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার আলোকে মতবাদ গঠন করুন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কুরআন ও হাদীস থেকে কোনো মাসয়ালা উদ্ভাবন করার সময় আগেকার মুজতাহিদ, মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে একেবারে এড়িয়ে যাবেননা। তাদের একজনের মত বর্জন করে অন্য জনের মত গ্রহণ করার স্বাধীনতা আপনার আছে। তবে তাদের সকলের থেকে আলাদা হয়ে আপনি নিজে একটি স্বতন্ত্র মাযহাব বানানোর চেয়ে তাদের কারো এক জনের সাথে থাকা উত্তম। একক ও স্বতন্ত্র মত কেবলমাত্র সে অবস্থায়ই জায়েয হতে পারে, যখন আপনি কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে অধ্যয়ন করে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণামূলক তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবেন (যার পরিচয় আপনার লেখাসমুহে আমার নজরে পড়েনি)। আর যে বিষয়ের উপর আপনি এককভাবে মতামত ব্যক্ত করতে চান, সে বিষয়ে আপনার দলিল হতে হবে অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত। এ দুটি কথা যদি আপনি স্মরণ রাখেন, তাহলে আপনার প্রবন্ধে যে ধরনের ভুল আমি পেয়েছি, তা থেকে অব্যাহতি পাবেন বলে আশা রাখি।

আপনার প্রবন্ধের বিশদ সমালোচনা করা অবশ্য আমার জন্যে কঠিন। তবে যেসব ভুল এক নজরে ধরা পড়েছে, সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি ঃ

১. আপনার এ কথাটি একদিক থেকে ঠিক যে, কুরআনে চুরি ও ব্যভিচারের যে দন্ডবিধির কথা বলা হয়েছে তা চরম দন্ড। ন্যুনতম শাস্তি বিচারকের বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল। তবে এথেকে একটা বড় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এই সংগে একথাও সুস্পষ্ট হওয়া দরকার যে, যখন যিনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে শরীয়ত মুতাবিক প্রয়োজনীয় সাক্ষী পাওয়া যায় এবং শরয়ী আইননানুয়ায়ী চুরি করার অপরাধ সাব্যস্ত হয়ে যায়, তখন চুরি ও যিনার জন্যে কুরআনে নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করতে হবে। এমতাবস্থায় নির্ধারিত দন্ডের চেয়ে কম শাস্তি দেয়ার অধিকার বিচারকের থাকবেনা। তবে সামান্য পর্যায়ের

চুরির জন্যে সামান্য শাস্তি পাবে। আর যিনা সাব্যস্ত হবার সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া যদি লঘু পার্যায়ের অশ্লীল কাজ প্রমাণিত হয়, তাহলে এমতাবস্থায় লঘু শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

২. আপনি এ নিবন্ধেও আপনার ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। الزانية -র অর্থ করেছেন যিনা কার্যে সহায়তা দানকারী লোক। যিনা কার্যের মেয়ে ও পুরুষ দালাল, প্রস্তাবক, ব্যবস্থাপক সবাইকে এর মধ্যে শামিল করেছেন। কুরআন সুস্পষ্টভাবে এ অর্থ অস্বীকার করে। যে আয়াতে الزانى ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাজার কথা বলা হয়েছে, সে আয়াতে الزانى এর আগে الزانية এর উল্লেখ আছে। তারপর উভয়ের জন্যে একই দন্ডবিধি নির্ধারিত হয়েছে।

فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَامِائَةَ جَلْدَةٍ –

"উভয়ের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো।"

এখানেও আপনি কুরআনের আলোকে নিজের মত পরিবর্তন করার পরিবর্তে কুরআনের হুকুমকে নিজের মতানুযায়ী পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এমন তৎপরতা চরম ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা পরিহার করা উচিত ছিলো।

৩. মুশরিক ও মুশরিকার যে অর্থ আপনি বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ যে স্ত্রী নিজের স্বামীর সাথে যৌন উপভোগে শরীক করে সে হলো মুশরিকা। আর যে স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে অপর স্ত্রীলোককে যৌন উপভোগে শরিক করে, সে হলো মুশরিক, এ অর্থ সম্পূর্ণ অদ্ভূত, যার কোনো ভিত্তি অভিধানে নেই, নেই পরিভাষায়ও। এমন কোনো ইশারা ইংগিতও পাওয়া যায়না, যার ভিত্তিতে এমন ধারণাতীত ও অকল্পনীয় অর্থ করা যেতে পারে।

اَلزَّا نِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً ..... (النور: ٣)

আয়াতের - لاينكح অর্থ হলো- لا يليق به ان ينكح অর্থাৎ যিনাকারী এমন পাপিষ্ঠ যে, সে কোনো পাক পবিত্র সতী সাধ্বী মু'মিন রমণীর পানি গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখেনা। তার জন্যে একজন পাপিষ্ঠা, অসতী নারী কিংবা মুশরিকা উপযুক্ত হতে পারে। আর ব্যভিচারিণী নারী এমন পাপিষ্ঠা, কলঙ্কিণী যে, সে কোনো নিষ্পাপ নিষ্কলুষ মু'মিন পুরুষের উপযোগী নয়। সে নারী যদি বিবাহ করতে চায় তাহলে একজন পাপী অসৎ চরিত্র পুরুষ কিংবা মুশরিকই তার জন্যে উপযুক্ত হতে পারে। এর মাধ্যমে যিনার দোষ ত্রুটি ও করুণ পরিণতি

স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঈমানদার, নেককার ও সৎ লোকদের বলা হয়েছে, তারা যেনো পরিচিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী নর নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে। একথা বলাই আয়াতের উদ্দেশ্য।

৪. এটাকে অদ্ভূত ব্যাপার ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! আপনি নিজেই দেখছি স্বীকার করেন যে, খলীফা চতুষ্টয় এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনার চরম অবস্থায় (বিবাহিত ব্যভিচারীর কথা আপনি খুলে বলেননি) অপরাধীকে রজম করার শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও "রজম আধুনিক সভ্যতা বিরোধী এবং কোনো মানবিক চেতনা রজমকে বরদাশ্‌ত করতে পারেনা"। এসব কথা বলতে সংকোচ বোধ করছেননা। আমি মনে করি, যদি আপনি কখনো আপনার কথিত বাক্যের উপর নিজে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি নিজেই লজ্জিত হবেন। কোনো মানবিক প্রকৃতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশী পবিত্র, দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল হতে পারে কি? আধুনিক সভ্যতা (আণবিক বোমা সমৃদ্ধ সভ্যতা) কি মুসলমানদের জন্যে কোনো সত্যের মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত?

আপনি নিজে আমাকে আপনার লেখার সমালোচনা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শুধু সে কারণেই এ কয়েকটি কথা পেশ করলাম। আপনি নিজেই সমালোচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমি মনে করি আপনি আমার কথাগুলো ঠান্ডা মাথায় পড়বেন এবং সত্য সঠিক মনে হলে গ্রহণ করবেন। (তরজমানুল কুরআন, রবিউল আওয়াল-রবিউস সানী ১৩৭০, জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী ১৯৫১, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

মেয়েদের সমকামিতা

প্রশ্ন ঃ আজকাল মহিলা কলেজের বিষময় পরিবেশে মেয়েদের মধ্যে একটি আজব ব্যাধি সংক্রামিত হচ্ছে। দু'টি মেয়ের স্বাভাবিক বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সীমা ছাড়িয়ে সমকামিতার রূপ পরিগ্রহ করছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে একাজ সগীরা বা কবীরা গুনাহের কোন্ পর্যায়ে পড়ে?

জবাব ঃ পুরুষের সাথে পুরুষের যৌনাচার যতো বড় গুনাহ নারীর সাথে নারীর যৌনাচারও তেমনি পর্যায়ের বড় গুনাহ্। নৈতিকতার দিক দিয়ে এ দু'য়ের মধ্যে ধরন ও পর্যায়গত কোনো পার্থক্য নেই। পরিতাপের বিষয়, এই তথাকথিত "ললিত কলা" যা সাময়িকীর মাধ্যমে এবং গল্প ও

নাট্যাকারে ঘরে ঘরে পৌছে যাচ্ছে, এই অশ্লীল ছবি ও ফিল্ম, যেগুলো পুরুষদের মতো মেয়েরাও স্বাধীনভাবে দেখছে, এই প্রেমমূলক গান, যা রেডিওর সাহায্যে শিশুদের মুখেও উচ্চারিত হচ্ছে এবং পুরুষের এই অবাধ মেলামেশা, যা আমাদের সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে - এসব কিছু মিলে যুবকদের মতো যুবতীদেরকেও অস্বাভাবিক আবেগ উত্তেজনায় পাগল করে তুলেছে। বুকের মধ্যে যৌন উত্তেজনার যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে ফুঁকের পর ফুঁক দিয়ে তার শিখাগুলোকে আরো বেশি লকলকে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে যে বিকৃতি এতোদিন পুরুষেদের মধ্যে পাওয়া যেতো তা একটি সংক্রামক ব্যাধির মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এবং নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। যেসব মহিলা মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন তাদের বক্তব্য হলো, আজ মেয়েদের মধ্যে যে বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও যৌন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা করার সাহস এবং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় ধরনের যৌন প্রবণতার প্রকাশ ও ঘোষণা করার দুঃসাহস পাওয়া যায় কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তা চিন্তা করাও দুষ্কর ছিলো। কোন্ ছাত্রি কোন্ শিক্ষিকার প্রিয়তম এবং কোন্ মেয়ে অন্য মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে - একথা আজ খোলাখুলি আলোচনা হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!)

মজার ব্যাপার হলো, যারা স্বজাতিকে এই জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তারা নিজেদের এ পর্যন্তকার প্রচেষ্টার পরিণতির ব্যাপারেও খুশি নয়। তাদের আক্ষেপ হলো, মোল্লাদের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ যদি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতো, তাহলে প্রগতি আরো ত্বরান্বিত হতো। (তরজমানুল কুরআন, রমযান-শাওয়াল ১৩৭১, জুন-জুলাই ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

হস্তমৈথুন

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি পূর্ণ যৌবনে পদাপর্ণ করেছে। যৌন উত্তেজনা অত্যন্ত প্রবল। এখন এই উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

এক. তাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যে মেয়েটির সাথে তার বাকদান হয়েছে, সে এতো অল্পবয়স্কা যে, এখনো কমপক্ষে আরো তিন চার বছ অপেক্ষা করতে হবে।

দুই. তাকে নিজের খান্দানের বাইরে অন্যত্র বিয়ে করতে হবে। কিন্তু বাইরে

বিয়ে করলে সমগ্র খান্দানই তার বিরোধি হয়ে যাবে বরং তার খান্দানের সাথে তার সম্পর্কোচ্ছেদেরও আশংকা রয়েছে।

তিন. সে সাময়িকভাবে কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করে নেবে এবং নিজের খান্দানের প্রস্তাবিত মেয়েটির সাথে বিয়ে হয়ে যাবার পর পূর্বের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে। কিন্তু এ অবস্থা ও 'মুতার' মধ্যে কোনো বিশেষ তফাত নেই।

চার. উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে তাকে অনবরত রোযা রাখতে হবে। কিন্তু সে একজন শ্রমজীবী। সারাদিন তাকে পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। রোযা রেখে এতো বেশি মেহনত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

পাঁচ. সর্বশেষ পন্থা হিসেবে যিনা থেকে বাঁচবার জন্যে তাকে হস্তমৈথুনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এ পরিস্থিতিতে সেকি এ পন্থা অবলম্বন করতে পারে?

জবাব ঃ হস্তমৈথুন সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে তিনটি মত আছে ঃ

১. এটি একটি মোবাহ কর্ম এবং এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে হলে বড়জোর এতোটুকু বলা যায় যে, একাজ উন্নত নৈতিকবৃত্তির বিরোধি হবার কারণে এটি একটি মাকরূহ ও অপছন্দনীয় কাজ। এই অভিমতের সমর্থকরা এ যুক্তি পেশ করেন যে, হাদীস ও কুরআনের কোথাও এ কাজটিকে হারাম বলে উল্লেখ করা হয়নি। উপরন্তু আল্লাহ বলেছেন ঃ ওয়া কাদ ফাসসালা লাকুম মা হাররামা আলাইকুম "আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে যেসব বস্তু হারাম করেছেন, সেগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন"। কাজেই হারামের ফিরিস্তিতে যখন এর উল্লেখ নেই তখন এটি হালাল। ইবনে হাযম 'মুহাল্লা গ্রন্থে' পূর্ণ দলিল প্রমাণাদি ও সনদসহ এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একথাও উল্লেখ করেছেন যে, হাসান বসরী, আমর উবনে দীনার ও মুজাহিদ এ কাজের বৈধতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং আতা একে নিছক মাকরুহ মনে করতেন (১১ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯২-৯৩)।

'আল্লামা আলুসী রুহুল মাআনী' গ্রন্থ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিম্নোক্ত অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'প্রয়োজনকালে এ কাজটি সিংগা লাগিয়ে রক্তক্ষরণ করার ন্যায় জায়েজ' (১৮ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০)। তবে হাম্বলী ফিকাহর কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে আমি ইমাম আহমদের এ ফতোয়াটি দেখিনি।

২. এটি একটি হারাম কর্ম। কিন্তু যদি যিনার ফিতনায় লিপ্ত হবার

আশংকা থাকে এবং তা থেকে বাঁচবার জন্যে কেউ এভাবে যৌন আকাংখা চরিতার্থ করে, তাহলে আশা করা যায় যে, তাকে আযাব দেয়া হবেনা। এটি হচ্ছে হানাফিদের অভিমত। 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ কাজটি হারাম এবং এ কাজে ব্রতী হলে আযাব ভোগ করতে হবে। তবে যিনার আশংকায় যদি কেউ এতে ব্রতী হয়, তাহলে "আশা করা যায়, তাকে এজন্যে আযাব দেয়া হবেনা।" রোযা ও (দন্ডবিদি অধ্যায়) আল্লামা আলুসী এরই কাছাকাছি ইবনে হুমামের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন (ঐ গ্রন্থে) এবং আল্লামা ইবনে আবেদীন এরই সাথে সামঞ্জস্যশীল ফকীহ আবুল লায়সের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। এই মতের সপক্ষে কোনো বিশেষ আয়াত বা হাদীস নেই বরং ইসলামের একটি সাধারণ নীতি থেকে এটি গৃহীত হয়েছে। যেমন অক্ষম ও অস্বাভাবিক অবস্থায় হারাম বস্তু ব্যবহারের অনুমতি আছে এবং দুটি নাজায়েয কাজ অপরিহার্য হয়ে গেলে তাদের মধ্যে থেকে অপেক্ষাকৃত কম নাজায়েয কাজটি অবলম্বন করার নীতি ইলসামে স্বীকৃত।

৩. এটি হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ হারাম কাজ। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক এ মতের পক্ষপাতী। তাঁরা সূরা মুমিনুনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে এর প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْ وَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذَالِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَا دُ وْنَ - (المؤ منون : ٥ - ٧)

"আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে স্ত্রী ও দাসীদের ছাড়া তারা তিরস্কারের যোগ্য নয়। অতপর যারা এগুলো ছাড়া অন্য পথ (যৌন আকাংখা চরিতার্থ করার জন্যে) তালাশ করে, তারাই সীমা লংঘনকারী"। (আয়াত ঃ ৫-৭)

এখন যে বিশেষ ব্যক্তিটির সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তার প্রসংগে আসা যাক। তাকে আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার এ নসিহতটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ঃ

وَ لِيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ - (النور : ٣٢)

'যারা বিয়ে করার সুযোগ পায়না তাদের নিষ্কলুষ থাকার চেষ্টা করা উচিত, যতোক্ষণ না আল্লাহ তাআলা নিজের মেহেরবানীতে তদেরকে ধনী করে দেন। (আন্নূর ঃ ৩৩)

অতপর আমি তাকে পরিষ্কার বলবো, একটি হারাম বস্তুকে হালাল করার জন্য আপনি নিজের যে অক্ষমতার কথা পেশ করেছেন, তা কোনোক্রমেই এমন পর্যায়ের নয়, যার ফলে একটি হরাম বস্তু হালাল হয়ে যেতে পারে। আপনি নিছক নিজের খান্দানের ভয়ে বিয়ে করছেননা অথচ ঐ খান্দান একটি যুবককে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের সাথে বাকদান করে তার অজ্ঞতার পূর্ণ প্রমাণ পেশ করেছে। এখন যদি আপনি বিয়ের সুযোগ পান কিন্তু খান্দানের অসন্তুষ্টির ভয়ে তা থেকে পিছিয়ে আসেন, তাহলে আপনি যে কোনো পর্যায়ের গুনাহ করেননা কেন আল্লাহ অবশ্যি আপনাকে পাকড়াও করবেন। কারণ আসলে আপনার কোনো অক্ষমতা নেই। বাহানাবাজি না করে সোজা চিন্তা করে দেখুন কাকে ভয় করা উচিত - আল্লাহকে না খান্দানকে? (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

১১

নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত

মেয়েদের জামায়াতে নামায পড়া

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের জামায়াতে নামায পড়ার পদ্ধতি কি? একজন নারী কি অপর নারীদের ইমামতি করতে পারে?

জবাব ঃ হ্যাঁ পারে। নবী করীম সা. তাদেরকে এই অনুমতি দিয়েছেন এবং পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ মহিলা ইমামকে কাতারের ভিতর দাঁড়াতে হবে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

মহিলাদের জুমা'র নামায

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের জন্যে জুমা'র নামায পড়া কি বৈধ?

জবাব ঃ হ্যাঁ, যদি পর্দার ব্যবস্থা থাকে তবে তাদের জন্যে জুমা'র নামায পড়া বৈধ। তবে, ফরয নয়। মেয়েদের জন্যে মসজিদে নামায পড়ার চাইতে নিজের ঘরে নামায পড়া উত্তম। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

মহিলাদের হজ্জের সফর

প্রশ্ন ঃ মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের হজ্জে যাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আপনি মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মাযহাবের বক্তব্য বিশদভাবে অবহিত করবেন। আপনার মতে কোন্ বক্তব্যটি প্রাধান্য লাভের উপযোগী তাও জানাবেন।

জবাব ঃ মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের হজ্জে যাওয়ার প্রসংগটি একটি মতভেদপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে চারটি মতামত পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে সবগুলো বর্ণনা করছি ঃ

১. মহিলাদের জন্যে কোনো অবস্থাতেই মাহরাম বা স্বামী ছাড়া হজ্জ করা উচিত নয়। এ মত ইবরাহীম নখয়ী, তাউস, শা'বী এবং হাসান বসরী থেকে বর্ণিত। হাম্বলী মাযহাবেরও এটাই ফতওয়া।

২. যদি হজ্জের সফর তিনদিন তিনরাতের কম হয়, তাহলে মহিলা

মাহরাম ছাড়া হজ্জে যেতে পারে। কিন্তু যদি তিনদিন কিংবা তার চেয়ে বেশি দিনের সফর হয় তবে স্বামী কিংবা মাহ্‌রাম ছাড়া যেতে পারবেনা। ইমাম আবু হানিফা র. ও সুফিয়ান ছাওরী র. এ মত পোষণ করেছেন।

৩. যে মহিলার স্বামী কিংবা মাহরাম নেই, সে এমন লোকদের সাথে হজ্জে যেতে পারবে, যাদের চরিত্র ও নৈতিক জীবন সন্তোষজনক। ইবনে সিরীন, আতা, যুহরী, কাতাদাহ এবং আওযায়ী এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালিক র. এবং শাফেয়ী র.ও এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী র. "সন্তোষজনক সাথীদের" অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, যদি কতিপয় স্ত্রীলোক নির্ভরযোগ্য হয় এবং তারা নিজেদের মাহরামদের সাথে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় একজন স্বামী বিহীন অথবা মাহরাম বিহীন মহিলা তাদের সাথে যেতে পারে। তবে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীলোকের সাথে তার না যাওয়াই উচিত।

৪. এ সবের বিপরীত পক্ষে ইবনে হাযম র.-এর মত হলো মাহরামহীন স্ত্রীলোককে একাকীই হজ্জে যেতে হবে। যদি তার স্বামী থাকে এবং সে তাকে সাথে করে নিয়ে না যায়, তবে স্বামী গুনাহগার হবে। কিন্তু মহিলাটির জন্যে স্বামী ছাড়াই হজ্জে চলে যাওয়া জায়েয।

আমি চারটি মতামতের মধ্যে তৃতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কারণ এতে একটি দীনি ফরয কাজ আদায় করারও অবকাশ থাকে, আবার যে আশংকার কারণে মাহরাম ছাড়া সফর করার নিষেধাজ্ঞা হাদীসে এসেছে তারও সম্ভাবনা থাকেনা। (তরজমানুল কুরআন, যিলহজ্জ ১৩৭১, সেপ্টেম্বর ১৯৫২, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

নামাযে একাগ্রতা

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! কিভাবে একাগ্রতা লাভ করা যায়? নামায এবং পড়া লেখা করার সময় আমি মনোযোগী এবং একাগ্রচিত্ত হতে পারিনা। এ জিনিস কিভাবে লাভ করা যাবে?

জবাব ঃ এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগান। বার বার ব্যর্থ হবার পরও বার বার চেষ্টা চালিয়ে যান। সাহস হারাবেননা. নিরাশ হবেননা এবং প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ করবেননা। নামায পড়ার সময় এই কথাটির প্রতি মনোযোগী হবেন যে, আপনি আপনার মহান স্রষ্টার সামনে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর সাথেই কথাবার্তা বলছেন। একইভাবে পড়া লেখা করার সময় এক সাথে বিভিন্ন বিষয়েরও বিভিন্ন

প্রকারের পড়া লেখা একত্রে করবেননা। systematic অধ্যয়ন করুন। নিজের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারিণ করে অধ্যয়ন করুন। ইনশায়াল্লাহ একাগ্রতার মহান নিয়ামত আপনি লাভ করবেন। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

নামাযে মনোযোগ ছুটে যাওয়া

প্রশ্ন ঃ নামায পড়ার সময় মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা এসে উঁকি মারে। এতে কোনো কোনো সময় নামায ভুলও হয়ে যায়। অনুগ্রহ করে এর প্রতিকার বলে দিবেন কি?

জবাব ঃ আল্লাহর প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করা ছাড়া এ ধরনের কল্পনা ও সংশয়ের আর কোনো প্রতিকার নেই। আর বুঝে বুঝে কুরআন পড়া, সৎ ব্যক্তিদের সাথীত্ব গ্রহণ করা এবং মনোযোগের সাথে দীনের কাজ করার মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আর এই আকর্ষণ ও প্রভাব নামাযে অনুভূত হয়। এতে করে বহির্মুখী চিন্তা কল্পনার সমাবেশও ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। মনে রাখবেন, নামায হচ্ছে মানুষের এমন একটা অবস্থা যা শয়তানের কাছে সবচাইতে অসহ্য। তাই নামাযের উপরেই শয়তান সবচাইতে শক্তিশালী হামলা চালায়। সে নামাযি ব্যক্তির মনোযোগ ভিন্নপথে ধাবিত করার চেষ্টা করে। তাই শয়তানের মোকাবেলা করা মানুষের কর্তব্য। আর মোকাবেলা করে নিজের মনোযোগকে আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করা মানুষের কর্তব্য। এই চেষ্টা সাময়িক এবং হালকা ধরনের হলে চলবেনা। বরঞ্চ এটাতো হবে অবিরাম চেষ্টা সংগ্রাম। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তো মানুষ চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। নামাযও তারই একটা অংশ। এখানেও সেরকম চেষ্টা সংগ্রাম চালানো উচিত। যেভাবে জীবনের অন্যান্য কাজে চেষ্টা সংগ্রাম চালানো হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো কল্পনা মনে উদিত হলে সেটা আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ভাবনা চিন্তার জগতে প্রবেশ করা যাবেনা এবং কল্পনার জগতে নিমগ্নও থাকা যাবেনা। আপনার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে আপনার মনের কোণে কোনো কল্পনা উদিত হলে আপনি যেনো সেদিকে মানোযোগ না দেন। চিন্তা কল্পনা থেকে মনকে রক্ষা করার আরেকটি সফল পন্থা হচ্ছে এইযে, আপনি নামাযে যা কিছু পড়েন ও বলেন তার অর্থ ও তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখুন। নামাযে যা পড়ছেন এবং বলছেন সেদিকে মনোনিবেশ করুন। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

নামাযে হাত নাড়াচাড়া করা

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো লোক নামাযে হাত নাড়াচাড়া করে। কেউ কেউ কাপড় ঠিকঠাক করে নেয়। কোনো কোনো সময় তাদের হাত বাঁধা থাকেনা। উভয় হাতেই জামা কাপড় ঠিক করে। এমতাবস্থায় নামায কি ঠিক থাকে?

জবাব ঃ আসলে অনেক সময় শরয়ী মাসায়েল বর্ণনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়না। ফলে মানুষের মধ্যে চরমপন্থী দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি হয়। কেউ যখন নামাযের মধ্যে একই সময় উভয় হাত মিলয়ে অবিরাম কিছু সময় কাজ করে তখন একাজটা নামাযের ত্রুটি সৃষ্টি করে। এতে করে বাহির থেকে যারা তাকে একাজটি করতে দেখে তাদের জন্যে এটা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, লোকটি কি নামায পড়ছে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করছে? দ্বিতীয়ত এ থেকে এ ধারণারও সৃষ্টি হয় যে, লোকটি নামায থেকে অমনোযোগী হয়ে অন্য কোনো কাজ করছে। উভয় কারণেই এমনটি করা ঠিক নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রকৃত প্রয়োজনেও লোকজন তার হাত পা নাড়াতে পারবেনা।

এক ধরনের কাজ হচ্ছে, উভয় হাত একত্র করে একটি কাজ করা। আরেক ধরনের কাজ হচ্ছে, উভয় হাতকে নিজ নিজ অবস্থানে রেখেই পৃথক পৃথক কাজ করা। এই দুই ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রয়োগ করা ঠিক নয়। ধরুন কোনো ব্যক্তির যদি দুই দিক থেকে চুলকানি শুরু হয়, তখন সে কি করবে? কিংবা কোনো ব্যক্তির দুই পাশে যদি একই সময় কোনো কিছু কামড়াতে থাকে তখন সে কি করবে? এমনি করে সিজদায় যাবার সময় কোনো ব্যক্তি যদি আরামের সাথে সিজদায় যাবার জন্যে স্বীয় তহবন্দ বা পাজামাকে দুই দিক থেকে কিছুটা উঠিয়ে নেয় তার একাজেও শুধু শুধু অভিযোগ করা ঠিক নয়। এ ফায়সালা দেয়া উচিত নয় যে, তার নামায নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য এ ধরনের কাজের মধ্যে এবং উভয় হাত একত্র করে একটি কাজ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজে এরূপ চরম মানসিকতা এবং গোঁড়ামীও দেখা দিয়েছে যে, লোকেরা ছোটো খাটো ব্যাপারে নামায নষ্ট হবার এবং বিরাট বিরাট গুনাহ হবার ফায়সালা দিয়ে দেয়। মাসায়েল বলার ক্ষেত্রে এ ধরনের কঠোরতা থেকে বিরত থাকা উচিত।[১] (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

ছুটে যাওয়া ফরয সমূহের কাযা এবং নফল

প্রশ্ন ঃ একজন মাওলানা লিখেছেন, “কাযা নামাযসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব

১. আইন ৫ মে, ১৯৮৬ ইং।

আদায় করা কর্তব্য। .... যতোক্ষণ কারো জিম্মায় ফরয অনাদায়ী থাকে, ততোক্ষণ তার কোনো নফল কবুল করা হয়না।"

বিবেকের রায় অনুযায়ী এ মূলনীতি যে গুরুত্ববহ তা বুঝার জন্যে কোনো দলিল প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু শরীয়ত আমাদের বিবেক বুদ্ধিসম্মত কোনো মূলনীতি স্বীকার করে নিয়ে তার উপর তার বিষয়াবলীর ভিত্তি স্থাপন করবে, এমনটি জরুরি নয়। অথচ আমাদের এদিককার মুসলমানদের সম্ভবত অধিকাংশের অবস্থাই হচ্ছে যে, প্রত্যেকের জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় জাহিলিয়াতের উপর অতিবাহিত হয়েছে। এসময় না নামাযের খেয়াল ছিলো আর না রোযার পরোয়া ছিলো। এ কারণে কাযা নামাযের জিম্মা থেকে মুক্ত লোকের সংখ্যা খুবই কম।

এখন এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো সৃষ্টি হয় ঃ

কোনো ছুটে যাওয়া ফরয নামায জিম্মায় থাকা অবস্থায় নফল (সুন্নতও যার অন্তর্ভুক্ত) কবুল হবেনা, একথা কি সঠিক?

যে ব্যক্তির জিম্মায় ছুটে যাওয়া ফরয নামাযের কাযা বাকি রয়েছে, সে যদি দৈনন্দিনকার ফরয নামায আদায়ের সময় সুন্নত ও নফল পড়ে, তবে তার এই সুন্নত-নফলের পরিণতি কি হবে? সেগুলো কি বিনষ্ট হয়ে যাবে? নাকি পূর্বের ছুটে যাওয়া ফরযসমূহের কাযা বলে গণ্য হবে?

এই মূলনীতির (অর্থাৎ কারো জিম্মায় অনাদায়ী ফরয থাকলে তার নফল কবুল করা হয়না, একথার) পক্ষে প্রমাণস্বরূপ ঃ "ইলাইহি ইয়াসয়াদুল কালিমুত তাইয়্যিবু ওয়াল আমালুস্ সালিহু ইয়ারফাউহু"[১] - আল্লাহ্‌র এইযে বাণীটি ব্যবহার করা হয় তা কতোটা সঠিক? কোনো হাদীসে 'আমলে সালেহ্'র অর্থ - ফরযসমূহ এবং 'কালিমুত তাইয়্যিবু'র অর্থ নফল যিক্‌র আযকার বলে বর্ণিত হয়েছে কি?

জবাব ঃ একটা বিশুদ্ধ বিষয়কে কিছুটা ভুল পন্থায় বর্ণনা করার ফলে আপনার মনে এসব প্রশ্ন উদয় হয়েছে। কারো কোনো আমলকে কবুল করা বা না করা মানুষের ইখতিয়ারে নয়। তা কেবল বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার ইখতিয়ারেই রয়েছে। কারো জিম্মায় যদি ফরযের কাযা বাকি থাকে আর তিনি যদি ফরযের কাযা আদায় করার সাথে সাথে আন্তরিকতার সাথে সুন্নত ও নফল পড়েন, তবে আল্লাহ তায়ালা তার এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে গ্রহণ না করার কোনো কারণ নেই। তবে কেউ যদি

---

১. "কালিমুত তায়্যিব তাঁর নিকট পৌঁছে থাকে। আমলে সালেহ তা পৌঁছে দিয়ে থাকে।" এ হচ্ছে বাক্যটির অর্থ।

অনাদায়ী ফরযসমূহের প্রতি উদাসীন থাকে, তাহলে তার এরূপ আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবার আশা করা যায়না। কারণ ফরযের কাযার উদাহরণ করযের মতো। করয পরিশোধে উদাসীনতা প্রদর্শন করে যতোই দান খয়রাত করা হোক না কেন, তার কোনো অর্থ নেই।

অবশ্য যারা জীবনের এক বিরাট অধ্যায় জাহিলিয়াতের মধ্যে অতিবাহিত করেছে এবং সে সময় অসংখ্য নামায ছেড়ে দিয়েছে, তাদের জন্যে পেছনের কাযাও আদায় করা এবং সেই সাথে সুন্নত নফল পড়া কঠিন ব্যাপার। এমনটি করলে তাকে আলস্য পেয়ে বসতে পারে এবং ফরযের কাযা আদায় বাকি থাকার আশংকা থেকে যেতে পারে। পক্ষান্তরে তার জন্য সহজ পন্থা হলো, প্রত্যেক ফরয নামাযের সাথে সাধারণতঃ যতোগুলো সুন্নত নফল পড়া হয়ে থাকে, সেগুলো সে সুন্নত নফলের পরিবর্তে অনাদায়ী ফরযের কাযা আদায়ের নিয়্যতে পড়বে। এবং সে ততোদিন পর্যন্ত এমনটি করতে থাকবে যতোদিন তার মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মে যে, এখন তাঁর পেছনের সমস্ত কাযা নামায আদায় হয়ে গেছে। এভাবেই সহজ পন্থায় কোনো ব্যক্তি তার ঘাড়ে চেপে থাকা ফরয থেকে মুক্ত হতে পারে।

পড়া নামাযসমূহ বিনষ্ট হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এখন যেহেতু মাসআলা জানতে পেরেছেন, তাই সামনের সমস্ত সুন্নভ ও নফল পেছনের অনাদায়ী ফরযসমূহের কাযার নিয়্যতে পড়তে আরম্ভ করুন।

কাযা রোযার বিষয়টি ছুটে যাওয়া নামাযেরই মতো। যার ফরয রোযা ছুটে গিয়েছিল, সে নফল রোযা রাখার পরিবর্তে পেছনের ফরয রোযা আদায়ের নিয়ত করবে। (তরজমানুল কুরআন ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ৩য় খন্ড)

রোযার কষ্ট ও বিশেষ দিনের রোযা

প্রশ্ন ঃ রোযা আশূরার দিন রাখা হোক কিংবা অন্য কোনো দিন, সর্বাবস্থায় রোযা রাখার কষ্টতো একই রকম হয়ে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ দিন রোযা রাখার পুরস্কার বড় হয়ে থাকে কেন?

জবাব ঃ নেক কাজ যখনই করা হোক, তার জন্যে পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনের সাথে নেকীকে সম্পৃক্ত করার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন আশূরার রোযা। এই দিন ফেরাউনের মতো দুর্ধর্ষ শাসক এবং তার বাহিনীকে বনী ইসরাঈলীদের চোখের সামনে পানিতে নিমজ্জিত করে আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোলামী থেকে মুক্ত করেন। তাই হযরত

মূসা আ. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া) প্রকাশ করার জন্যে এইদিন রোযা রাখতেন। এখন কেউ যদি ঐ বিরাট ঘটনার স্মরণে সেদিনটিতে রোযা রাখে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই দিনকার রোযা দ্বারা তার অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা সৃষ্টি হওয়া অন্য দিনকার রোযা দ্বারা সম্ভব নয়। এ জন্যেই এদিনকার রোযার অধিক মর্যাদা রয়েছে। একইভাবে আরাফার দিনের রোযাও মর্যাদাশীল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এদিনকার রোযাও অন্য যে কোনো দিনকার রোযার মতোই। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, এই দিনটিতে আপনি এখানে বসে আছেন। অথচ একই সময় ওখানে হজ্ব হচ্ছে। মানুষ আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়েছেন। এই দিনটিতে রোযা রাখার অর্থ এই দাঁড়ায়, আপনার অন্তর আরাফাতের ময়দানে ছুটে গিয়েছে। আপনার মন আরাফার হাজীদের মতোই আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিচ্ছে। এখন এই দিনটির রোযা আপনার মনের মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি করবে তা কি অন্য দিনের রোযা দ্বারা সম্ভব?

মান্নতের রোযা

প্রশ্ন ঃ এক ব্যক্তি রোযা রাখার মান্নত করেছে। কিন্তু রোযা রাখার শক্তি তার নেই। এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে তার মা, ভাই কিংবা অন্য কেউ রোযা রাখতে পারে কি?

জবাব ঃ যে ব্যক্তি মান্নত করলো তার পক্ষ থেকে অন্য কেউ রোযা রাখলে মান্নত পূর্ণ হবেনা। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

যাকাত বনাম করয

প্রশ্ন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি কাউকেও যাকাতের অর্থ যাকাতের নিয়্যতেই দেয়, কিন্তু দেবার সময় করয বলে দেয় যাতে করে প্রাপক তা চিন্তাভাবনা করে খরচ করে, অপব্যয় না করে কাজে লাগায়, তবে তার যাকাত আদায় হবে কি?

জবাব ঃ আপনি একটি লোককে যাকাত দিচ্ছেন, অথচ অনর্থক তাকে ধারণা দিচ্ছেন ভ্রান্ত। বলছেন, আমি তোমাকে করয দিচ্ছি। অর্থাৎ একটা নেকীর সাথে একটি বদী শামিল করে দিচ্ছেন। আপনার ধারণা, এর দ্বারা লোকটির কল্যাণ হবে। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন, যাকে আপনি যাকাতটা দিচ্ছেন, সে এটাকে করয চিন্তা করে প্রশান্তির সাথে তা খরচও করতে পারবেনা। লোকটি হলো দরিদ্র। আপনি তাকে দিলেন যাকাত। বললেন, করয। এতে করে তার মগজে করয আদায়ের ধান্দা চেপে বসবে এবং দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হবে। মানে যাকাত দিয়ে আপনি তার অশান্তি বাড়িয়ে দিলেন। এখন এতে যদি সত্যিই কোনো কল্যাণ থেকে থাকে, তবে সেটা আপনি ভাল বুঝতে পারেন। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

যাকাতের তাৎপর্য ও মৌলিক বিধান

প্রশ্নমালা ঃ

১. যাকাতের সংজ্ঞা কি?

২. যাকাত প্রদান করা কার উপর ওয়াজিব? এ ব্যাপারে মহিলা, অপ্রাপ্তবয়স্ক, কয়েদী, মুসাফির, পাগল ও প্রবাসীরা কোন্ পর্যায়ভুক্ত, বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন।

৩. যাকাত প্রদান ফরয হবার জন্যে কতো বছর বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করা উচিত?

৪. যাকাত ফরয হবার জন্যে মেয়েদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য অলংকারাদি কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

৫. কোম্পানীর যাকাত কি কোম্পানী প্রদান করবে, নাকি প্রত্যেক অংশীদার নিজ অংশ অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে যাকাত প্রদান করবে?

৬. কারখানা ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর যাকাত ওয়াজিব হবার সীমা বর্ণনা করুন।

৭. যে সমস্ত কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য যাকাত নির্ধারণ করার সময় তাদের মধ্যে কার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে - শেয়ার ক্রয়কারীর উপর নাকি বিক্রয়কারীর উপর?

৮. কোন্ কোন্ আসবাবপত্র ও বস্তুর উপর এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হয়? বিশেষ করে নিম্নলিখিত বস্তুগুলো সম্পর্কে অথবা সেগুলো থেকে সৃষ্ট অবস্থায় কোন্ পদক্ষেপ গৃহীত হবে?

ক. নগদ টাকা, সোনা, রূপা, অলংকার ও মূল্যবান পাথর।

খ. ধাতব মুদ্রা (স্বর্ণখচিত, রৌপ্যখচিত ও অন্যান্য ধাতুখচিত মুদ্রা এর অন্তর্ভুক্ত) এবং কাগজের মুদ্রা।

গ. ব্যাংকে গচ্ছিত আমানত, ব্যাংক অথবা অন্যস্থানে রক্ষিত বস্তুসমূহ, কোথাও থেকে গৃহীত ঋণ, বন্ধকী সম্পত্তি ও বিবাদমূলক সম্পত্তি এবং এমন সম্পত্তি যার বিরুদ্ধে মামলা বা অভিযোগ করা হয়েছে।

ঘ. উপহার, পুরস্কার।

ঙ. বীমার পলিসি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ।

চ. গবাদি পশু, দুধ, দই, ছানা প্রভৃতি উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদি, তরিতরকারি, ফল ও ফুলসহ।

ছ. খনিজ দ্রব্য।

জ. আহরিত গুপ্তধন।

ঝ. প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।

ঞ. বনের বা গৃহপালিত মৌমাছির মধু।

ট. মাছ, মোতি ও পানির অন্যান্য বস্তু।

ঠ. পেট্রোল।

ড. আমদানি রফতানি।

৯. রসূলুল্লাহ সা.-এর আমলে যেসমস্ত বস্তুর উপর যাকাত ফরয ছিলো খোলাফায়ে রাশিদীন তার মধ্যে কোনো বস্তুর নাম বৃদ্ধি করেছিলেন কি? কোনো বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হয়ে থাকলে কোন্ নীতির ভিত্তিতে তা হয়েছিল?

১০. নিকেলের মুদ্রা ও সোনা রূপা ছাড়া প্রচলিত অন্যান্য ধাতুর মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? যেসকল মুদ্রার প্রচলন নেই অথবা যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বা সরকার প্রচলন রহিত করেছেন অথবা যেগুলো বিদেশের মুদ্রা, সেগুলোর যাকাত দিতে হবে কিনা?

১১. প্রকাশ্য ও গোপন সম্পদের সংজ্ঞা কি? এ ব্যাপারে ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ কোন্ পর্যায়ভুক্ত?

১২. যাকাতের উদ্দেশ্যে বর্ধনশীল সম্পদের সীমা বর্ণনা করুন। কেবলমাত্র বর্ধনশীল সম্পদের উপরই কি যাকাত ফরয হয়?

১৩. যেসমস্ত গৃহ, অলংকার ও অন্যান্য বস্তু ভাড়া দেয়া হয়, সেগুলোর এবং টেক্সি ও মোটর প্রভৃতির উপর যাকাত নির্ধারণ করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

১৪. কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন্ কোন্ পশুর উপর যাকাত ফরয হবে? এ ব্যাপারে মহিষ, মুরগী ও অন্যান্য গৃহপালিত এবং সখ করে পালা পশুসমূহ কোন্ পর্যায়ভুক্ত? তাদের যাকাত কি নগদ টাকায় দিতে হবে নাকি পশুই দিতে হবে? কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন বিভিন্ন পশু কতো সংখ্যায় ও কোন্ অবস্থায় পৌছলে তাদের উপর যাকাত ফরয হবে?

১৫. যেসব বস্তুর উপর যাকাত ফরয হয় সেগুলোর যাকাতের হার কি?

১৬. খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে নগদ টাকা, মুদ্রা, গবাদি পশু, ব্যবসায়ী সম্পদ ও কৃষি উৎপাদনের উপর যাকাতের হারের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে সনদসহ

বিস্তারিত কারণ বর্ণনা করুন।

১৭. নগদ টাকার ক্ষেত্রে যদি দু'শ রৌপ্যখচিত দিরহাম ও বিশ স্বর্ণখচিত মিসকালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে এগুলো কতো দেশীয় টাকার সমান হবে? তরিতরকারির ব্যাপারে 'সা' 'ওয়াসাক' দেশের বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশের কোন্ কোন্ প্রচলিত ওজনের সমমানের?

১৮. বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নেসাবের (কমপক্ষে যে পরিমাণ অর্থ সম্পদের উপর যাকাত হয়) মধ্যে এবং যাকাতের হারের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হতে পারে কি? এ ব্যাপারে যুক্তি প্রমাণ সহকারে চিন্তা পেশ করুন।

১৯. কি পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হবার পর বিভিন্ন বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়?

২০. এক বছরে যদি একাধিক ফসল হয়, তাহলে বছরে কেবল একবার যাকাত আদায় করা উচিত নাকি প্রত্যেক ফসলের যাকাত প্রদান করতে হবে?

২১. চান্দ্র বর্ষের হিসাবে যাকাত প্রদান করা উচিত নাকি সৌর বর্ষের হিসাবে? যাকাত নির্ধারণ ও আদায়ের জন্যে কোনো মাস নির্দিষ্ট করা উচিত কি না?

২২. যাকাতের টাকা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যয় হওয়া উচিত?

২৩. কুরআন মজিদে যাকাতের যে ব্যয়ক্ষেত্র উল্লিখিত হয়েছে তার সীমারেখা বর্ণনা করুন। বিশেষ করে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটির অর্থ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

২৪. যাকাতের অর্থের একটি অংশ কুরআনে বর্ণিত যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্রসমূহের প্রত্যেকটিতে ব্যয় করার জন্যে পৃথক পৃথক করে রাখা কি অপরিহার্য? নাকি যাকাতের সমুদয় অর্থ কুরআনে বর্ণিত সমস্ত ব্যয়ক্ষেত্রে ব্যয় করার পরিবর্তে কোনো একটিতে বা কয়েকটিতে ব্যয় করা যেতে পারে?

২৫. যাকাত গ্রহণকারী প্রতিটি শ্রেণীর মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় যাকাত গ্রহণ করার অধিকারী হয়? পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাইয়েদ ও বনী হাশিমের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ কি পরিমাণ যাকাত গ্রহণের অধিকারী হতে

পারে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

২৬. যাকাত কি কেবল ব্যক্তিকে দিতে হবে নাকি প্রতিষ্ঠানকেও (যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, দরিদ্র সেবা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) দেয়া যেতে পারে?

২৭. যাকাতের অর্থ থেকে গরীব, মিসকীন, বিধবা এবং পঙ্গু বার্ধক্যের জন্যে যারা রোজগার করতে অসমর্থ, তাদরকে সারা জীবন পেনশন দেয়া যেতে পারে কি?

২৮. যাকাতকে জনসেবার কাজে, যেমন ঃ মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, পুল, কুয়া, পুকুর প্রভৃতি খনন, নির্মাণ বা মেরামতের কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা, যার ফলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই উপকৃত হতে পারে?

২৯. যাকাতের টাকা কোনো ব্যক্তিকে 'কর্জে হাসানা' অথবা সূদহীন ঋণ হিসেবে দেয়া যেতে পারে কি?

৩০. যে এলাকা থেকে যাকাত আদায় করা হয়, তা সেখানেই ব্যয় করা কি অপরিহার্য? নাকি ঐ এলাকার বাইরে বা পাকিস্তানের বাইরে দুর্বল মনকে সবল করার জন্যে, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত ব্যক্তিদেরকে সাহায্য দানের ব্যাপারেও ব্যয় করা যেতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার মতে এলাকার সংজ্ঞা কি?

৩১. কোনো মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে যাকাত আদায় করার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

৩২. লোকেরা যাতে যাকাত পরিশোধের ব্যাপারে কোনো বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে সে জন্যে কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

৩৩. যাকাত উসুল ও তার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকা উচিত, না কি প্রদেশের হাতে? কেন্দ্র যদি যাকাত আদায় করে, তাহলে তাতে প্রদেশগুলোর অংশ নির্ধারণ করার জন্যে কি নীতি অবলম্বিত হবে?

৩৪. আপনার মতে যাকাত ব্যবস্থা পরিচালনার সর্বোত্তম পদ্ধতি কি? যাকাত জমা করার জন্যে কি পৃথক বিভাগ কায়েম করা দরকার নাকি বর্তমান সরকারী বিভাগসমূহের মাধ্যমে একাজ নেয়া যাবে?

৩৫. যাকাতের কি কখনো সরকারি ট্যাক্স গণ্য করা হয়েছে? নাকি এটি

এমন একটি ট্যাক্স যার কেবল ব্যবস্থাপনা করার ও আদায় করার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়?

৩৬. রসূলুল্লাহ সা. বা খোলাফায়ে বাশিদীনের আমলে জনস্বার্থমূলক কাজের জন্যে সরকারি পর্যায়ে যাকাত ছাড়া অন্য কোনো ট্যাক্স আদায় করা হয়েছে কি? যদি আদায় করা হয়ে থাকে, তাহলে তা কি ট্যাক্স ছিলো?

৩৭. মুসলিম দেশসমুহে যাকাতের ব্যবস্থাপনার ও আদায়ের কি পদ্ধতি ছিলো এবং বর্তমানে কি পদ্ধতি আছে?

৩৮. যাকাত আদায় ও ব্যয় করার ব্যবস্থা কি একমাত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাকবে? নাকি এ জন্যে কোনো কমিটি নিযুক্ত করে সরকার ও জনগণের যুক্ত তত্ত্বাবধানে তা পরিচালিত হবে?

৩৯. যাকাত সংগ্রহ করার জন্যে যেসব কর্মচারী নিযুক্ত করা হবে, তাদের বেতন, এলাউন্স, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফ্যান্ড ও চাকরির শর্তাবলী কি হওয়া উচিত?

জবাব ঃ [১]

১. যাকাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি। এই গুণ দুটির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী পরিভাষায় যাকাত এমন একটি ইবাদতকে বলা হয় যা প্রত্যেক 'সাহেবে নেসাব' মুসলমানের উপর এই উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও বান্দার হক আদায় করে তার অর্থ সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তার নিজের অন্তঃকরণ ও তার সমাজ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি অসৎ প্রবণতা থেকে মুক্ত হবে, অন্যদিকে তার মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, ঐদার্য, কল্যাণ কমনা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির গুণাবলী বৃদ্ধি লাভ করবে।

ফকীহগণ যাকাতের বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ করেছেন। যেমন ঃ

حَقٌّ يَجِبُ فِى اُلمَالِ - (المغنى لا بن قدامه ج ص٤٣٣

"এমন একটি অধিকার যা প্রদান করা অপরিহার্য।" (আল মুগনী ঃ ইবনে কুদামা দ্বিতীয় খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

اِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ اِلٰى فَقِيرٍ وَنَحْوُهُ غَيْرَ مُتَّصِفٍ•

بِمَانِعٍ شَرْعِىٍّ يمنع من الصرف اليه - (نيل الاوطار - ج

১. প্রত্যেকটি জবাব পাঠ করার সময় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটিকে সম্মুখে রাখবেন।

٤ ص ٩٨)

"নেসাব থেকে একটি অংশ এমন কোনো অভাবী ও তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিকে দান করা। যেসমস্ত কারণে শরীয়ত কাউকে যাকাত দিতে অস্বীকার করে, সে সমস্ত কারণ যেনো তার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে।" (নাইলুল আওতার ঃ চতুর্থ খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা)

تَمْلِيكُ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِمُسْتَحِقِّهِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ –

"বিশেষ অর্থ সম্পদ শর্তানুযায়ী তা প্রাপকের মালিকানায় প্রদান করা।" (আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ঃ ১ম খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠা)

২. বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়ষ্ক মুসলমান নারী পুরুষ যদি সাহেবে নেসাব নয়, তাহলে তাদের উপর যাকাত প্রদান করা ফরয এবং এর পরিশোধের ব্যাপারে তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল।

অপ্রাপ্তবয়ষ্ক ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। একটি মত হচ্ছে এইযে, এতীমের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এতীম বালেগ হবার পর যখন তার অভিভাবক তার সমুদয় অর্থ সম্পদ তাকে সোর্পদ করবে, তখন তাকে যাকাতের বিষয়েও বিস্তারিবভাবে জানাবে, অতপর যে কয় বছর সে এতীম অবস্থায় ছিলো তার পুরোপুরি যাকাত আদায় করার দায়িত্ব হবে তার নিজের। তৃতিয় মতটি হচ্ছে, এতীমের অর্থ সম্পদ যদি কোনো ব্যবসায়ে খাটানো হয় এবং তার থেকে লাভ আসতে থাকে, তাহলে অভিভাবক তার যাকাত আদায় করতে পারে, অন্যথায় করতে পারেনা। চতুর্থ মত হচ্ছে, এতীমের অর্থ সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব এবং তা আদায় করার দায়িত্ব হচ্ছে তার অভিভাবকের। আমাদের মতে এই চতুর্থ মতটিই অধিক নির্ভুল। হাদীসে উক্ত হয়েছে ঃ

সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোনো এতীমের অভিভাবক, যে অর্থ সম্পদের অধিকারি, তার উচিত তার অর্থ সম্পদ কোনো ব্যবসায়ে খাটানো এবং সেগুলো এমনভাবে ফেলে রাখা উচিত নয় যার ফলে তা সম্পূর্ণরূপে যাকাতের উদরে প্রবেশ করে।" (তিরমিযী, দারা কুতনী, বায়হাকী, কিতাবুল আমওয়াল লিআবি উবাইদ)।

---

১. যে হাদীসের সনদের সর্বশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবীদের নাম বাদ পড়ছে এবং তাবেয়ী নিজেই রসূলুল্লাহ সা.-এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। (অনুবাদক)

২. যে হাদীসের সনদ রসূলুল্লাহ সা. পর্যন্ত পৌছেছে যা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীস বলে সাব্যস্থ হয়েছে, তাকে মারফু হাদীস বলা হয়। (অনুবাদক)

ইমাম শাফেয়ী এরই সমার্থক একটি মুরসাল[১] হাদীস এবং তাবারানী ও আবু উবাইদ একটি মারফু[২] হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বিভিন্ন কথা ও কর্ম একথাটিরই সমর্থক। হযরত উমর রা., হযরত আয়েশা রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., হযরত আলী রা., হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. এবং মুজাহিদ, আতা, হাসান, ইবেন ইয়াজিদ, মালিক ইবনে আনাস ও যুহ্‌রী প্রমুখ তাবেয়ীগণের নিকট থেকে একথা উদ্ধৃত হয়েছে।

বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকদের ব্যাপারেও উপরোল্লিখিত চার ধরনের মতবিরোধ আছে। এ ক্ষেত্রেও আমাদের নিকট নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য মত হলো, পাগলের অর্থ সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব এবং এটি আদায় করার দায়িত্বও তার অভিভাবকের উপর বর্তায়। ইমাম মালিক ও ইবনে শিহাব যুহ্‌রী এই মতই প্রদান করেছেন।

কয়েদীর উাপরেও যাকাত ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তার অবর্তমানে তার ব্যবসায় বা অর্থ সম্পদের অভিভাবক হবে, সে তার পক্ষ থেকে অন্যান্য অপরিহার্য কার্য সম্পাদন করার ন্যায় যাকাতটিও আদায় করবে। ইবনে কুদামা এ সম্পর্কে তাঁর কিতাব 'আল মুগনীতে লিখেছেন ঃ

'অর্থ সম্পদের অধিকারী যদি কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে তার উপর থেকে যাকাত রহিত হবেনা। কারাবাস ও তার অর্থ সম্পদের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করলে বা না করলেও এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য সুচিত হবেনা, কারণ আইনত সে নিজের অর্থ সম্পদ ব্যবহারের অধিকারী। আর বেচা-কেনা, দান ইখতিয়ারনামা সবকিছুই আইনত বৈধ।' (দ্বিতীয় খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা)

মুসাফিরের উপরও যাকাত ওয়াজিব। এতে সন্দেহ নেই যে, মুসাফির হিসেবে সে নিজেও যাকাত গ্রহণের অধিকারী। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, 'সাহেবে নেসাব' (যে পরিমাণ অর্থ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হয়, সে পরিমাণ অর্থের অধিকারী) হওয়া সত্ত্বেও তার উপর থেকে যাকাত রহিত হবে। সফর তাকে যাকাত গ্রহণের হকদার করে এবং বিত্তশালীতা তার উপর যাকাত ফরয করে।

এদেশের মুসলমান অধিবাসী যদি বিদেশে অবস্থান করে এবং দেশে তার সম্পত্তি বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ নেসাব পরিমাণ মজুদ থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্য কোনো মুসলমান দেশের মুসলমান নাগরিক যদি এদেশে অবস্থান করে এবং

এখানে তার নিকট নেসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তাহলে তার নিকট থেকেও যাকাত আদায় করা হবে। কিন্তু যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান এদেশে অবস্থান করে, তাহলে তাকে যাকাত দিতে বাধ্য করা যেতে পারেনা। তবে সে স্বেচ্ছায় দিতে চাইলে দিতে পারে। কারণ তার আইনগত মর্যাদা রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাদের থেকে ভিন্নতর নয়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِنْ وَّلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْئٍ

"যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিযরত করেনি তাদের সাথে তোমাদের অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই।" (আনফাল ঃ ৭২)

৩. যাকাত আদায়ের অপরিহার্যতার জন্যে কোনো বয়সের শর্ত নেই। কোনো এতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার তরফ থেকে তার অভিভাবকের যাকাত পরিশোধ করে দিতে হবে। আর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর যখন সে নিজই নিজের অর্থ সম্পদ ব্যবহারের যোগ্য হবে, তখন নিজের যাকাত আদায় করার দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তাবে।

৪. অলংকারাদির যাকাতের ব্যাপারে একাধিক মত আছে। একটি মত হলো, অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অলংকারাদি অন্যকে ধার দেয়াই তার যাকাতের সমপর্যায়ভুক্ত। এটি হচ্ছে হযরত আনাস ইবনে মালিক রা., সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, কাতাদা ও শাবীর মত। দ্বিতীয় মত হলো, সারা জীবনে একবার যাকাত দেয়াই অলংকারাদির জন্যে যথেষ্ট। তৃতীয় মত হচ্ছে, যে অলংকারাদি মেয়েরা হামেশা পরিধান করে থাকে, তার উপর যাকাত নেই। এবং যেগুলো অধিকাংশ সময় উঠিয়ে রাখা হয় সেগুলোর উপরে যাকাত ওয়াজিব। চতুর্থ মত হচ্ছে সব রকমের অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। আমরা এই শেষোক্ত মতটিকেই নির্ভুল মনে করি। প্রথমত, যেসব হাদীসে অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর শব্দ ব্যাপক। যেমনঃ 'রূপার মধ্যে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত এবং পাচ উকিয়া থেকে কম হলে তার উপর যাকাত নেই।

আবার বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবাগণের কথা কর্মেও একথা পরিস্ফুট হয়েছে যে, অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী শক্তিশালী সনদের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহর সা. খেদমতে হাযির হলেন। তার সাথে তার এক মেয়ে ছিলো। মেয়েটির হাতে সোনার কংকন ছিলো।

রসূলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এর যাকাত দিয়ে থাকো? মহিলা নেতিবাচক জবাব দিলেন। রসূলুল্লাহ সা. বললেন ঃ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর বদলে আগুনের কংকন পরিধান করাবেন, এটাই কি তুমি পছন্দ করো?"

উপরোক্ত মুয়াত্তা, আবু দাউদ ও দারা কুতনীতে রসুলুল্লাহ সা.-এর এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, যে অলংকারের যাকাত তুমি আদায় করে দিয়েছ, তা আর খনিজ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত থাকেনি। ইবনে হাজাম মুহাল্লায় বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর রা. তাঁর গভর্ণর হযরত আবু মুসা আশয়ারীকে রা. যে ফরমান পাঠান তাতে নির্দেশ দেন ঃ মুসলমান মহিলাদের তাদের অলংকারাদির যাকাত দেবার হুকুম দাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট অলংকারাদির যাকাত সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন ঃ 'তা দু'শো দিরহাম পর্যায়ে পৌছে গেলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়।' এই বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল উক্তি করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. ও হযরত আয়েশা রা. প্রমুখ সাহাবাগণ। সাঈদ ইবনে মুসাইয়ের, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা, মুজাহিদ, ইবনে সিরিন ও যুহ্‌রী প্রমুখ তাবেয়ীগণ এবং সুফিয়ান ছাওরী, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ প্রমুখ ফিকাহশাস্ত্রের ইমামগণ।

৫. কোম্পানী সম্পর্কে আমাদের মত হলো, যে অংশীদারের অংশ নেসাবের চাইতে কম অথবা যে ব্যক্তি এক বছরের কম সময়ের জন্যে নিজের অংশের মালিক ছিলো, তাদেরকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল অংশীদারের যাকাত এক সংগে কোম্পানী থেকে আদায় করা উচিত। এর ফলে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বিষয়টি সহজ হয় এবং এ পদ্ধতির মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই, যা শরীয়তের নীতিগুলোর মধ্য থেকে কোনোটির পরিপন্থী হতে পারে। আমাদের এ মত ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং অন্যান্য একাধিক ফকীহগণের মতের অনুসারী। (বেদায়াতুল মুজতাহিদ ঃ প্রথম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)

৬. কারখানার যন্ত্রপাতির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেবল বছরের শেষভাগে যে কাঁচামাল বা শিল্পদ্রব্য তাদের হাতে থাকবে, তার দাম এবং নগদ অর্থের যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে ব্যাবসায়ীদের আসবাবপত্র, স্টেশনারী দোকান বা গৃহ এবং এই ধরনের অন্যান্য বস্তুর

যাকাত ওয়াজিব হবেনা। কেবল বছরের শেষে তাদের দোকানে যে মালপত্র থাকবে, তার দাম ও তাদের তহবিলে সঞ্চিত নগদ অর্থের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[১] এ ব্যপারে মুলনীতি হলো, কোনো ব্যবসায়ে যে সমস্ত বস্তু ও যন্ত্রপাতিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে - 'ওয়া লাইসা ফিল ইবিলিল আওয়ামিলে সাদাকাহ' অর্থাৎ যেসব উট দিয়ে পানি সেচের কাজ করা হয়, সেগুলোর উপর যাকাত নেই'- (কিতাবুল আমওয়াল)। কারণ তাদের কার্যক্রমের ফলে জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা থেকেই তার যাকাত আদায় করে নেয়া হয়। এর উপর 'কেয়াস' করে ফকীহগণ অন্যান্য যাবতীয় উৎপাদনযন্ত্রকে যাকাতমুক্ত গণ্য করেছেন।

৭. কোম্পানীর যে সমস্ত বিত্রয়যোগ্য শেয়ার বছরের মধ্যভাগে বিক্রী হয়, তার ক্রেতা বা বিক্রেতা কারুর উাপর ঐ বছর যাকাত ওয়াজিব হবেনা। কারণ তাদের দু'জনের কারুর মালিকানা পুরো এক বছর অতিবাহিত হয়নি।

৮. শরীয়তে নিম্নলিখিত বস্তুগুলোর যাকাত ওয়াজিব। ফসল কাটার পর ফসলের উপর, বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নেসাব পরিমাণ বা তার চাইতে অধিক পরিমাণে মজুদ থাকা সোনা ও রূপার উপর, সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত নগদ টাকার উপর, বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নেসাব পরিমাণ গবাদি পশুর উপর, বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নেসাব পরিমাণ মজুদ ব্যবসায় পণ্যের উপর, খনিজ দ্রব্য ও গুপ্তধনের উপর।

ক. টাকা, সোনা, রূপা ও অলংকারাদির উপর যাকাত ওয়াজিব। অলংকারের যাকাতের ক্ষেত্রে কেবল তার মধ্যে মজুদ থাকা সোনা ও রূপার ওজনই ধর্তব্য হবে। মণি মুক্তা বা মূল্যবান পাথর অলংকারের গায়ে বসানো থাক বা পৃথক থাক তার উপর কোনো যাকাত নেই। তবে যদি কেউ মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করে, তাহলে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের ন্যায় তার উপরও অর্থাৎ তার মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 'আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআয়' লিখিত হয়েছে ঃ 'ব্যবসায়ে খাটানো নাহলে মোতি, ইয়াকুত ও অন্যান্য মূল্যবান

---

১. যেসব ব্যবসায় এ ধরনের নয় এবং তাদের যাকাতের হিসাব যদি এভাবে না রাখা যায় (যেমন সংবাদপত্র ব্যবসায়)। তাহলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বার্ষিক আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঐসব ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং তার উপর যাকাত দিতে হবে।

পাথরের উপর যাকাত নেই। এ ব্যাপারে সকল মাযহাব একমত।' (প্রথম খন্ড ৫৯৫ পৃষ্ঠা)

খ. ধাতব মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব। কারণ সেগুলোর মূল্য সৃষ্টিতে ধাতু বা কাগজের কোনো ভূমিকা নেই বরং আইনের সাহায্যে সেগুলোর মধ্যে যে ক্রয় মূল্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার কারণেই সেগুলোর দাম এবং এ জন্যে সেগুলো সোনা ও রূপার স্থলাভিষিক্ত এবং সেগুলোকে নিঃসংকোচে সোনা রূপার দ্বারা বিনিময় করা যেতে পারে। এ জন্যে ইমাম আবু হানীফা র., মালিক র. ও শাফেয়ী র. এই তিনজন শ্রেষ্ঠ ইমামের মাযহাব হচ্ছে এইযে, এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব। (উক্ত গ্রন্থ প্রথম খন্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা)

গ. ব্যাংকে সঞ্চিত আমানতের উপর যাকাত ওয়াজিব। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি রেজিস্টার্ড হয়ে থাকে এবং সরকার তাদের হিসাবপত্র যাচাই করতে পারে, তাহলে সেখানে রক্ষিত আমানতও ব্যাংকের সমপর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি সেগুলো রেজিস্টার্ড না হয়ে থাকে এবং তাদের হিসাবপত্র যাচাই করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে রক্ষিত আমানত গুপ্তধনের পর্যায়ভুক্ত হবে অর্থাৎ সেগুলোর যাকাত আদায় করার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়না। তাদের মালিকরা নিজেরাই সেগুলোর যাকাত আদায় করবে।

ঋণ যদি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত হয়ে থাকে এবং তা খরচও হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। আর যদি ঋণ গ্রহীতা পুরো এক বছর ঋণ নিয়ে রাখে এবং নেসাব পরিমাণ হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর ব্যবসায়ে খাটানো হলে তা ঋণ গ্রহীতার ব্যবসায়ী পুঁজিরূপে গণ্য হবে এবং ব্যবসা সংক্রান্ত যাকাত আদায় করার সময় তার এই ঋণকে বাদ দেয়া হবেনা।

প্রদত্ত ঋণ যদি সহজে ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কোনো কোনো ফকীহর মতে বছরে বছরে এ অর্থের যাকাত আদায় করতে হবে। এটি হচ্ছে হযরত উসমান রা., ইবনে উমর রা., জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা., তাউস, ইবরাহীম নাখয়ী ও হাসান বসরীর মত। আবার অনেকের মতে ঐ ঋণ আদায় হবার পর বিগত সমস্ত বছরের যাকাত এক সাথে আদায় করতে হবে। এটি হচ্ছে হযরত আলী রা., আবু সওর, সুফিয়ান ছাওরী ও হানাফী ঈমামগণের মত। আর যদি এ ঋণ ফেরত পাওয়া সন্দেহযুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ অর্থ যখন ফেরত পাওয়া যাবে কেবল

তখনই তার মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে, এ মতটিই আমাদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। এটি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয, হাসান, লাইস, আওযায়ী ও ইমাম মালিকের মত। এতে ধনের মালিক ও বায়তুলমাল উভয়ের সাথে সুবিচার করা হয়।

বন্ধকী সম্পত্তি যার আওতাধীন থাকবে তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে। যেমন বন্ধকি যমিন যদি মহাজনের আওতাধীনে থাকে, তাহলে মহাজনের নিকট থেকেই তার উশর আদায় করা হবে।

বিবাদকালে বিবাদমূলক সম্পত্তি যে ব্যক্তির আওতাধীনে থাকে, তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে। আর মিমাংসা হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তির সপক্ষে মিমাংসা হবে যাকাত দানের দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে।

নালিশকৃত সম্পত্তির যাকাতের ব্যাপারটিও একইরূপ। এ সম্পত্তি কার্যত যতোদিন যার আওতাধীন থাকে, ততোদিন তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কারণ যে ব্যক্তি যে বস্তু থেকে ফায়দা হাসিল করবে তার যাবতীয় দায় তাকেই পরিশোধ করতে হবে।

ঘ. উপহার, উপঢৌকন ও পুরস্কার যদি নেসাব পরিমাণ পয়, তাহলে বছর অতিক্রান্ত হবার পর যে ব্যক্তিকে তা দান করা হয়েছিল তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে।

ঙ. বীমা ও প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তা যখন ফেরত পাওয়া যাবে কেবল তখন তার মাত্র এক বছরের যাকাত পরিশোধ করতে হবে। আর যদি তা স্বেচ্ছাধীন হয়, তাহলে আমাদের মতে প্রতি বছরের শেষে কোনো ব্যক্তির নামে বীমা কোম্পানীতে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকা জমা হয়, তার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ যদিও সে এ টাকা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে লাভ করতে সক্ষম নয়, তবুও যেহেতু সে নিজের অর্থকে স্বেচ্ছায় এ অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে তাই তার যাকাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

চ. দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের (ডেয়ারী ফার্ম) গবাদি পশু পণ্য উৎপাদকের পর্যায়ভুক্ত। তাই এগুলোর উপর যাকাত নেই। তবে ডেয়ারী ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর অন্যান্য কারখানার উৎপান্ন দ্রব্যের ন্যায় যাকাত নির্ধারিত হবে। কৃষি দ্রব্যের মধ্যে যেগুলো গুদামজাত করার যোগ্য, সেগুলোর উপর উশর অথবা উশরের অর্ধাংশ ওয়াজিব। শুকনা ফল, খোরমা প্রভৃতি যেসমস্ত ফল গুদামজাত করা যায়, সেগুলোর উপরও অনুরূপ যাকাত ওয়াজিব। যেসব জমিতে বৃষ্টির পানিতে ফসল উৎপন্ন

হয়, সেগুলোর উপর উশর ওয়াজিব এবং যেসব জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করা হয় সেগুলোর ফসলের উপর উশরের অর্ধাংশ ওয়াজিব। শাক সব্জি, তরিতরকারি, ফুল, ফল প্রভৃতি যেগুলো গুদামজাত করা যায়না, সেগুলোর উপর অবশ্যি উশর ওয়াজিব নয়, কিন্তু কৃষক যদি সেগুলো বাজারে বিক্রি করে, তাহলে তার মূল্য নেসাব পরিমাণ পৌঁছলে তার উপর ব্যবসায়ী যাকাত ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ে যে নেসাব নির্ভরযোগ্য, সেই নেসাবই নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ ঐ ব্যবসায়ে নিয়োগকৃত পূঁজি বছরের শুরুতে ও শেষে দু'শো দিরহাম বা তার চাইতে অধিক হতে হবে।

ছ. খনিজ দ্রব্যের ব্যাপারে আমাদের মতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতই সর্বোত্তম। অর্থাৎ ধাতব, তরল (যেমন পেট্রোল, পারদ প্রভৃতি) বা ধন (যেমন গন্ধক, কয়লা প্রভৃতি) যে কোনো প্রকারের বস্তু জমি থেকে বের হয় তার মূল্য যদি নেসাব পরিমাণে পৌঁছে এবং তা যদি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়, তাহলে তার উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ওয়াজিব। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের র. শাসনামলে এ মতই ছিলো (ইবনে কুদামার আলমুগনী ঃ দ্বিতীয় খন্ড ৫৮১ পৃষ্ঠা)

জ. লব্ধ গুপ্তধনের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'ওয়া ফির রিকাযিল খুমস' অর্থাৎ গুপ্তধন থেকে এক পঞ্চমাংশ (শতকরা ২০ ভাগ) যাকাত আদায় করা হবে।

ঝ. প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নিজের ঘরে যে সমস্ত মূল্যবান বস্তু রেখে যায় সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সেগুলো রাখা হয, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

ঞ. মধুর একটি পরিমাণ যাকাত হিসেবে গৃহীত হবে অথবা অন্যান্য ব্যবসায়ী পণ্যের উপর যেমন যাকাত নির্ধারিত হয় মধু ব্যবসায়ের উপরও তেমনি যাকাত নির্ধারিত হবে, এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। হানাফীদের মতে, মধুর পরিমাণ যাকাত হিসেবে গৃহীত হবে। ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস এই মতের প্রবক্তা। ইমাম শাফেয়ীর একটি বাণীতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইমাম মালিক ও সুফিয়ান ছাওরী বলেন, 'মধুর পরিমাণের উপর যাকাত নেই।' এটিই ইমাম শাফেয়ীর মশহুর মত বলে পরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন ঃ 'মধুর যাকাতের ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই।' আমাদের মতে মধুর ব্যবসায়ের উপর যাকাত নির্ধারণ করাই উত্তম।

ট. মাছের পরিমাণের উপর যাকাত নেই বরং অন্যান্য ব্যবসায় পণ্যের ন্যায় মাছের ব্যবসায়ের উপর যাকাত ওয়াজিব।

মণি মুক্তা এবং অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু সমুদ্র থেকে উত্তোলিত হয় আমাদের মতে সেগুলোর ব্যাপারে খনিজ দ্রব্যের পথ অনুসৃত হওয়া উচিত। এটি ইমাম মালিকের মত এবং হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে এটিকেই কার্যকরী করা হয়েছিল। (কিতাবুল আমওয়াল ঃ ৩৪৯, কিতাবুল মুগনী লিইবনে কুদামা দ্বিতীয় খন্ড ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

ঠ. পেট্রোলের বিষয়টি খনিজ দ্রব্য প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে।

ড. রফতানির উপর কোনো যাকাত নেই। আমদানির উপর হযরত উমরের রা. আমলে যে কর আদায় করা হতো, তা যাকাতের পর্যায়ভুক্ত ছিলোনা। বরং তা ছিলো নিছক প্রতিবেশী দেশসমূহ ইসলামী রাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর নিজেদের দেশে যে কর আদায় করতো কেবল তার বিরুদ্ধে জবাবি ব্যবস্থা।

৯. খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রসূলুল্লাহর সা. আমলের যাকাতের দ্রব্যসমূহের তালিকায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি। বরং সেখানে যাকাতের দ্রব্যাদির তালিকায় এমন কতিপয় বস্তুর নাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল যেগুলোকে রসূলুল্লাহর সা. নির্ধারিত যাকাতের দ্রব্যাদির উপর 'কিয়াস' করা যেতে পারে। যেমন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয মহিষকে গরুর উপর 'কিয়াস' করেন এবং গরুর উপর রসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত তার উপরও নির্ধারিত করেন।

১০. সব রকমের মুদ্রার উপর যাকাত ওয়াজিব। উপরে অস্টম নম্বরের খ দফায় এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যেসব মুদ্রার প্রচলন নেই বা যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে অথবা যেগুলো সরকার ফেরত নিয়েছে, সেগুলোতে যদি সোনা রূপা থাকে, তাহলে সেগুলোর মধ্যে যে পরিমাণ সোনা বা রূপা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলোর উপর যাকাত নির্ধারিত হবে।

অন্য দেশের মুদ্রা যদি আমাদের দেশের মুদ্রার সাথে সহজে বিনিময় করা সম্ভব হয়, তাহলে তা নগদ অর্থের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি বিনিময় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যখন তার মধ্যে নেসাব পরিমাণ সোনা ও রূপা মজুদ থাকবে কেবল মাত্র তখনই তার উপর যাকাত নির্ধারিত হবে।

১১. সরকারী কর্মচারিরা যে সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নির্ধারণ করতে পারে, তাকে বলা হয় প্রকাশ্য সম্পদ এবং সরকারি কর্মচারিদের পক্ষে যে

সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়না, তা হচ্ছে গোপন সম্পদ। ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ প্রকাশ্য সম্পদের পর্যায়ভুক্ত।

১২. যে সম্পদ প্রকৃতিগতভাবে বৃদ্ধি লাভের যোগ্যতা রাখে অথবা প্রচেষ্টা ও কর্মের দ্বারা যাকে বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তা বর্ধনশীল সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এই সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব সম্পদ বর্ধনশীল কেবল তাদের উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সঞ্চিত অর্থের মালিক যেহেতু তার বৃদ্ধি রোধ করেছে তাই তার উপর যাকাত নির্ধারিত হয়েছে।

১৩. যেসমস্ত বস্তু ভাড়ায় খাটানো হয় নিয়মানুসারে তাদের লাভ থেকে তাদের অর্থ নির্ধারিত করা হবে এবং তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত গৃহীত হবে। লাইস ইবনে সাআদ বলেন, 'যেসমস্ত উট ভাড়ায় খাটানো হতো আমি মদীনায় তাদের থেকে যাকাত নিতে দেখেছি। (কিতাবুল আমওয়াল ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

১৪. গবাদি পশু (উট, গরু, মহিষ, ছাগল এবং এগুলোর সমপর্যায়ভক্ত পশু) যদি বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালন করা হয় এবং তাদের সংখ্যা নেসাব পরিমাণ বা তার চাইতে বেশী হয়, তাহলে শরীয়ত গবাদি পশুর জন্যে যে যাকাত নির্ধারণ করেছে (এর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্যে পড় ন মওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সীরাতুন নবী, পঞ্চম খন্ড ১৫৬-১৬৭ পৃষ্ঠা), তার উপর ঐ একই পরিমাণ যাকাত নির্ধারিত হবে। আর যদি সেগুলো ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর ব্যবসায়ের যাকাত নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ যদি তাদের মূল্য নেসাব পরিমাণ (দুশো দিরহাম) বা তার চাইতে বেশি হয়, তাহলে তা থেকে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত গৃহীত হবে। আর যদি তাদেরকে কৃষি বা যানবাহনের কাজে লাগানো হয় বা কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্যে তাদেরকে পালন করে, তাহলে সংখ্যা যতো বেশি হোকনা কেন, তাদের উপর কোনো যাকাত নেই।

যদি সখ করে মুরগী ও অন্যান্য পশু পালন করা হয়, তাহলে তার উপর যাকাত নেই। আর যদি সেগুলো ব্যবাসায়ের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, তাহলে তার উপর ব্যবসায়ের অনুরূপ যাকাত নির্ধারিত হবে। আর যদি ডিম বিক্রি করার জন্যে মুরগী প্রতিপালন কেন্দ্র (পোলট্রি ফার্ম) কায়েম করা হয়, তাহলে তা পূর্বোক্ত ডেয়ারি ফার্ম ও অন্যান্য কারখানার পর্যায়ভুক্ত হবে।

গবাদি পশুর যাকাত বাবদ নগদ টাকা নেয়া যেতে পারে এবং গবাদি পশুও নেয়া যেতে পারে। হযরত আলী রা. এ ফতওয়া দিয়েছেন। (কিতাবুল আমওয়াল, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)

১৫. যে সমস্ত বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব তাদের হার নিম্নরূপ ঃ

কৃষি উৎপাদন	ঃ বৃষ্টির পানিতে চাষাবাদ হলে শতকরা ১০ ভাগ এবং কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে হলে শতকরা ৫ ভাগ।
নগদ টাকা ও সোনা রূপা	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।
ব্যবসায়ী পণ্য	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।
গবাদি পশু	ঃ ফিকহের কিতাব দেখে নিন।
খনিজ দ্রব্য	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।
গুপ্তধন	ঃ শতকরা ২০ ভাগ।
কারখানার দ্রব্যাদি	ঃ শতকরা আড়াই ভাগ।

১৬. খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে রসূলুল্লাহর সা. নির্ধারিত নেসাব ও যাকাতের হারের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। বর্তমানে এর কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয়না। আমাদের মতে রসূলুল্লাহর সা. পর তাঁর নির্ধারিত হার পরিবর্তন করার অধিকার কারুর নেই।

১৭. নগদ অর্থ, রূপা, ব্যবসায়ী পণ্য, খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কারখানার দ্রব্যাদির নেসাব হচ্ছে দুশো দিরহাম। মাওলানা আবদুল হাই ফিরিংগী মহলের অনুসন্ধান মতে দুশো দিরহামের রূপা আমাদের দেশের প্রচলিত ওজনের হিসাব অনুযায়ী ৩৬ তোলা ৫ মাশা ৪ রতি হয়। কিন্তু সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ওজন।

মাওলানা আবদুল হাই সাহেবের অনুসন্ধান অনুযায়ী ২০ স্বর্ণ খচিত মিসকাল ৫ তোলা ২ মাশা ৪ রতি সোনার সমান। তবে সাড়ে ৭ তোলা সোনাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ওজন।

আবু উবাইদ লিখিত কিতাবুল আমওয়ালে যে হিসাব দেখানো হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে ১০ দিরহামের ওজন হয় ৮২$\frac{৩}{১০}$ বার্লি যা ৭ স্বর্ণখচিত মিসকালের সমান।

১৮. এর জবাব ১৬ নম্বরে দেয়া হয়েছে। তবে সোনার নেসাব পরিবর্তন সম্ভব। কারণ ২০ মিসকালের কথা যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

১৯. খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কৃষি উৎপাদন ছাড়া বাকি যাবতীয় দ্রব্যের

যাকাতের জন্য শর্ত হলো, তার নেসাব পরিমাণ বা তার চাইতে অধিক পরিমাণ দ্রব্যের উপর একটি বছর অতিবাহিত হতে হবে। খনিজ দ্রব্য ও গুপ্তধনের এক বছর অতিবাহিত হবার শর্ত নেই। অন্যদিকে ফসল কাটার সাথে সাথেই কৃষি উৎপাদনের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায়। বছরে দু'বার বা তার চাইতে অধিকবার ফসল হলেও প্রতিবারেই ফসল কাটার পর যাকাত দিতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "আতু হাক্কাহু ইয়াওমা হিসাদিহ"। "ফসল কাটার দিনই তার হক আদায় করে দাও।"

২০. এর জবাব ১৯ নম্বরে দেয়া হয়েছে।

২১. যেহেতু আজকাল যাবতীয় ব্যাপারে এবং হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে সৌর বছর ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই যাকাতের ব্যাপারেও সৌর বছর ব্যবহারে ক্ষতি নেই। চান্দ্র বছরের হিসাবে যাকাত দান করা ওয়াজিব হবার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। যাকাত আদায় করার জন্যে কোনো বিশেষ মাস নির্ধারণ করা হয়নি। সরকার যে তারিখ থেকে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থা করবে, সে তারিখ থেকেই বর্ষ শুরু করা যেতে পারে।

২২ ও ২৩. কুরআন মজীদে যাকাতের ৮টি ব্যয়ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ঃ গরীব, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারীবৃন্দ, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি, গোলাম মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে ও মুসাফির।

গরীব অর্থ হচ্ছে, নিজের জীবন ধারণের জন্যে যে ব্যক্তি অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। এ শব্দটি সকল প্রকার অভাবির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বার্ধক্য বা অংগ প্রত্যংগের কোনো প্রকার ত্রুটির কারণে যারা স্থায়ীভাবে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় অথবা কোনো সাময়িক কারণে আপাতত সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং কিছুটা সাহায্য লাভ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এমন প্রত্যেকটি লোক এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন এতীম ছেলেমেয়ে, বিধবা মহিলা, বেকার ও উপার্জনক্ষম এবং কোনো সাময়িক দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিবর্গ।

মিসকীন শব্দের ব্যাখ্যা হাদীসে এভাবে দেয়া হয়েছ ঃ

"যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সামগ্রী লাভ করেনা, মানুষ তাকে সাহায্য করে বলে বুঝা যায়না এবং মানুষের সামনে হাতও পাতেনা।" এ প্রেক্ষিতে মিসকীন এমন এক ভদ্র ও শরীফ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের রুজী রোজগারের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু নিজের প্রয়োজন পরিমাণ রুজী আহরণে সক্ষম হয়না। তাকে উপার্জনরত দেখে লোকেরা তাকে সাহায্য করেনা। অন্যদিকে নিজের

শরাফতের কারণে সে কারও কাছে হাতও পাততে পারেনা।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারি বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা যাকাত উসুল, বন্টন ও তার হিসাব নিকাশে রতো থাকে। তারা নেসাবের মালিক হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তারা যাকাতের অর্থ থেকে তাদের পারিশ্রমিক লাভ করবে।

দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি হচ্ছে তারা, যাদেরকে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরোধিতা থেকে বিরত বাখা অথবা এই স্বার্থের খেদমতে নিয়োজিত করারই উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্যে অর্থ দিয়ে তাদের মনোতুষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। এরা কাফিরও হতে পারে আবার এমন মুসলমানও হতে পারে যাদের ইসলাম তাদেরকে ইসলামী স্বার্থের খেদমতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট হয়না। উপরন্তু এরা ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দাও হতে পারে আবার অন্য কোনো দেশের বাসিন্দাও হতে পারে। এ ধরনের লোকেরা নেসাবের মালিক হলেও ইসলামী রাষ্ট্রে প্রয়োজন বোধ করলে তাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। আমরা এ ব্যাপারে একমত নই যে, দুর্বলচিত্ত (মুয়াল্লেফাতুল কুলুব) ব্যক্তিদের অংশ চিরতরে মুলতবী হয়ে গেছে। হযরত উমর রা. এ ব্যাপারে যে মত পোষণ করেছিলেন, তা কেবল তার নিজের যামানার জন্যে ছিলো, পরবর্তী সকল যামানার জন্যে তিনি এ মত পোষণ করেননি।

গোলাম মুক্তির অর্থ, গোলামকে মুক্ত করার জন্যে যাকাত দেয়া। যদি কোনো যুগে গোলাম না থাকে, তাহলে তখন এ খাতটি মুলতবী থাকবে।

ঋণগ্রস্থ বলতে এমনসব ঋণীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা নিজেদের সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করে দেবার পর তাদের নিকট নেসাব পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট থাকেনা। তারা উপার্জনকারি হতে পারে আবার বেরোজগারও হতে পারে।

আল্লাহর পথে মানে আল্লাহর পথে জিহাদ। এ জিহাদ হচ্ছে তরবারি, কলম, কথা বা হাত পা-এর সাহায্যে আল্লাহর পথে শ্রম ও প্রচেষ্টা চালানো। পূর্ববর্তী আলেমগণের একজনও একে জনসেবার অর্থে ব্যবহার করেননি। তারা সবাই এর অর্থকে আল্লাহর দীন কায়েম করার, তার প্রচার-প্রসার ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

মুসাফির তার স্বদেশে ধনীও হতে পারে কিন্তু সফর অবস্থায় যদি সে সাহায্য লাভের মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে যাকাতের অর্থ থেকে সাহায্য করা যেতে পারে।

২৪. যাকাতের অর্থ কুরআন নির্ধারিত প্রত্যেকটি ব্যয়ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ব্যয় করা অপরিহার্য নয়। সরকার প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ব্যয় করা সংগত মনে করবে ব্যয় করতে পারবে। এমনকি প্রয়োজন দেখা দিলে একই খাতে সমস্ত অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

২৫. যাকাতের হকদারদের মধ্য থেকে গরীব ও মিসকীনরা যদি নেসাবের মালিক না হয়, তাহলে তারা যাকাত নিতে পারে। যাকাত বিভাগে কর্মরত কর্মচারী ও 'মুয়াল্লেফাতুল কুলুব'গণকে নেসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও যাকাত দেয়া যেতে পারে। গোলাম নিছক গোলাম হওয়ার কারণেই তার মুক্তির জন্যে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যদি তার সমস্ত ঋণ আদায় করার পর নেসাবের মালিক না থাকে, তাহলে যাকাত নিতে পারে। আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা যদি নেসাবের মালিক হয়, তাহলেও যাকাতের খাত থেকে অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে। মুসাফির সফর অবস্থায় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলেই কেবল যাকাত গ্রহণ করতে পারে।

বনী হাশিমদের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা হারাম। কিন্তু বর্তমানে এদেশে কে বনী হাশিম আর কে বনী হাশিম নয় এ পার্থক্য করা বেশ কঠিন ব্যাপার। কাজেই সরকার প্রত্যেক অভাবিকেই যাকাত দেবে। কিন্তু গ্রহীতা নিজের বনী হাশিম হওয়া সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে যাকাত গ্রহণ না করা হবে তার নিজর কর্তব্য।

২৬. রাষ্ট্রের ধনাগারে যাকাত সংগ্রহীত হবার পর রাষ্ট্র তা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দান করতে পারে এবং রাষ্ট্র নিজেও সেই অর্থে যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও কায়েম করতে পারে।

২৭. যারা স্থায়ী বা সাময়িকভাবে যাকাতের মুখাপেক্ষী, তাদেরকে স্থায়ী বা সাময়িভাবে মাসোহারা দেয়া যেতে পারে।

২৮. 'আল্লাহর পথে' যাকাত দেবার খাতটি 'জনসেবা'র সমার্থক গণ্য করার মতো ব্যাপক নয়।

২৯. যাকাতের অর্থ থেকে 'কর্জে হাসানা' দিতে কোনো বাধা নেই। বরং বর্তমান অবস্থায় অভাবীদেরকে কর্জে হাসানা দেবার জন্যে বায়তুলমালে একটি খাত নির্দিষ্ট করা আমাদের মতে অতি উত্তম কাজ।

৩০. সাধারণ অবস্থায় যে এলাকার যাকাত সেই এলাকার অভাবীদের মধ্যে বন্টন করাই বিধেয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের আমলে একবার রায় শহরের যাকাত কুফায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কিন্তু

তিনি আবার তাকে রায় শহরে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন (কিতাবুল আমওয়াল ঃ ৫৯০ পৃষ্ঠা)। তবে অন্য কোনো এলাকায় যদি যাকাতের অত্যধিক প্রয়োজন থাকে, তাহলে যে এলাকায় যাকাত বন্টন করার পর কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে অথবা যেখানে প্রয়োজনের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম, সেখান থেকে ঐ পূর্বোক্ত স্থানে তা স্থানান্তরিত করা সহানুভূতি প্রকাশার্থে বা তালীফে কুলুবের (দুর্বল হৃদয়কে সবল বা বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার) উদ্দেশ্যে সেখানে যাকাত প্রেরণ করা যেতে পারে। কিন্তু স্বএলাকার অভাবীরা যেনো বঞ্চিত না থেকে যায় এক্ষেত্রে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

এলাকার অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক সার্কেল। জেলা, বিভাগ ও প্রদেশ তিনটিই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দেশের তুলনায় এলাকা বললে প্রদেশ বুঝাবে, প্রদেশের তুলনায় বিভাগ বুঝাবে এবং বিভাগের তুলনায় জেলা বুঝাবে।

৩১. মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে সর্বপ্রথম তার ঋণ আদায় করা হবে, যা সে অন্যের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল। অতপর তার যাকাতের যে অংশ বাকি ছিলো তা আদায় করা হবে। তারপর তার অছিয়ত পূর্ণ করা হবে এবং সর্বশেষে যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে। মালিকের মৃত্যুর কারণে তার সম্পদের যাকাত খতম হয়ে যাবেনা। সে অছিয়ত না করে গেলেও তার সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে। আতা, যুহরী, কাতাদা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মুহাম্মদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ ও আবু সাওর প্রায় এই একই ধরনের মত পোষণ করেন। কোনো কোনো ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তি যদি যাকাত আদায় করার জন্যে অছিয়ত করে গিয়ে থাকে, তাহলে তার সম্পদ থেকে তা আদায় করা হবে, অন্যথায় আদায় করা হবেনা। কিন্তু আমাদের মতে এটি কেবল গুপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে যথার্থ হতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে হতে পারে মালিক তার যাকাত আদায় করে দিয়েছে কিন্তু অন্যরা তার খবর রাখেনা। কিন্তু প্রকাশ্য সম্পদের যাকাত আদায় করার ব্যবস্থা যখন সরকার নিজেই করছে, তখন এর কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই যাকাতের অর্থ ঐ ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ বলে গণ্য হবে। প্রথমে তার সম্পদ থেকে মানুষের ঋণ আদায় করা হবে অতপর আল্লাহ ও জমায়াতের ঋণ।

৩২. যাকাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে বাহানাবাজি করার পথ রোধ করার জন্যে তিনটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

এক. রাষ্ট্র পরিচালনার ভার এমন লোকদের হাতে ন্যস্ত করতে হবে যারা হবে ঈমানদার, যারা উৎকোচ গ্রহণ করবেনা, যারা যাকাত আদায় ও বন্টনের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করবেনা এবং যারা যাকাতের খাতে আদায়কৃত অর্থের বৃহদংশ নিজেদের বেতন এ এলাউন্সে ব্যয় করবেনা। যাকাত আদায়কারীরা যদি বিশ্বস্ত ও ঈমানদার হয়, তাহলে জনগণ তাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে যে, তাদের যাকাত সঠিক পদ্ধতিতে আদায় এবং যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। তখনই যাকাত প্রদান থেকে বাঁচবার জন্যে তারা বাহানাবাজি করার চেষ্টা করবেনা।

দুই. সামাজিক চরিত্রের সংস্কার সাধন করতে হবে। জনগণের চরিত্র ও কর্মজীবনে আল্লাহর মহব্বতও তাঁর ভীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

সরকারের কাজ কেবল দেশের প্রশাসনিক বিষয়াবলী ও দেশরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবেনা বরং জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও তাকে গ্রহণ করতে হবে।

তিন. যাকাত থেকে নিস্কৃতি লাভের সাধারণ ও সম্ভাব্য উপায়সমূহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি তার যে সমস্ত সম্পদের উপর যাকাত নির্ধারিত হতে পারে, সেগুলোর একটি অস্বাভাবিক পরিমাণ বর্ষ শেষের পূর্বে নিজের কোনো আত্মীয়ের নামে লিখে দেয় বা তার নিকট স্থানান্তরিত করে, তাহলে তার উপর মোকাদ্দমা চালাতে হবে এবং যাকাত থেকে বাঁচবার জন্যে যে সে এভাবে সম্পদ স্থানান্তর করেনি এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার ভার তার উপর দিতে হবে।

৩৩. আমাদের মতে যাকাত আদায় ও বন্টন ব্যবস্থা প্রদেশের পরিচালনাধীন থাকা উচিত এবং কেন্দ্রকে এ ব্যাপারে এতোটুকু ক্ষমতা দান করা উচিত যার ফলে সে কোনো প্রদেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত যাকাত এমন প্রদেশে প্রেরণ করতে পারে, যেখানকার যাকাত স্থানীয় স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম নয়। উপরন্তু কেন্দ্রের এ ক্ষমতাও থাকা উচিত যে, যাকাতের টাকা যদি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান কায়েম কারার বা এমন কিছু কাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয়া যা দেশের ভেতরে ও বাইরে 'আল্লাহর পথে' জিহাদ করার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা দেশের বাইরে কোনো অস্বাভাবিক বিপদে সাহায্য পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সে প্রদেশসমূহের নিকট থেকে যেনো তাদের যাকাতের একটি অংশ তলব করতে পারে।

৩৪. আমাদের মতে যাকাত আদায় করার জন্যে কোনো পৃথক বিভাগ কায়েম করার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য যাবতীয় ট্যাক্স আদায় করার জন্যে যে সমস্ত বিভাগ পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলোর মাধ্যমেই এই বিভিন্ন ধরনের যাকাত আদায় করা উচিত। যেমন ফসল ও গবাদি পশুর যাকাত জমির খাজনাদি আদায় সংক্রান্ত বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, ব্যবসায়জাত পণ্যের যাকাত আয়কর বিভাগের মাধ্যমে আদায় করা যেতে পারে, কারখানার যাকাত এক্সাইজ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে এবং এভাবে যাকাতের অন্যান্য বিভাগগুলোকেও সরকারী কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। সরকারী অর্থ দফতরের অধীনে যাকাতের সংরক্ষণ এবং হিসাব একাউন্টেন্ট জেনারেল বিভাগের অধীনে পরিচালিত হতে পারে।

আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী যাকাতকে যদি প্রদেশের কর্তৃত্বাধীন করা হয় এবং যাকাত আদায় সংক্রান্ত কোনো বিভাগের কাজ যদি কোনো কেন্দ্রীয় দফতরের অধীন করা হয় তাহলে একটি পারস্পারিক চুক্তির মাধ্যমে যাকাত আদায় সংক্রান্ত ঐ বিভাগের যাবতীয় ব্যয়ভার প্রদেশের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।

তবে যাকাত বন্টন এবং যাকাতের বিভিন্ন ব্যয়ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জন্যে একটি পৃথক বিভাগ কায়েম করা অপরিহার্য। এ বিভাগটিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানকারী দফতরের অধীনস্থ করা যেতে পারে।

৩৫. একথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা উচিত যে, যাকাত কোনো ট্যাক্স নয় বরং একটি 'আর্থিক ইবাদত'। মৌলিক চিন্তা ও নৈতিক প্রাণশক্তির দিক দিয়ে 'ট্যাক্স' ও 'ইবাদতের' মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান। সরকারি কর্মচারি ও যাকাতদাতাদের মধ্যে যদি 'ইবাদতের পরিবর্তে 'ট্যাক্সের' মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে এর ফলে যাকাত থেকে যে সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করা আসল উদ্দেশ্য, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সামগ্রিক ফায়দাসমূহও বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যাকাত আদায় ও বন্টন করার ভার রাষ্ট্রের হাতে সোর্পদ করার অর্থ এ নয় যে, এটি একটি সরকারী ট্যাক্স। বরং মুসলমানদের সমস্ত সামগ্রিক ইবাদতে শৃংখলা সৃষ্টি করা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এ জন্যেই এ ইবাদতটির ব্যবস্থাপনা সরকারের হাতে সোর্পদ করা হয়েছে। যাকাত আদায় ও বন্টন করার ন্যায় নামায কায়েম ও হজ্জ পরিচালনাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৩৬. হাদীসে মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'মানুষের অর্থ সম্পদে যাকাত ছাড়া অন্যান্য হকও আছে।' এই নীতিগত বিধানের উপস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্র যাকাত ছাড়া অন্য কোনো ট্যাক্স লাগাতে পারে কিনা তেমন কোনো প্রশ্নই সৃষ্টি হতে পারেনা। উপরন্তু কুরআনে যখন যাকাতের জন্যে মাত্র কয়েকটি ব্যয়ক্ষেত্র নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, তখন এ থেকে অনিবার্যভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এই ক'টি মাত্র ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের উপর যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হয় সেগুলো সম্পাদন করার জন্যে সরকার জনগণের উপর অন্যান্য ট্যাক্স লাগাতে পারে। উপরন্তু কুরআনে এই নীতিগত বিধানও দেয়া হয়েছে যে, 'ইয়াসআলুনাকা মাযা ইউনফিকুন, কুলিল আফওয়া'। অর্থাৎ 'তারা তোমার (রসূলুল্লাহর) নিকট জিজ্ঞেস করে, আমরা কি খরচ করবো? তাদেরকে বলো, তোমাদের উদ্বৃত্তাংশ।' 'আফওয়া' বা উদ্বৃত্তাংশ হচ্ছে Economic surplus-এর সমার্থক। এবং এখানে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে যে, 'আফওয়া' হচ্ছে ট্যাক্সের যথার্থ স্থান। উপরন্তু খোলাফায়ে রাশিদীনের আমলে যাকাত ছাড়া অন্যান্য ট্যাক্স লাগনো হয়, এর বহু নযীর আছে। যেমন হযরত উমরের রা. আমলে আমদানিকর নির্ধারিত হয় এবং একে যাকাতের মধ্যে নয় বরং 'ফায়' (রাষ্ট্রের সাধারণ আয়) এর মধ্যে গণ্য করা হয়। এছাড়াও শরীয়তের এমন কোনো নির্দেশ নেই যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে, রাষ্ট্র সামগ্রিক প্রয়োজনের খাতিরে অন্য কোনো ট্যাক্স লাগাতে পারবেনা। বরং এক্ষেত্রে নীতি হচ্ছে এইযে, যে বস্তুকে নিষিদ্ধ করা হয়নি সেটি হচ্ছে মোবাহ। যতোদূর আমরা জানি ফকীহগণের মধ্যেও একমাত্র যিহাক ইবনে মুযাহিম নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ফকীহ ছাড়া একজনও একথা বলেননি যে, 'নাসাখাতিয যাকাতু কুল্লা হাক্কি ফিল মাল।' (যাকাতে অর্থ সম্পদের বাকি সমস্ত হক নাকচ করে দিয়েছে।) যিহাকের এই মতকে কোনো উল্লেখযোগ্য ফকীহই সমর্থন জানাননি। (আলমুহাল্লা লি ইবনে হাযম ঃ দ্বিতীয় খন্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা)

৩৭. ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তহসীলদার নিযুক্ত ছিলেন। তারা প্রকাশ্য ধন সম্পদ যে সমস্ত স্থানে থাকতো, সেখানে গিয়ে নিজেরাই তার যাকাত আদায় করে আনতেন। যাকাত জমা করার জন্যে কোনো পৃথক অর্থ দফতর থাকতোনা বরং রাষ্ট্রের সাধারণ অর্থ দফতরেই তা জমা হতো। তবে এর হিসাব পৃথক থাকতো। রাষ্ট্রের যে সমস্ত কর্মচারী অন্যান্য সরকারি কার্যসমূহ আঞ্জাম দিতেন, তাঁরাই যাকাতও বন্টন করতেন। যাকাত বন্টন করার জন্যে কোনো পৃথক বিভাগ ছিলো বলে আমরা জানিনা। কিন্তু এসকল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

আমরা বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেভাবে সংগত মনে করি বাস্তব কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি।

বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কেউ যাকাত আদায় ও বন্টন করার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে বলে আমরা জানিনা।

৩৮. আমাদের মতে ইসলামী রাষ্ট্রকেই যাকাত আদায় ও বন্টনের কাজ করা উচিত।

৩৯. যাকাত আদায় ও বন্টন কাজে নিযুক্ত কর্মচারিদের বেতন, এলাউন্স, পেনশন ও কাজের শর্তসমূহ অন্যান্য সরকারি কর্মচারিদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত নয়। অবশ্যি সকল সরকারি কর্মচারির বেতনের ব্যাপারে সরকারি কর্মপদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া উচিত। বেতনের ব্যাপারে বর্তমান অসামঞ্জস্য ও বিপুল ব্যবধান অপরিবর্তিত থাকলে যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন সম্ভব হবেনা। (তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৫০)

যাকাতের নেসাব এবং হার কি পরিবর্তন যোগ্য?

প্রশ্ন ঃ যাকাত সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, অবস্থা ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এর হারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ সা. তাঁর নিজের যামানার পরিপ্রেক্ষিতে শতকরা আড়াই ভাগকে সংগত মনে করেছিলেন। বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র চাইলে অবস্থানুযায়ী একে বাড়াতে বা কমাতে পারে। তার যুক্তি হলো, কুরআনে যাকাত সম্পর্কে বহু আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কোথাও এর হারের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যদি বিশেষ কোনো হার অপরিহার্য হতো, তাহলে অবশ্যি তা উল্লেখ করা হতো। বিপরিতপক্ষে আমার দাবি হলো ঃ রসূলুল্লাহর সা. নির্দেশ চিরন্তন, তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের অধিকর আমাদের নেই। তবে তার যুক্তি সম্পর্কে বলা যায়, ভবিষ্যতে তিনি বলবেন যে, নামাযের রাকআতের মধ্যে পরিবর্তন করা দরকার এবং নামায পড়ার পদ্ধতিও বদলানো উচিত, কারণ তার নিকট অবস্থা ও কালের তাগিদটাই বড় কথা। তাহলে তো রসূলুল্লাহর সা. নির্দেশ আর নির্দেশ থাকবেনা বরং খেলার পুতুলে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত আমি বলেছিলাম ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যাধিক প্রয়োজন দেখা দিলে- 'ইন্না ফীল্ মালে হাক্কান সেওয়ায্যাকাত' হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অর্থ আদায় করতে পারে। যাকাতের হার চিরন্তন হবার ব্যাপারে এই হাদীস থেকে পরোক্ষ ইংগিত পাওয়া যায়। যাকাতের হার যদি পরিবর্তিত হতে পারতো, তাহলে এ হাদীসটির প্রয়োজন কি ছিলো? কিন্তু এরপরও তিনি নিজের দাবিতে অটল। মেহেরবানী করে আপনি এ ব্যাপারে আলোকপাত করুন।

জবাব ঃ যাকাতের ব্যাপারে আপনার যুক্তি যথার্থ। রসূলুল্লাহর সা. নির্ধারিত সীমা ও হারের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার অধিকার আমাদের নেই। এ দুয়ারটি একবার উন্মুক্ত হয়ে গেলে কেবল যাকাতের নেসাব ও হারের উপরই আঘাত আসবেনা বরং নামায, রোযা, হজ্জ, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি বহু বিষয়ের পরিবর্তন পরিবর্ধন শুরু হয়ে যাবে। এবং সর্বত্র এর গতি হবে অপ্রতিরোধ্য। উপরন্তু এ দুয়ারটি উন্মুক্ত করার পর আল্লাহ ও তাঁর রসূল সা. ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে যে ভারসাম্য কায়েম করেছেন, তা খতম হয়ে যাবে। অতপর ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে যাবে। ব্যক্তি চাইবে নেসাব ও হারের মধ্যে তার স্বার্থানুকূল্যে পরিবর্তন, অন্যদিকে সমাজও চাইবে তার স্বার্থানুকূল্যে পরিবর্তন। নির্বাচনের সময় এ বিষয়টি একটি সমস্যা পরিগ্রহ করবে। নেসাব কমিয়ে ও হার বাড়িয়ে যদি কোনো আইন প্রণীত হয়, তাহলে এর মাধ্যমে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থহানী হবে তারা ইবাদতের সত্যিকার প্রাণশক্তি অনুযায়ী যথার্থ আন্তরিকতা ও আনন্দ সহকারে তা প্রদান করবেনা বরং ট্যাক্সের ন্যায় জোর জবরদস্তি মনে করেই পরিশোধ করবে এবং টালবাহানা ও পলায়নের পথ খুঁজে বেড়াবে। বর্তমানে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের হুকুম মনে করে শির নত করে পরিশোধ করে এবং ইবাদতের আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে সানন্দে যাকাত দিয়ে দেয় অর্থ সম্পদের উপর যাকাত ধার্য হয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, সমস্ত কারবার থেকে প্রথমত যাকাত বের করতে হবে। তারপর পারস্পারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে মুনাফা বন্টন করতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, রবিউস্‌সানী ১৩৭২ হিজরী, জানুয়ারি ১৯৫৩)

১২

শরীয়ত বিরোধী রসম-রেওয়াজ

পুতুল ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন ঃ চীনা মাটির তাস, রাবারের পাখী এবং মেয়েদের জন্যে পুতুল প্রভৃতি শিশুদের খেলনা সামগ্রী বিক্রয় করা. কি জায়েয? তাছাড়া হিন্দুদের প্রয়োজনে তৈরি পুতুল বিক্রয় করা যেতে পারে কি?

জবাব ঃ শিশুদের খেলনা বিক্রয় করাটা অবৈধ নয়। তবে বিশেষ কোনো খেলনা সামগ্রী শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় হওয়া আলাদা কথা। পশু এবং মানুষের পুতুলের দুটি অবস্থা রয়েছে। এক. নিখুঁতভাবে হুবহু মূর্তি তৈরি করা। দুই. মোটামুটিভাবে কোনো জীবজন্তুর আকৃতি তৈরি করা। যেমন ঃ কাঠের ঘোড়া এবং কাপড়ের পুতুল। প্রথমোক্ত ধরনের মূর্তি পুতুল বিক্রি করা বৈধ নয়। অবশ্য শেষোক্ত ধরনের খেলনা বিক্রি করতে পারেন। হিন্দুদের প্রয়োজনে পুতুল বিক্রি করা সে অবস্থায় হারাম হবে, যদি তা মুশরিকী ধ্যান ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন ঃ শ্রীকৃষ্ণ বা রামের প্রতিমূর্তি প্রভৃতি। (রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খন্ড)।

বিজ্ঞাপনের ছবি

প্রশ্ন ঃ আজকাল বিজ্ঞাপনের ক্যালেন্ডার প্রভৃতিতে নারীদের ছবি ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে। এছাড়া খ্যাতিমান ব্যক্তি এবং জাতীয় নেতাদের ছবিও অনুরূপভাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক জিনিসপত্রের ডিব্বা, বোতল এবং প্যাকেটের উপরও অনুরূপ ছবি ব্যবহার করা হয়। এরূপ বিভিন্ন প্রকার ছবির দাপট থেকে একজন মুসলমান ব্যবসায়ী কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে?

জবাব ঃ আপনি নিজে যদি কোনো বিজ্ঞাপন কিংবা ক্যালেন্ডার ছাপেন তবে তা ছবি মুক্ত রাখবেন। আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি ক্যালেন্ডার প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয় তবে প্রথমত ছবিবিহীন ব্যবহার করবেন, নতুবা ছবি ঢেকে রাখবেন কিংবা মুছে ফেলবেন। কিন্তু ডিব্বা, বোতল এবং প্যাকেটের

ছবি তো সব আর আপনি মুছে ফেলতে পারবেননা। বর্তমান ছবিপূজারী বিশ্ব তো কোনো জিনিসকে ছবি মুক্ত না রাখার ব্যাপারে কসম খেয়ে বসেছে। ডাক টিকেট এবং মুদ্রার উপর পর্যন্ত ছবি ব্যবহার করা হয়। এ সর্বগ্রাসী তাগুতী জীবন ব্যবস্থা নিজের অপবিত্রতা ও নোংরামীকে শিকড় থেকে শাখা প্রশাখা এমনকি পত্রপল্লব পর্যন্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাস, নিজের সাধ্যের সীমা পর্যন্ত নিজে আত্মরক্ষা করুন, যাতে বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিপত্তি খতম হয়ে যায় এবং ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্টিত হয়। বাতিলের জড় কেটে দিলে শাখা প্রশাখার এমনিতেই ভবলীলা সাঙ্গ হবে। (রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খন্ড)।

ঘর, ঘোড়া ও নারীর কুলক্ষণ হওয়া প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ বসবাসের জন্যে আমি একখানা ঘর কিনতে চাই। ঘরটির মৃত মালিক নিঃসন্তান ছিলেন। তার দুর সম্পর্কীয় এক আত্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে ঘরটি পায়। আমি সে ঘরটি কিনতে চাইলে আমার পরিবারের কিছু লোক প্রতিবাদ করে বললো ঃ ঘরটি কুলক্ষণের পরিচায়ক। এ ঘরে বসবাসকারীদের বংশ বাড়েনা এমনকি আসল মালিকের বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে। ঘর, ঘোড়া ও নারীর কুলক্ষণ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটির কথা তারা উল্লেখ করে। আমি হাদীসের কিতাবে এ সম্পর্কিত বর্ণনা দেখেছি এবং প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীতে যা কিছু লেখা আছে তাও পড়েছি, কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বুঝতে পারছিনা। এ প্রসংগে আপনার মতামত কি?

জবাব ঃ আপনি যেসব বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হাদীসের কিতাবসমূহে তো আছে তবে হযরত আয়েশার রা. একটি রেওয়ায়েত থেকে এগুলোর অর্থ অন্যকিছু বলে প্রতীয়মান হয়। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

عن ابی حسان الاعرج ان رجلین دخلا علی عائشة وقالا ان ابا هریرة یحدث ان النبی صلی اللّٰه علیه وسلم کان یقول انما الطیرة فی المرأة والدابة والدار۔ فقالت والذی انزل الفرقان علی ابی القاسم ما هکذا کان یقول ولکن کان یقول کان اهل الجاهلیة یقولون الطیرة فی المرأة والدابة والدار، ثم قرأت عائشة ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتب من قبل ان نبرأها۔

"আবু হাসান আরাজ থেকে বর্ণিত। দু'জন লোক হযরত আয়েশার রা. খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো : 'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নারী, ঘোড়া ও ঘরে কুলক্ষণ আছে।' একথা হযরত আয়েশা রা. বললেন : সে সত্তার শপথ! যিনি আবুল কাসেমের (অর্থাৎ রসূল) উপর কুরআন নাযিল করেছেন, তিনি এরূপ বলতেননা বরং তিনি বলেছেন : জাহিলী যুগে লোকেরা ঘর, ঘোড়া ও নারীর মধ্যে কুলক্ষণ আছে বলে মনে করতো। তারপর হযরত আয়েশা রা. এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

"যমীনেও তোমাদের উপর এমন কোনো মুসীবত আসেনা যা প্রকাশিত হওয়ার আগে ভাগ্যলিপিতে লিখিত হয়না।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর এ ব্যাখ্যায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবু হুরাইরার রা. বর্ণিত হাদীসটি সম্ভবত সঠিক শব্দে প্রকাশ পায়নি। তদুপরি যদি এটাকে সঠিক বলেও মেনে নেয়া যায়, তাহলে এর একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যাও হতে পারে।

কুলক্ষণের এক অর্থ তো সন্দেহপ্রবণতা ও কাল্পনিকতা, যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কুলক্ষণের অন্য একটি তাত্ত্বিক অর্থও আছে। কোনো বস্তুর অসামঞ্জস্যতা ও গরমিল হওয়া এর এক অর্থ। এ অর্থ যুক্তিসংগত এবং শরীয়তসম্মত, সুতরাং হাদীসে ঘর কুলক্ষণ হওয়ার যে বর্ণনা এসেছে তার তাৎপর্য এই নয় যে, ঘরে এমন কোনো সন্দেহযুক্ত বস্তু আছে, যা ঘরবাসীদের ভাগ্য বিগড়িয়ে দিতে পারে। বরং এর তাৎপর্য এমন হতে পারে যে, অভিজ্ঞতার আলোকে এঘর বসবাসের অনুপযোগী বলে প্রমাণিত। অনেক সময় কোনো একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত কতিপয় রোগি একই ঘরে পরপর বসবাস করতে থাকে। তাতে ঐ রোগের বিষময় প্রভাব সেখানে স্বতন্ত্রভাবে জায়গা করে নেয়। এক্ষেত্রে যদি অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তিই সে ঘরে বসবাস করে, সে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে এঘর বাসের অনুপযোগী বুঝতে হবে। বিশেষত প্লেগ ও যক্ষ্মার বেলায় একথা অভিজ্ঞতার আলোকে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব, সেখানে ইচ্ছাপূর্বক না যাওয়া এবং সেখান থেকে পলায়নও করার নির্দেশ হাদীসে রয়েছে। নারী ও ঘোড়া সম্পর্কেও একই কথা। যদি কতিপয় লোকের একটি ঘোড়ার উপর আরোহণ করা অনুপযোগী প্রমাণিত হয় অথবা কতিপয় লোক পর পর একটি মেয়েকে বিয়ে করে বিশেষ রোগের শিকার হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই ঘোড়া অথবা মহিলার মধ্যে অজানা কোনো রোগ বা ত্রুটি আছে।

যে ঘর আপনি চান তার কুলক্ষণ হওয়া কি সন্দেহপ্রবণতার ভিত্তিতে অথবা অভিজ্ঞতাপ্রসূত তা দেখা এখন আপনার কাজ। (তরজমানুল কুরআন, রবিউস্‌সানী ১৩৭২, জানুয়ারি ১৯৫৩, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ২য় খন্ড)।

রসম রেওয়াজের শরীয়ত

প্রশ্ন ঃ কতিপয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এগুলোর শরীয়তসম্মত সমাধান আপনার নিকট থেকে জানতে চাচ্ছি। আশা করি আমার নিশ্চিত হবার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করবেন ঃ

ক. একজন দুস্থ্ মুসলমান তার পুত্র বা কন্যা বিয়ে দিতে চায়। দুস্থ্ হওয়া সত্বেও সে দুনিয়াদারদের মতোই বিয়েতে কিছুটা জাঁক জমকের ব্যবস্থা করে সাময়িক আনন্দ লাভ করতে চায়। এমতাবস্থায় তাকে কিভাবে পথ প্রদর্শন করা যায়?

খ. একজন ঋণগ্রস্ত মুসলমান, যিনি তার সমস্ত সহায় সম্পদ বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধের সামর্থ রাখেননা, তিনি তার পুত্র কন্যাদের বিয়ে দিতে চাইলে দ্বিতীয় পক্ষ থেকে এমনসব শর্ত আরোপিত হয়, যা মিটাতে গেলে অধিক ব্যয় করার প্রশ্ন আসে এমতাবস্থায় তা কর্তব্য কি?

গ. সাধারণত মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বর পক্ষের প্রস্তাবের অপেক্ষা করা হয়। কখনো কখনো অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মেয়েরা কুমারী অবস্থায় যৌবনকাল অতিবাহিত করে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা রাখে। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কি?

ঘ. বর্তমান মুসলিম সমাজের বিয়ে শাদী এবং জন্ম মৃত্যুর অনুষ্ঠানে ছটি, চিল্লা, বাদ্য বাজনা, বাগদান, যৌতুক, কুলখানি, মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনে লোক খাওয়ানো ইত্যাদি যেসব প্রথা পালন করা হয়, এগুলোর শরয়ী মর্যাদা কি?

জবাব ঃ

ক. যে ব্যক্তি নিজেই জানে যে, তার এতোটা খরচ করার সামর্থ নেই, তারপরও সে কেবল লোক দেখানো এবং নিজের ভ্রান্ত খাহেশ মেটানোর উদ্দেশ্যে নিজের সামর্থের বাইরে পা ফেলতে চায়, সে তো জেনে বুঝে নিজেই নিজেকে পাপের গর্তে নিক্ষেপ করতে অগ্রসর হচ্ছে। নিজের ভ্রান্ত খাহেশ মেটানোর জন্যে সে হয়তো সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেবে, কিংবা বন্ধু বান্ধবের পকেট লুট করবে। আর যদি করযে হাসানা পেয়ে যায়, যার আশা নেই, তবে তা আর ফেরত দেবেনা। তাছাড়া এ ব্যাপারে তার দ্বারা যে কতো মিথ্যা ও বেঈমানী সংঘটিত

হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। যে ব্যক্তি নফসের ভ্রান্ত খাহেশ মেটানোর জন্যে জেনে বুঝে এতো বড় গুনাহর বোঝা মাথায় নিতে উদ্যত হয়, তাকে আর কী ই বা বুঝানো যেতে পারে।

খ. এ ব্যক্তির উচিত তার ছেলে মেয়েদেরকে এমন লোকদের সাথে বিয়ে দেয়া, যার ধন সম্পদের দিক দিয়ে তার সমপর্যায়ের এবং যারা তার সংগে তার অবস্থা ও মর্যাদা অনুযায়ী সম্বন্ধ করতে প্রস্তুত। সামর্থের বাইরে পা ফেলা তার নিজের জন্যে উচিত নয় এবং অপরকেও এতে বাধ্য করা উচিত নয়। নিজের অবস্থার চাইতে অধিক সম্পদশালী লোকদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা নিজেই নিজেকে অযথা সমস্যায় জড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

গ. মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে বর পক্ষের প্রস্তাবের অপেক্ষা করা অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অপেক্ষার সীমা অতিক্রম করা কিছুতেই সংগত নয়। কোনো ব্যক্তির কন্যা যদি বয়স্ক ও বিবাহযোগ্য হয় এবং কোনো উপযুক্ত পাত্র তার নযরে পড়ে, তবে নিজের পক্ষ থেকে প্রথমে পয়গাম পাঠানোর মধ্যে কোনো দোষ নেই। এর উদাহরণ স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পাওয়া যায়। এটা যদি সত্যি কোনো অপমানকর ব্যাপার হতো তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করতেন।

ঘ. এগুলো হলো সেইসব ফাঁদ যা লোকেরা নিজেরাই নিজেদের গলায় পরিয়ে নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফাঁদ লেগে এখন তাদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে লোকেরা এগুলো পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। সরাসরি এসব রসম রেওয়াজের বিরোধিতা করলে এগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবেনা। রবঞ্চ এগুলো দূর করার পথ হলো, লোকদের অনবরত কুরআন ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। লোকেরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরীকা মতো চলতে শুরু করে, তবে সমাজ থেকে বড় বড় দুস্কৃতিসমূহ দূর হবে এবং তখন এসব ছোট ছোট খারাবীও আর থাকবেনা।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন থেকে আমি কুমার জীবন অতিবাহিত করছি। আর এ জন্যে দায়ী হলো আমার ইজতিহাদ। আমাদের এ অঞ্চলে এমনসব নিয়ম নীতি ও রসম রেওয়াজ প্রচলিত আছে, ফিকহের চুলচেরা বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে যেগুলোকে 'নাজায়েয' বা 'শরীয়ত বিরোধী' প্রথা বলে আখ্যায়িত করা মুশকিল। যেমন ধরুন, বাগদত্তা বা কনের জন্যে অলংকার বা পোশাক

আশাকের দাবি করা; কিছু পারস্পরিক লেন দেন; এক পক্ষ অপর পক্ষের চাকর ও সেবকদের দান ও বখশীশ হিসেবে দেয়া ও দেয়ানোর ব্যবস্থা করা; আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের ডাকা ও তাদের মেহমানদারী করা ইত্যাদি। এরকম আরো অনেক জিনিস আছে যেগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা হলে সম্ভবত কোনো একটিকেও নাজায়েয বলা যাবেনা। কিন্তু যদি এসব রসম রেওয়াজের এ দিকটার প্রতি নযর দেয়া হয় যে, এগুলো অবশ্যি মেনে চলতে হবে, এগুলো ছাড়া বিয়ে সফলই হতে পারেনা, যে কোনো পর্যায়ের লোকই হোকনা কেন এগুলো ছাড়া দাম্পত্য জীবনের সূচনাই হতে পারেনা। তবে একথা পরিস্কারভাবে বুঝে আসে যে, এসব জিনিস এখন শুধুমাত্র 'মুবাহ্‌র' পর্যায়ে নেই, বরঞ্চ আত্মীয়তার ক্ষেত্রে এগুলো এখন আইনের রূপ নিয়েছে। তাও আবার সাধারণ আইন নয়, বরঞ্চ এমন আইন যে, এর বিরোধীতাকারীকে যেনো অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অতপর আমরা যখন বলি প্রতিটি বাতিল আইনকে ভেংগে দিতে হবে তার শিকড় যেখানেই বিস্তৃত থাকুক না কেন, তখন প্রশ্ন দেখা দেয় এসব জিনিস প্রকৃতই উৎপাটনযোগ্য কিনা? যদি এগুলো উৎপাটনযোগ্যই হয়ে থাকে, যেমন আমি নিজেও এমতই পোষণ করি, তবে এই সত্য কি আপনার নিকট গোপন যে, গোটা ভারতবর্ষের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে এ ধরনের রসম রেওয়াজের শরীয়ত কার্যকর নেই, সেগুলোর খুঁটিনাটি রূপ যাই হোকনা কেন? যেসব উৎসব অনুষ্ঠানকে আজকাল শরয়ী উৎসব অনুষ্ঠান বলা হয়, সেগুলোও কেবল এতোটুকুই শরয়ী আছে যে, সেগুলোতে নাচ গান, বাদ্য, গাঁজা ইত্যাদি অশ্লীলতা হয়না বটে, কিন্তু উপরোক্ত রসম রেওয়াজসমূহ সেগুলোতেও পুর্ণমাত্রায় শিকড় গেড়ে আছে এবং এগুলোকে মুবাহ বলে চালিয়ে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর কি উচিত নয় যে, সে তার সদস্যদেরকে শরীয়ত বিরোধী রসম রেওয়াজের কথা এমন স্পষ্টভাবে বলে দেবে যাতে করে এগুলোর তথাকথিত 'মুবাহ' হবার গোমর ফাঁক হয়ে যায় এবং তারা নিজেরা সম্পূর্ণ সুন্নাত পন্থায় নিজেদের অনুষ্ঠানাদি পালন করবে?

এসব প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে আমার যে অনুভূতি ও মানসিকতা প্রকাশ করলাম তা যদি সঠিক না হয়ে থাকে, তবে মেহেরবানী করে কিছুটা বিস্তারিতভাবে প্রথা প্রচলনের পালনীয় দিকগুলোকে বর্জনীয় দিকগুলো থেকে পৃথক করার কারণ লিখে জানাবেন। এতে যদি আমি আশ্বস্ত হই তবে হয়তো এই কুমার জীবন যাপন থেকে মুক্তি পেতে পারবো। আর আপনি যদি আমার মতকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেন, তবে বাহ্যত

কামিয়াবীর কোনো সুযোগ কোথাও আমার জন্য নেই। অবশ্য এটা আমার জন্যে পরম আনন্দের বিষয় হবে। কেননা এতে করে আমার সকল দুঃখ কষ্ট আল্লাহর পথে বরণ করছি বলে প্রমাণিত হবে।

জবাব ঃ 'আগের কাজ আগে' নীতির ভিত্তিতে আমরা কাজ করছি। প্রথমে অন্তরে দীনের শিকড় গেড়ে নেয়া আবশ্যক। অতপর জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ও অধ্যায়ে এর যাবতীয় শাখা প্রশাখাকে গুরুত্বানুযায়ী ক্রমানুসারে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ আসবে। আমরা যদি বিয়ে শাদী, লেনদেন ও অন্যান্য বিষয়ের প্রাসংগিক ও খুঁটিনাটি দিকের আলোচনায় জড়িয়ে পড়ি, তবে আমাদের মৌলিক দাওয়াতের কাজ বিশৃংখল হয়ে পড়বে। এজন্যে আমরা কেবল দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করে থাকি। আর যাবতীয় প্রাসংগিক বিষয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে বক্তব্য রেখে থাকি।

বিয়ে শাদীর এসব উৎসব অনুষ্ঠান ততোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাংগভাবে সংশোধন হতেই পারেনা, যতোক্ষণ না লোকদের দীনি যিন্দেগী সঠিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, যে পর্যায়ে এসব জিনিসের সংশোধন সম্ভব। সে সময় আসা পর্যন্ত আমাদের রুকনদের (সদস্যদের) কেবল সেইসব জিনিস থেকে অধিকতর আত্মরক্ষার ব্যাপারে জোর দেয়া উচিত, যেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে শরীয়ত বিরোধী বলা যেতে পারে। বাকি থাকলো সেসব রসম বেওয়াজর কথা, যেগুলো ইসলামী সমাজের মুল প্রাণসত্তার খেলাপ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজে আইন ও শরীয়তের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, আমাদের ইসলামী চেতনায় এগুলো যতোই অসহনীয় হোক না কেন এখন আমাদেরকে এ আশায় এগুলোকে বরদাশ্‌ত করে নিতে হবে যে, ক্রমান্বয়ে এগুলো সংশোধন হয়ে যাবে। কিন্তু এ বরদাশ্‌ত স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে নয়, রবঞ্চ বিরোধিতা, প্রতিবাদ ও উপদেশ নসীহতের সাথে করতে হবে। অর্থাৎ এসব উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইসলামী শরীয়ত তো সে ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠান চায়, যেরূপ অনুষ্ঠান হয়েছিল উম্মাহাতুল মুমিনীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের বিয়েতে। কিন্তু তোমরা যদি বিবাহ অনুষ্ঠানের এসব বাহুল্য প্রদর্শনী বর্জন করতে রাজি না হও, তবে আমরা কেবল বাধ্য হয়েই তা বরদাশ্‌ত করবো এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবো যেনো সে সময়টির আগমন ঘটে যখন তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের মতো সহজ সরল বিয়েকে তোমাদের জন্যে অমর্যাদাকর মনে করবেনা।

আমাদের এই দৃষ্টিভংগি তো সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে, যাদের সংগে আমরা বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং বিভিন্নভাবে দুনিয়াবী কাজ কর্ম ও লেনদেন করতে বাধ্য হই। কিন্তু জামায়াত সদস্যদের নিজেদের মধ্যে এরকম যতো সম্পর্ক, আচার অনুষ্ঠান ও কাজ কর্ম অনুষ্ঠিত হবে, তা সবই তথাকথিত এসব রসম রেওয়াজের সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র রেখে সহজ সরলতার সেই পাটাতনে নিয়ে আসতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এগুলোকে যেখানে পৌছিয়েছিলেন। আমাদের আচরণে মুবাহ জিনিসগুলোকে মুবাহ্র সীমা পর্যন্তই মর্যাদা দিতে হবে। এসবের কোনো একটি জিনিসকেও আইন ও শরীয়তের মর্যাদায় স্থান দেয়া যাবেনা। রসম রেওয়াজের স্রোতে ভাসমান এমন অনেক লোকই আছেন যারা এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু সবার আগে নিজে আওয়ায তোলার সৎ সাহস রাখেননা। প্রথা প্রচলনের শৃংখল থেকে অনেকেই মুক্তি লাভ করতে চান, কিন্তু অন্যদের পূর্বে নিজে এতে আঘাত হানার সাহস রাখেননা। নিজেদের পিঠে চাপানো রসম রেওয়াজের বোঝা তাদের কোমর ভেংগে দিচ্ছে, কিন্তু তারা সবার আগে সেগুলোকে পদতলে নিক্ষেপ করতে পারছেননা। এই অগ্রণী ভূমিকা এখন আগে আমাদেরকেই পালন করতে হবে। আমাদের কাফেলার প্রত্যেক সাথীর জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম, আচার আচরণ ও উৎসব অনুষ্ঠানকে এসব রকমারি শৃংখল থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে নির্ভীকচিত্তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। লোকদের মান বাচানোর জন্যে নিজেরা অপদস্থ ও অপমানিত হয়ে সমাজ জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে! সঠিক ইসলামী নিয়মে যদি বিভিন্ন স্থানে উৎসবাদি ও আচার অনুষ্ঠান একবার কায়েম করে দেয়া যায়, তবে সমাজের কিছু না কিছু লোক তার অনুসরণ অনুবর্তনে এগিয়ে আসবে এবং ধীরে ধীরে এভাবে আমরা সমাজে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবো।

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকায় সাধারণত বিয়ের মোহরানা নয়শত টাকা ধার্য করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে তিনশ টাকা নগদ আদায় হয়ে যায় এবং ছয়শত টাকা বাকি থাকে (যা স্ত্রী যে কোনো সময় দাবি করতে পারবে)। কিন্তু সাধারণত পুরুষের পক্ষ থেকে ঐ ছয়শ টাকা পরিশোধের কখনো সুযোগ হয়না।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে আমাদের এক আত্মীয়ের কন্যার বিয়ে হয়েছিল। তার মোহরানা ধার্য হয় দশ হাজার টাকা। প্রথম দিকে ছেলের

পক্ষ থেকে এই বিরাট অংকের মোহরানা মেনে নিতে কিছুটা আপত্তি তোলা হয়। কিন্তু পরে কেবল এই কারণে আপত্তি পরিহার করা হয় যে, এসব কিছু তো একটা লোক দেখানো প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন এই আত্মীয়ের অপর কন্যার সম্বন্ধ আমার ছোট ভাইয়ের সাথে ঠিকঠাক হয়েছে। খুব শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে। পাত্রির অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আগেই এ নোটিশ দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মোহরানা আগের কন্যার মতোই নয় দশ হাজার টাকা ধার্য হবে। এ পরিমাণ থেকে কোনো রকম কমতি করা হলে তার আগের জামাই বেঁকে বসবে। কারণ তার বিয়েতে যখন দশ হাজার টাকা মোহর ধার্য করা হয়েছে, এখন দ্বিতীয় জামাইর জন্যে কেন তার কম ধার্য করা হবে?

এই সমস্যার সমাধানকল্পে উভয় পক্ষ একটা পন্থা স্থির করেছে। তা হলো, বিয়ের মজলিসে যখন আমাদের সেই আত্মীয়ের প্রথম জামাই উপস্থিত থাকবে, তখন মোহরানা আগের কন্যার মতোই নয় দশ হাজার টাকা লেখা হবে। কিন্তু পরে চুপিসারে এই লেখাকে পরিবর্তন করে নয় হাজারের স্থানে নয়শ লিখে দেয়া হবে। এভাবে না তার প্রথম জামাই অসন্তুষ্ট হবে আর না আমাদের ছোট ভাইয়ের উপর বোঝা চাপবে।

এই প্রস্তাবিত পন্থার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে খটকা সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার এ মনোভাব আব্বার সামনে পেশ করে বলেছি, বিষয়টি সঠিক ও বৈধ কিনা তা উলামায়ে শরীয়তের কাছ থেকে জেনে নিন। এর জবাবে তিনি বললেন যে, স্থানীয় একজন মুফতীর নিকট এ বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি রায় দিয়েছেন, পারস্পরিক কোনো বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে আর কোনো আপত্তি থাকেনা। এ ফতোয়ার ব্যাপারে আমি আব্বাকে আমার অনাস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছি।

এ বিষয়ে আমি জামায়াতে ইসলামীর একজন রোকনের মতামত জনতে চাইলে তিনে বলেছেন ঃ এ পন্থায় একদিকে প্রথম জামাইকে ধোঁকা দেয়া হবে। অপরদিকে দশ হাজার টাকা মোহরানা ধার্যের আরেকটি উদাহরণ লোকদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রসম রেওয়াজের শিকলে আরেকটি গ্রন্থী হবে। এ কারণে আমি এটাকে সঠিক পন্থা মনে করিনা।

এখন সমস্যা হলো, পাত্রের ভাই হবার কারণে বিয়ের মজলিসে আমাকে শরীক হতে হবে। হয়তো আমাকে উকিল বা সাক্ষী হবার অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে। অথচ, আমার অন্তর এটাকে জায়েয বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেনা। যদি উকিল কিংবা সাক্ষী হিসেবে আমি মজলিসে শরীক হই, তকে এই ভ্রান্ত কাজে আমিও অংশীদার হয়ে বসবো, যা আমার আত্মীয় স্বজন বুঝে শুনে

করতে যাচ্ছেন। আর যদি আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে শরীক না হই, তবে মনে করা হবে আমি ভাইয়ের বিয়েতে সন্তুষ্ট নই। তাছাড়া শরীক না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে আমি চুপ থাকতে বাধ্য হবো। কেননা, প্রকৃত সত্য ব্যাপার বলতে গেলে গোটা ব্যাপারটাই লন্ডভন্ড হয়ে যাবে।

এখন মেহেরবানী করে আপনি আমাকে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভংগির কথা বলে দিন। ইনশাআল্লাহ্ তা পালন করতে পার্থিব স্বার্থ এবং সম্পর্ক আমার জন্যে প্রতিবন্ধক হতে দেবনা। এ ব্যাপারে আমি কেবল শরীয়তের হুকুম জানতে চাই। তা মেনে চলতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পলায়ন ও গা বাঁচানোর জন্যে কোনো ব্যাখ্যা চাচ্ছিনে।

জবাব ঃ মুসলমান সমাজ শরীয়ত ও নৈতিক দিক থেকে দূরে সরে গিয়ে যেসব ভ্রান্ত কর্মকান্ডে নিমজ্জিত হয়েছে আপনার লিখিত ঘটনাটি তারই একটি নমুনা মাত্র। শরীয়ত মোহরকে নারীর অধিকার নির্ধারণ করেছিল এবং তার জন্যে এ পন্থা ঠিক করেছিল যে, পাত্রি এবং পাত্র সমঝোতার ভিত্তিতে যে পরিমাণ নির্ধারণ করবে তাই পরিশোধ করা বরের জন্যে ওয়াজিব হবে। কিন্তু মুসলমানরা শরীয়তের এ পন্থাকে পরিবর্তন করে মোহরকে একটি রসম এবং প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত করেছে। লোক দেখানোর জন্যে তারা বিরাট বিরাট অংকের মোহর ধার্য করা আরম্ভ করেছে, প্রথম থেকেই যা পরিশোধ করার নিয়্যত থাকেনা এবং যা পরবর্তীতে বংশীয় ঝগড়া ঝাটির সময় স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জন্যে জীবন সমস্যা আকারে দেখা দেয়। এসব ভ্রান্ত কর্মকান্ড থেকে বাঁচার জন্যে এখন একটিমাত্র সহজ সরল ও পরিষ্কার পথ রয়েছে। আর তা হলো, মোহর এমন পরিমাণ ধার্য করতে হবে যা পরিশোধ করার নিয়্যত থাকবে এবং যা পরিশোধ করার সামর্থ স্বামীর থাকবে। পূর্ণ মোহর বিয়ের সময় পরিশোধ করে দিতে পারলেই ভালো। তা না হলে পরিশোধের জন্যে একটা মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে এবং সহজ কিস্তিতে তা পরিশোধ করে দিতে হবে। এই সত্য সঠিক পথ ত্যাগ করে যদি কোনো প্রকার হিলা বাহানার পথ বের করার চেষ্টা করা হয় তবে পরিণতিতে একটা গলদ থেকে বাঁচার জন্যে বিভিন্ন প্রকার আরো দশটা গলদ করা হবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই দুষণীয় এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে চরম দৃষ্টিকটু। আর এমনটি না হয়ে পারেনা। এধরনের বিয়েতে আপনি উকিল বা সাক্ষী হতে যাবেননা। বরঞ্চ আপনি উভয় পক্ষকে বুঝানোর চেষ্টা করুন। আপনার কথা না শুনলে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির সাক্ষি হওয়া মুসলমানদের

জন্যে বৈধ নয়। (তরজমানুল কুরআন, যুল ক'দাহ ১৩৬৫, অক্টোবর ১৯৪৬, রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খন্ড)।

সহশিক্ষা

প্রশ্ন ঃ সহশিক্ষার ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য কি?

জবাব ঃ সহশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারা কি আপনার জানা নেই?

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ জানা আছে বটে। তবে আমি চাচ্ছি, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সম্মুখে এ সম্পর্কে আপনার মতামত এসে যাক।

জবাব ঃ আমরা সহশিক্ষাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পদ্ধতি বলে মনে করি। পাশ্চাত্য জগত আজ যে নৈতিক অধপতন ও সামাজিক বিশৃংখলায় নিমজ্জিত হয়েছে এবং তাদের বংশীয় কাঠামো যেভাবে ধ্বংস হয়েছে তার পেছনে অন্যান্য কারণ ছাড়াও সহশিক্ষার কুফল বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

ইসলামের দৃষ্টিতে গানবাজনা ও নারীপুরুষের মেলামেশা

প্রশ্ন ঃ গানবাদ্য, বিশেষত বাদ্যযন্ত্র সহকারে গানবাজনা আজকাল চিত্তবিনোদনের একটা অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। এতে যতোক্ষণ নারী ও নারীকণ্ঠ যুক্ত না হয়, ততোক্ষণ একে বিস্বাদ ও অসম্পূর্ণ মনে করা হয়। ঘরে ঘরে রেডিও টেলিভিশন রয়েছে এবং তার আসল উদ্দেশ্য গানবাজনা ও নাচ উপভোগ করা। বাড়ির লোকজন যেকোনো কাজে ব্যস্ত থাক, অথবা অবসর কাটাক, বিশ্রাম নিক, আলাপ আলোচনায় রতো থাক, সর্বাবস্থায় কানে গান বাজনার বিষ ঢালা চলতেই থাকে। বাসে, ট্রেনে, দোকানে, হোটেলে, বিয়েশাদীতে গান বাজনা যেনো না থাকলে চলেই না। অমুসলিমদের সমাজে যেমন, মুসলমানদের সমাজেও তেমন এর অবাধ প্রচলন।

ইসলামে যে নাচ গান নিষিদ্ধ অনেক মুসলমানের সে অনুভূতি পর্যন্ত নেই। কেউ কেউ যুক্তি দেয়, গান বাজনা ও তাতে মেয়েদের অংশগ্রহণ হারাম একথা কুরআনে নেই। এটা কেবল মোল্লাগিরি এবং মৌলবাদীদের মনগড়া। বিস্ময়ের ব্যাপার, এহেন নোংরামিকে সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে রমযান মাসেও রেডিও, টিভি ও সিনেমায় এই কদাচার অপ্রতিহতভাবে চলেছে। শুধু তাই নয়, দেশের বাইরেও নারীপুরুষের মিলিত দল পাঠানো হয়েছে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মুখে কলংক লেপনের জন্যে। এর পাশাপাশি আবার আল্লাহ ও রসূলের ফরমাবরদারী ও ব্যয় সংকোচনের সদুপদেশ দেয়াও অব্যাহত

রয়েছে। এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নীতি কি তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে চূড়ান্ত কর্তব্য সমাধা করা ও এই অপকর্মের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে।

জবাব ঃ গান বাজনার ললিত সুর ও রাগ উৎপন্নকারী যাবতীয় সুর ও সরঞ্জামাদির ব্যবহার ইসলামে অবৈধ। এগুলোর ব্যবহার তো দূরের কথা, এগুলো তৈরি করা, বিক্রি করা এবং খরিদ করাও নাজায়েয। কেবল বিয়ে শাদীতে বা খুশীর উৎসবাদিতে ঢোল বাজানো জায়েয আছে। এ বিষয়ে মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস নিম্নে দেয়া গেল ঃ

عن ابى امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وامرنى ربى عزوجل يمحق المعازف والمزامير والاوثان والصلب وامر الجاهلية۔ لا يحل بيعهن ولا شراهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وثمنهن ۔

১. "হযরত আবু উমামা জানান, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে বিশ্ববাসীর জন্য করুণাস্বরূপ এবং পথনির্দেশকস্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেনো আমি গানবাজনার যন্ত্রপাতি নিশ্চিহ্ন করে দিই - চাই তা মুখ দিয়ে, হাত দিয়ে কিংবা আঘাত করে বাজানো হোক, আর আমি যেনো দেবদেবীর মূর্তি, ঈসার প্রতিকৃতি এবং যাবতীয় অনৈসলামিক জিনিস বিলুপ্ত করে দিই। এসব জিনিষের বেচাকেনা এবং লেনদেন করা, এগুলো ব্যবহার করা ও শিখানো হারাম।"

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على امتى الخمر والميسر والمبرز والقنين، قال يزيد القنين البرابط ۔ (مسند احمد : ج ٢ ص ١٣٥)

২. "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের ওপর মদ, জুয়া, জবের মদ, তবলা ও যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র হারাম করে দিয়েছেন।"

عن نافع ان ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع

اصبعيه فى اذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع اتسمع فاقول نعم فيمضى حتى قلت لا - فوضع يديه واعاد راحلته الى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا۔

(مسند احمد، حلد ٢، ص ٨)

৩. "হযরত নাফে" বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এক রাখালের বাঁশির আওয়ায শুনে কানে আংগুল দিলেন এবং নিজের সওয়ারী জন্তুটিকে সড়ক থেকে সরিয়ে চলতে থাকলেন (যাতে আওয়ায থেকে দূরে থাকা যায়) এবং কিছুক্ষণ পরপরই জিজ্ঞেস করতে থাকলেন ঃ ওহে নাফে! বাঁশির আওয়ায কি শুনতে পাচ্ছ? আমি বলে যাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ। আর তিনি চলছিলেন। এক সময় বললাম ঃ আওয়ায শোনা যাচ্ছেনা। তখন তিনি কান থেকে আংগুল সরিয়ে নিলেন এবং সওয়ারী জন্তু সড়কে ফিরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন ঃ আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক রাখালের বাঁশির আওয়ায শুনে এরূপ করতে দেখেছি।

গানবাজনা, বিশেষতঃ নারীকণ্ঠের গান হারাম হওয়ার উল্লেখ কুরআনে নেই - এ যুক্তি দুই কারণে অচল। প্রথমত ইসলামের ব্যাপারে আদেশ নিষেধের উৎস শুধু কুরআন একথা বলার অধিকার কোনো মুসলমানের আছে বলে আমরা স্বীকার করিনা। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের মূল স্তম্ভ। কিন্তু এর কোনো একটিরও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধিবিধান কুরআনে নেই। প্রত্যেকটির ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসন্ধান ও তা থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করা অপরিহার্য। পানি পাওয়া গেলে সুস্থ মানুষের পক্ষে ওযু করে পবিত্র হওয়া ছাড়া নামায পড়া শুধু নাজায়েযই নয় বরং কবীরা গুনাহ। কুরআনে অযুর প্রধান প্রধান বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কিসে কিসে ওযু ভাঙ্গে, তার সব ক'টি উল্লেখ করা হয়নি। যে ব্যক্তি হাদীসকে ইসলামী বিধিবিধানের উৎস মনে করেনা, তার ওযু নামায বা তওয়াফ চলাকালে ভঙ্গ হলে এবং সেই অবস্থাতেই নামায বা তাওয়াফ চালিয়ে গেলে সে সওয়াব বা পুরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা, আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে। ঠিক এরূপ পরিস্থিতি শরীয়তের আরো বহু বিধিতে দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র কুরআনের অনুসরণের দাবিদার, সে শূকরের গোশ্‌ত খাবেনা বটে। কিন্তু কুকুর বা

পালিত গাধার গোশ্‌ত খাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকবে বা খেতে রাজি হবেনা এমন কোনো কারণ নেই। কেননা এসব জন্তুর হারাম হওয়ার কথা কুরআনে নয়, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এ যুক্তি এরূপ ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, পবিত্র কুরআনে নাচ গান ও বাদ্যযন্ত্র দ্বারা বাজনার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়নি। নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এ ধরণের কথা বলা আজকাল রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। অথচ যে ব্যক্তিই গভীর চিন্তাভাবনা ও খোদাভীতি সহকারে কুরআন অধ্যয়ত করবে, সে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবে শরীয়তের অধিকাংশ বিধির ব্যাপারে হাদীসে যেটুকু বর্ণিত হয়েছে, তার মূল তত্ত্ব কুরআনেও রয়েছে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, কুরআনে যেটা সংক্ষেপে বা সাধারণ তত্ত্বকথার আকারে বলা হয়েছে, হাদীসে সেটা সবিস্তারে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন কুরআনের সূরা নূরে ৩১ নং আয়াতের প্রথমদিকে বলা হয়েছে ঃ

"হে রসূল! মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেনো দৃষ্টি নীচু বা সংযত রাখে, লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে এবং আপন রূপ জৌলুস প্রকাশ না করে, তবে আপনাআপনি যেটুকু বেরিয়ে পড়ে সেটুকুর কথা ভিন্ন"

এরপর আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ

"আর নারীরা মাটির ওপর এরূপ জোরে জোরে পদাঘাত করতে করতে যেনো না চলে যার দরুন তাদের লুকানো সৌন্দর্য বা অলংকারাদি মানুষের গোচরে এসে যায়।" এখন প্রশ্ন হলো, হাটাচলার সময় নারীর অলংকার, আর তাও পায়ের অলংকারের ঝংকার সৃষ্টি বা কর্ণগোচর হওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে নারীর কন্ঠের সুললিত সূর বাদ্যযন্ত্র সহকারে ধ্বনিত করা এবং তার নাচা গাওয়া কুরআনের দৃষ্টিতে কিভাবে জায়েয হতে পারে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম এবং প্রাচীন থেকে আধুনিক মুসলিম মনীষীদের আমলে কখনো কোনো মুসলিম নারী কর্তৃক আযান দেয়া, মসজিদে তাকবীর বলা এবং উচ্চস্বরে কুরআন পড়ার কোনো নযির বা দৃষ্টান্ত নেই। তাহলে মুসলিম নারীর পক্ষে কোনো সমাবেশে, রেডিও বা টেলিভিশনে গানবাজনা করা এবং প্রেমের শিক্ষা দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে? সূরা আহযাবের ৩২ নং আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সকল মুসলিম মহিলার ওপর তা প্রযোজ্য যে ঃ

"তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তা হলে এমন কোমল স্বরে কথা বলোনা যাতে কোনো মানসিক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির মনে লালসা জন্মে। তোমরা সরল স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।"

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনীদের জন্য যদি সাহাবাদের সাথে কোমল স্বরে কথা বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে থাকে - অথচ তাঁরা উম্মুল মুমিনীন (তথা সমগ্র মুসলিম জাতির মাতা) এবং তারা বিধবা হওয়ার পর তাদের বিয়ে করা মুসলমানদের ওপর চিরতরে হারাম, তাহলে বর্তমান সর্বব্যাপী গোমরাহী এবং চরম নৈতিক অধপতন ও অবনতির যুগে নারী পুরুষের মিশ্র সমাবেশে বেপর্দা হয়ে অবাধ মেলামেশা, নাচানাচি, ঢলাঢলি করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? ইমাম যদি নামাযে ভুল করে বসে, তবে পুরুষ মুক্তাদীকে সুবহানাল্লাহ বা আল্লাহু আকবার বলে ইমামের মনোযোগ আকর্ষণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহিলা মুক্তাদীকে হাতে তালি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর কোনো খোদাভীরু মুসলমান আজকালকার তথাকথিত বিচিত্রানুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বৈধতার কথা কল্পনা করার ধৃষ্ঠতা কিভাবে দেখাতে পারে? সাংস্কৃতিক দল শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাইরেও পাঠানো এবং দেশে দেশে ঘুরানোর অভিরুচি কিভাবে হয় এবং এর দায়দায়িত্ব বহনের সাহস কিভাবে জন্মে?

উপসংহারে তাফহীমুল কুরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া সমীচীন মনে হচ্ছে ঃ

"এটা একটু ভেবে দেখার ব্যাপার, যে দীন নারীকে পর পুরুষের সাথে কথা বলার সময়ও লাস্যময় ও মোহনীয় পন্থা অবলম্বনের অনুমতি দেয়না এবং তাকে পুরুষদের সামনে বিনা প্রয়োজনে শব্দ করতেও নিষেধ করে, সেই দীন কি কখনো এটা পছন্দ করতে পারে যে, নারীরা মঞ্চে এসে নাচবে, গাইবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপাবে, ঝাঁকাবে, ভাবভংগী প্রর্দশন করবে প্রীতি প্রণয় দেখাবে? রেডিওতে প্রেমের গান গাইবে, মিহি সূরে অশ্লীল বক্তব্য সম্বলিত সঙ্গীত শুনিয়ে যৌন আবেগে আগুন ধরাবে? নাট্যমঞ্চে নারীর কারো স্ত্রী বা প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করা কিংবা নারীকে বিমানবালা বানিয়ে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া, ক্লাবে, উৎসব অনুষ্ঠানে, মিশ্র সভাসমিতিতে নারীর সেজেগুজে আসা ও পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলেমিশে কথাবার্তা বলা ও হাসি তামাশা করার অনুমতি কী করে ইসলাম দিতে পারে? এই সংস্কৃতি কোন্ কুরআন থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে? আল্লাহ যে কুরআন নাযিল করেছেন, তাতো সবার চোখের সামনে রয়েছে। সেই কুরআনে এ ধরনের সংস্কৃতির অবকাশ কোথাও পরিলক্ষিত হয়ে থাকলে সেই স্থানটি দেখিয়ে দেয়া হোক।" তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাব, টীকা ৪৭ শেষ অনুচ্ছেদ। (রাসায়েল ও মাসায়েল ৬ষ্ঠ খন্ড)।

●

১৩

যিকর ও দু'আ

যিকরুল্লাহ

প্রশ্ন ঃ মন বার বার আল্লাহর স্মরণ (যিকর) থেকে দূরে সরে যায়। গাফ্‌লতি আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ইবাদতে এবং নামাযে মন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হয়না। আমার জন্যে দোয়া করবেন আর এ রোগের নিরাময় কিসে হবে তা আমাকে বলে দেবেন?

জবাব ঃ অন্তরে আল্লাহ তাআলার স্মরণকে তাজা করবার কোশেশ করার মাধ্যমেই এ রোগের নিরাময় হতে পারে। আল্লাহর স্মরণই মানুষকে নেকী ও কল্যাণের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং রক্ষা করে মন্দ ও অকল্যাণ থেকে। কারো মন যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যেতে চায়, তবে তার মনকে আল্লাহর স্মরণে বাধ্য করা উচিত। আসলে মানুষের অন্তরে যখন ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তখনই শয়তান তার মনকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করার সুযোগ পেয়ে যায়। এ সুযোগে সফলতা অর্জন করার পর সে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় অন্যায় ও মন্দের প্রতি। মানুষের ইচ্ছাশক্তিই শয়তানকে প্রতিহত করে। এটাই তার আসল শক্তি। কিন্তু কেউ যখন এ শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন শয়তানকে প্রতিহত করার মতো আর কোনো জিনিস তার কাছে থাকেনা। তাই নিজের পুরো ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর স্মরণে হৃদয়মনকে সিক্ত রাখতে এবং ইবাদত ও অন্যান্য নেক কাজে নিবিষ্টচিত্ত হতে নিজেকে নিজে বাধ্য করা প্রত্যেকেরই উচিত। এভাবে কিছুদিন যখন কেউ নিজেকে নিজে বাধ্য করে, নিজের মনের সাথে নিজে যুদ্ধ করে স্বীয় মনকে আল্লাহর স্মরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তখন ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি বাড়তে থাকবে এবং অবশেষে শয়তানকে পরাজিত করার পুরো শক্তি তিনি অর্জন করবেন।

খাশিয়াতুল্লাহ

প্রশ্ন ঃ নিয়্যতের নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় আমার দ্বারা মন্দ

কাজ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে অন্তরে অনুশোচনার উদ্রেক হয় এবং লজ্জিতও হই। কিন্তু মনে আল্লাহর ভয় জাগেনা। দীর্ঘদিন থেকে আমি এ গুনাহগুলো থেকে বাঁচতে চাই এবং আমার বড় খাহেশ, আল্লাহ এবং বিচার দিনের কথা স্মরণ হতেই আমি কান্নায় ভেংগে পড়ি। কিন্তু আজো আমার মধ্যে সে অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

জবাব ঃ কান্না সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখবেন। তা হলো এইযে, কেবল চোখ ভরে অশ্রু ঝরানোটাই কান্না নয়। অন্তরের কান্নাই হচ্ছে আসল ও প্রকৃত কান্না। কারো কারো অবস্থা এমন হয়ে থাকে যে গুনাহের অনুশোচনার কারণে অশ্রুপাত করাতো দূরের কথা, এমনকি তার একান্ত আপনজন মরে গেলেও তার চোখে পানি আসেনা। অথচ তার মন ব্যথায় এবং আঘাতে ছটফট করতে থাকে। মূলত এটি হচ্ছে প্রকৃতিগত (PHYSICAL) ব্যাপার। অশ্রু কারো ঝরে আবার কারো ঝরেনা। বিভিন্ন লোকের অবস্থা ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। দেখার বিষয় হচ্ছে, গুনাহ হয়েছে অনুভব করার পর ব্যক্তির মন আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠেছে কি না? এতে সে অনুতপ্ত কি না? সত্যিই যদি তার মধ্যে অনুতাপ অনুশোচনা এবং আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়, সংঘটিত গুনাহটির জন্যে মনে কোনো প্রকার আনন্দ সৃষ্টি না হয় এবং সেই অপরাধে পুনরায় লিপ্ত না হয়, তবে এটাই খাশিয়াতুল্লাহর (আল্লাহর ভয়ের) দাবি পূর্ণ করে। তওবার জন্যে এটাই যথেষ্ট, চোখের পানি ঝরা জরুরি নয়।[১] (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

তারতীলে কুরআন

প্রশ্ন ঃ আপনি 'তারতীলে কুরআন' কথাটির তাৎপর্য বলতে গিয়ে বলেছেন, এ হচ্ছে, ধীরে ধীরে থেমে থেমে বুঝে বুঝে এবং চিন্তা করে করে পড়া। ব্যাপার যদি তাই হয় তবে আমাদের অবস্থা কি হবে? আমরাতো তারতীলের খিলাফ পড়ে পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এতে আমাদের কোনো গুনাহ হবে নাতো?

জবাব ঃ আমি মনে করি তারতীলের খিলাফ পড়া হয় কুরআন না বুঝে পড়া হলে। কেউ যদি বুঝে শুনে কুরআন পড়েন, তবে তিনি এ কালামকে ঝটপট হুটাহুট পড়ে যেতে পারেননা। কেবল না বুঝে পড়লেই এভাবে পড়া যেতে পারে। আর এভাবে পড়লে তিলাওয়াতকারীর খেয়ালই থাকেনা যে, তিনি কি তিলাওয়াত করছেন? মর্মার্থের প্রতি তার দৃষ্টিই নিবদ্ধ হয়না। এরূপ তিলাওয়াতকারীর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, তিনি কুরআন মজীদ

১. আইন, ১৬ নভেম্বর ১৯৬৮ ইং।

তিলাওয়াত করতে করতে যখন কোনো প্রশ্নবোধক আয়াত এসে পড়ে তখন তিনি তা এমনভাবে তিলাওয়াত করেন যেনো এখানে কোনো প্রশ্নই করা হয়নি। এতে বুঝা যায়, তিনি কি জিনিস পড়লেন তা তার মনমগজেই ঢুকেনি। অথচ তিনি যদি বুঝে বুঝে আয়াত উচ্চারণ করতেন, তবে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক ভংগিতেই উচ্চারণ করতেন। এমনি করে এ ধরনের পাঠকদের আপনি দেখবেন, ভয়ানক আযাবের দুঃসংবাদবহ আয়াতকে তিনি এমনভাবে তিলাওয়াত করছেন, যেনো তাতে সুসংবাদ রয়েছে। তার দেহমনে কোনো প্রকার ভয়ভীতির অবস্থাই সৃষ্টি হয়না। প্রকৃতপক্ষে না বুঝে পড়ার কারণেই এ অবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ যদি এ কুরআন বুঝে শুনে তিলাওয়াত করেন, তবে কিছুতেই তিনি তা ঝটপট পড়ে যেতে পারেননা, কিংবা এমনভাবে তিনি এ কিতাব তিলাওয়াত করতে পারেননা যেনো এ কালামের কোনো প্রভাবই তার উপর পড়ছেনা।

কেউ কেউ কৃত্রিম তারতীলও করে থাকে। না বুঝে টেনে হিঁচড়ে উচ্চস্বরে গেয়ে গেয়ে অসংগতিমূলকভাব ভংগিমায় তারা কুরআন তিলাওয়াত করে। একটি আয়াতাংশ তিলাওয়াত করে মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। এ ধরনের তিলাওয়াতও তারতীলে কুরআন নয়। প্রতিটি শব্দকে তার যথার্থ হক আদায় করে এবং সব ধরনের যতি চিহ্নকে তার ভংগিতে উচ্চারণ করে লাগাতার তিলাওয়াত করে যাওয়াটাই হচ্ছে তারতীলে কুরআন। একটি বাক্য উচ্চারণ করে কয়েক মিনিট থেমে থাকাটা তারতীল নয়। এতে করে গানের শোভা অক্ষুণ্ন থাকে বটে, কিন্তু ভাবের প্রভাব খতম হয়ে যায়। যেমন ধরুন, কোনো একটি বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিবরণ রয়েছে। এখন তিলাওয়াতকারী যদি মাঝখানে এতোটা থেমে থাকলেন যে পূর্ববর্তী বিষয় সম্মুখেই এলোনা, তখন এতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বক্তব্যের পরবর্তী অংশ পরবর্তী অংশের সাথে সম্পর্কিত না হওয়া পর্যন্ত তো আসলে মূল বক্তব্যই স্পষ্ট হয়না। এটাও তারতীলে কুরআনের নিয়ম নয়। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব - ১ম খন্ড)

দু'আ কি?

প্রশ্ন ঃ দু'আ বলতে কি বুঝায় এবং এর তাৎপর্যই বা কি?

জবাব ঃ দু'আ মূলত একথার স্বীকৃতি যে, আপনিই জগতের সবকিছু নন। আপনার উপরে এক মহা শক্তিমান সত্তা রয়েছেন, যিনি আপনার ভালো মন্দ নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ইচ্ছা করলে আপনার পার্থিব যাবতীয় বিষয়ে আপনাকে সফলকাম করে দিতে পারেন। আর তাঁর ইচ্ছা না হলে, আপনার ভাগ্যে নেমে আসতে পারে চরম ব্যর্থতা। এ মহাসত্যের অনুভূতি যার মধ্যে

রয়েছে, তিনি অবশ্যি ঊর্ধ্বতন সেই মহাশক্তিমানের কাছে প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে দেবেন। সেসব বিষয়ে তাঁর কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করবেন, যেগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার বাইরে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব - ১ম খন্ড)

দু'আ কি পূর্ণ হয়?

প্রশ্ন ঃ মানুষ আল্লাহর কাছে যে দু'আ প্রার্থনা করে, তা কি পূর্ণ হয়?

জবাব ঃ জী হ্যাঁ, দু'আ অবশ্যি পূর্ণ হয়। এমন এমন কাজ হয়ে যায়, যেগুলো সম্পর্কে বুঝাই যায়না যে, কী করে তা হয়ে গেলো? এমনও হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলো। ডাক্তার তার রোগ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়ে যান। কিন্তু আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করতে চাইলে বিনে পয়সার ঔষধেই কাজ হয়ে যায়।

নাস্তিক দু'আ করেনা। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার যে বিধান জগতময় কার্যকর রয়েছে, তারই অধীনে তার কাজও পূর্ণ হয়। আর একজন মুমিন দু'আ করেন। তার কাজও সম্পন্ন হয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এইযে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাজতো জগতের অনিবার্য নিয়মের অধীনে সম্পন্ন হয়। তার সাথে আল্লাহ বিশেষ কোনো সম্পর্ক রাখেননা। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ব্যক্তির কাজই শুধু সম্পন্ন হয়না, সেই সাথে দু'আর জন্যে তিনি বিনিময়ও লাভ করেন এবং তার অবস্থা ও কার্যক্রমের সাথে আল্লাহর রহমতও শামিল হয়।

আপনার কোনো দু'আ কবুল হয়েছে কি?

প্রশ্ন ঃ আপনার কোনো দু'আ কবুল হয়েছে কি?

জবাব ঃ জী হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতায় বহুবার ধরা পড়েছে যে, দু'আর মাধ্যমে আমার এমনসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যেগুলো সম্পন্ন হবার জন্যে বাহ্যত কোনো উপায়ই ছিলোনা। সকল দিক থেকে আশার সমস্ত পথ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যাবার পর দু'আ সেকাজ সম্পন্ন করে আশার প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে।

দু'আ এবং তাকদীর

প্রশ্ন ঃ মানুষের তাকদীর যদি আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে দু'আ করা অর্থহীন নয় কি? আল্লাহ তা'আলা কি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন?

জবাব ঃ জী হ্যাঁ, PRE-DESTINATION-ও সঠিক এবং দু'আও সঠিক। তকদীরের অর্থ এ নয় যে, কোনো একটি জিনিস ফায়সালা করার পর আল্লাহ তা'আলা অক্ষম হয়ে গেছেন। তিনি যেমন ফায়সালা করার ক্ষমতা রাখেন, তেমনি ফায়সালা পরিবর্তন করারও ক্ষমতা রাখেন। হতে পারে

তিনি কারো ব্যাপারে পূর্ব থেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, সে যদি দু'আ প্রার্থনা করে, তাহলে তার সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেবো। আর দু'আ প্রার্থনা না করলে তার সাথে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজ হবে। এ জিনিসটারই পারিভাষিক নাম 'ঝুলন্ত তাকদীর' (তাকদীরে মুআল্লাক)। অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেই তাকদীর যাতে আল্লাহ তা'আলা রদবদলের অবকাশ রেখে দিয়েছেন। আর "চূড়ান্ত তাকদীর" (তাকদীরে মুবরাম) সেই তাকদীর যার সম্পর্কে এই অকাট্য ফায়সালা হয়ে গেছে যে, তা আর পরিবর্তন করা হবেনা[১]। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব - ১ম খন্ড)

পীর বোজর্গদের মর্যাদার দোহাই পেড়ে দোয়া করা

প্রশ্ন ঃ কোনো পীর ওলীর কবরে গিয়ে এরূপ বলা জায়েয কিনা যে, হে আল্লাহর ওলী! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।"

জবাব ঃ কোনো বোজর্গের কাছে গিয়ে নিজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দোয়া করতে অনুরোধ করা এমন কোনো আপত্তিকর ব্যাপার নয়। মানুষ নিজেও আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে, অন্যকেও দোয়া করতে অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু মৃত লোকদের কাছে এরূপ আবেদন করলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ নেয়। কবরের ওপর দাঁড়িয়ে একথা বলা দু'রকমের হতে পারে। প্রথমত মনে মনে অথবা চুপিসারে বলা। এর অর্থ এই হবে যে, আপনি উক্ত বোজর্গকে আল্লাহর মতোই গোপন কিংবা প্রকাশ্যে কথাবার্তা শোনার ক্ষমতাশালী মনে করেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهِ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ -

"তোমরা কথা গোপনেই বলো বা প্রকাশ্যে বলো, তিনি মনের কথা পর্যন্ত জানেন।"

দ্বিতীয়তঃ চিৎকার করে আল্লাহর সেই ওলীকে ডেকে একথা বলা। এ অবস্থায় আকিদা বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি না থাকলেও এটা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার শামিল। আপনার চিল্লানো সত্ত্বেও তিনি নাও শুনতে পারেন। কেননা মৃত ব্যক্তিরা কথা শুনতে পায় কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যদি তিনি শুনতে পানও, তবু এমন হতে পারে যে, তাঁর রূহ্ ঐ মুহূর্তে সেখানে নেই এবং আপনি বৃথাই একটা শূন্যস্থানে হাঁকডাক করছেন। আবার এও হতে পারে যে, তার রূহ্ সেখানে আছে কিন্তু সে আল্লাহর সাথে আলাপ বা তাঁর ধ্যানে মশগুল। সে অবস্থায় আপনার চিৎকার রূহকে খানিকটা কষ্ট

---

১. এশিয়া লাহোর, ১৮ জুলাই, ১৯৬৯ইং।

দেয়া ছাড়া আর কোনো লাভ হবেনা। আপনি দুনিয়ার কোনো নেককার ব্যক্তির কাছে দোয়া চাইতে গেলে প্রথমে তাঁর সাথে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করেন। এবং তারপর তার কাছে নিজের আবেদন পেশ করেন। গিয়েই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করা শুরু করলেন তিনি ঘরে আছে না বাইরে, আর ঘরে থাকলেও বিশ্রামরত আছেন, না কর্মরত, না আপনার কথা শোনার মতো অবসরেই তিনি আছেন, এ ঘরের কোনো খোঁজ-খবরই নিলেননা - এমনটি তো কখনো করেননা।

এবার একটু ভাবুন তো দেখি, মৃত ব্যক্তির অবস্থা জানা বা তার সাথে সামনা-সামনি সাক্ষাতের সুযোগ যখন নেই, তখন তার বাসস্থানে গিয়ে আন্দাজে চিৎকার জুড়ে দেয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে কি? দোয়া চাইবার এ রীতি যদি কুরআন ও হাদীসে শেখানো হতো, অথবা সাহাবাদের আমলে এ রীতি চালু থাকার কোনো প্রমাণ থাকতো, তাহলে তো ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকতো। নির্দিধায় এটা করা যেতো। কিন্তু এর কোনো নামগন্ধও যখন সেখানে পাওয়া যায়না, তখন এমন পন্থা অবলম্বনের কি হেতু থাকতে পারে যার একটা রূপ তো সরাসরি আল্লাহর গুণবৈশিষ্টের সাথেই সংঘর্ষশীল, আর অপরটা সুস্পষ্টভাবে অযৌক্তিক? (রাসায়েল ও মাসায়েল - ৩য় খন্ড)

১৪

ঈমান ও ইসলাম

ঈমান বিল গায়েব

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন, রসূল প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন এবং রসূল ছাড়া অন্যসব লোককে গায়েবের প্রতি ঈমান আনতে হয়। গায়েবে ঈমান আনার যে দাবি তার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষ এবং রসূলের মধ্যে কী পার্থক্য? ব্যাপারটা আরেকটু স্পষ্ট করে বলুন।

জবাব ঃ ঈমান বিল গায়েবের দিক থেকে সাধারণ মানুষ এবং রসূলদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এইযে, সাধারণ মানুষকে আল্লাহ

তাআলা সেই জ্ঞান প্রদান করেননা, যা প্রদান করেন রসূলগণকে। এ কারণেই সাধারণ মানুষকে রসূলের প্রতি ঈমান আনতে, রসূল যে জ্ঞান তাদেরকে শিক্ষা দেন তা মেনে নিতে এবং অনুসরণ করতে বলা হয়। সাধারণ মানুষের জন্যে হচ্ছে, ঈমান বিল গায়েব এবং রসূলগণের জন্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (ইল্‌ম বিশ্‌ শাহাদাত)। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

ঈমান ও অবিচলতা

প্রশ্ন ঃ অনুগ্রহ করে ঈমান ও ইয়াকীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও অবিচলতার কার্যকরী পন্থা বলে দিন।

জবাব ঃ এর একটিই মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হলো, বুঝে বুঝে কুরআন অধ্যয়ন করুন। কুরআনের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন, কুরআন যে শিক্ষা প্রদান করেছে সে অনুযায়ী নিজের ধ্যানধারণাকে ঢেলে সাজান এবং পূর্ণাংগ জীবনকে সে অনুযায়ী পরিগঠিত করার চেষ্টা করুন। ঈমান এবং ইয়াকীনের ক্ষেত্রে অটলতা ও অবিচলতা অর্জন করা ছাড়া আর অন্য কোনো মাধ্যম নেই। মানুষের হিদায়াতের জন্যেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই কুরআনকে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলে, তা বুঝেশুনে অধ্যয়ন করলে এবং নিজের জ্ঞানভান্ডারকে তার অনুগত করে দিলেই মানুষের ঈমান ও ইয়াকীন লাভ হয়। নিজের জ্ঞানকে কুরআনের অনুগত করে দেয়ার অর্থ হলো এইযে, আপনার মনমগজে যেসব ধ্যানধারণা বদ্ধমূল রয়েছে, আপনি যেসব চিন্তা কল্পনা ও দর্শন পোষণ করেন, এই সবকিছু

থেকে নিজের মনমানসিকতাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে কুরআন অধ্যয়ন করুন এবং কুরআন যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করে সেটাকেই আপনার প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করুন। কোনো ব্যক্তি স্বীয় মনমগজে যেসব ধ্যানধারণা পোষণ করে, সেগুলোকে স্বস্থানে বদ্ধমূল রেখেই যদি কুরআন পড়তে শুরু করে এবং কুরআনকে সেগুলোর ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে থাকে, তবে এর অর্থ হলো, সে কুরআন শিখতে চেষ্টা করছেনা, বরঞ্চ কুরআনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করছে। এ জন্যে এ ধরনের কোনো ব্যক্তি কুরআন থেকে ঈমান লাভ করতে পারেনা, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব লোক গুমরাহীই গ্রহণ করে থাকে। তারা কুরআনের আয়াতের বাঁকাচোরা অর্থ গ্রহণ করে এবং পূর্ব থেকে মনমগজে যেসব ধারণা বদ্ধমূল করে রেখেছে কুরআনের আয়াত থেকে তারা সেগুলোর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতে থাকে। এতে করে অধিকাংশ সময়ই এরা কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের পরিবর্তে গুমরাহীই লাভ করে।[১] (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব - ১ম খন্ড)।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা

প্রশ্ন ঃ সূরা তাকভীরের শেষ আয়াত وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানুষের হিদায়াত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষ যদি হিদায়াত পেতেও চায় আর আল্লাহর ইচ্ছা যদি হয় তাকে হিদায়াত না

দেয়ার তবে সে নিজের আকাংখা থাকা সত্ত্বেও হিদায়াত পাবেনা। মেহেরবানী করে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন।

জবাব ঃ মানুষ হিদায়াত পেতে চাইলেও আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করবেননা, আয়াতটি থেকে এরূপ অর্থ বের করার অবকাশ কোথায়? অবশ্য একথা বলা হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে মানুষের ইচ্ছাই সবকিছু নয় যে, এখানে সে যা ইচ্ছা করবে, যা সিদ্ধান্ত নিবে তাই-ই হয়ে যাবে এবং সে যা ইচ্ছা করবে আল্লাহর ইচ্ছাও অনুরূপ হওয়া জরুরি। মানুষের ইচ্ছার সাথে আল্লাহর ইচ্ছা যুক্ত হওয়া ব্যতিত তা কার্যকর হতে পারেনা। যতোক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা পরিবেশকে তার অনুকূল করে দিবেন ততোক্ষণ সে নেক কাজ করতেও সক্ষম নয়, বদ কাজ করতেও সক্ষম নয়। যেমন এক ব্যক্তি মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেলো, সেই সাথে আল্লাহ তা'আলা তার পায়ে চলন শক্তি দিলেই সে সেখানে যেতে সক্ষম হবে। অনুরূপভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, জীবনের একটি নিশ্বাসও

---

১. সাপ্তাহিক আইন ৩০ জুন, ১৯৬৮।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ইচ্ছা ব্যতিত মানুষ গ্রহণ এবং ত্যাগ করতে পারেনা। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ১ম খন্ড)।

ইসলাম ও বাদ্যযন্ত্র

প্রশ্ন ঃ

১. বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা এবং সেগুলোর ব্যবসা করা কি বৈধ?

২. বিয়ে শাদী উপলক্ষে বাদ্য বাজানো কি জায়েয? আনন্দ ফূর্তির জন্যে বাদ্যযন্ত্রর ব্যবহার কি বৈধ?

৩. উপরোক্ত প্রশ্ন দুটির জবাব যদি নেতিবাচক হয়, তবে এমন লোকদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি, যারা নিজেরা বাদ্যযন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেনা বটে, কিন্তু যারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে তাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তাদের সংগে মেলামেশা করে?

৪. যেসব বিয়েতে বাজনা বাজানো হয়, আমাদের জন্যে তাতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে কি?

৫. বাদ্যযন্ত্র অনুরাগীদের ধারণা হলো, যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেবলমাত্র 'দফ'ই (ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) একমাত্র বাদ্যযন্ত্র ছিলো, আর তিনি সেটা ব্যবহারে অনুমতি প্রদান করেছেন, সুতরাং বর্তমান যুগে 'দফ'-এর বিভিন্ন উন্নত সংস্করণের ব্যবহারে অসুবিধা কি?

৬. 'দফ' কি বাদ্যযন্ত্ররূপে পরিগণিত?

জবাব ঃ

১. হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।" এখন বলুন, যে নবী বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন তাঁর অনুসারীরাই বাদ্যযন্ত্র তৈরি, ব্যবসা ও ব্যবহারে নিজেদের শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করবে একথা কেমন করে সঠিক হতে পারে?

২. বিয়ে শাদী কিংবা অন্য যেকোনো অবস্থায়ই বাদ্য বাজানো বৈধ নয়। হাদীসে যতোটুকু অনুমতি দেয়া হয়েছে তা কেবল এইযে, বিয়ে এবং ঈদ উপলক্ষে 'দফ' বাজিয়ে কিছু গাওয়া যাবে।

৩. আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তাদের সাথে নাজায়েয কাজে অংশ নেয়া ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের সাথে যারা

নিজেদের হাশর লাভ করতে চান, তাদের তো এমন লোকদের সাথে মেলামেশা করা উচিত নয়, যারা শরয়ী বিধানের পরোয়া করেনা। নয়তো এসব লোকের সংগে সম্পর্ক রাখা যাদের নিকট অধিকতর প্রিয়, তাদের একথা উপলব্ধি করা উচিত যে, একই সংগে বদকার এবং নেককার উভয় ধরনের লোকদের সংগে সম্পর্ক রাখা যেতে পারেনা। দুনিয়ায় যারা বদকারদের সংগী, আখিরাতেও তারা তাদেরই সংগ লাভ করবে।

৪. এর জবাবের জন্যে ৩ নম্বর জবাব দ্রষ্টব্য। তবে মনে রাখতে হবে, যখন ইজাব ও কবুল অনুষ্ঠিত হয় এবং অশ্লীল ও গর্হিত কিছুর প্রদর্শনী না হয়, তখন বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। বরঞ্চ তখন অংশগ্রহণ করাটাই উত্তম। আর যখন গান বাদ্য আরম্ভ হয়ে যাবে, তখন অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে আত্মীয় ও বন্ধুদের একথা বলে বিদায় নিয়ে নিতে হবে যে, আমি তোমাদের যাবতীয় বৈধ কাজে আন্তরিক সন্তুষ্টির সাথে তোমাদের সাথে একাত্ম রয়েছি। আর তোমাদের যাবতীয় নাজায়েয কাজে আমি নিজেও অংশগ্রহণ করা অপছন্দ করি এবং তোমরাও এসব খারাপ কাজে নিমগ্ন হও তা পছন্দ করিনা।

৫. সে যুগে 'দফ' ছাড়া আর কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিলোনা, এটা ভুল কথা। তৎকালীন পারস্য, রোম এবং জাহেলী আরবের সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিই এমনটি বলতে পারে। বিভিন্ন প্রকার বাজনার নামতো জাহেলী যুগের কাব্যেও পাওয়া যায়।

৬. 'দফ' যদি বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তাতে কি আসে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে শাদী এবং ঈদ উপলক্ষে এর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আর ব্যবহারের এটাই চূড়ান্ত সীমা। এর বাইরে কোনো ব্যক্তির জন্যে এটা ব্যবহার করা বৈধ নয়। এই চূড়ান্ত সীমাকে যে ব্যক্তি সূচনা বিন্দু (Starting point) বানাতে চায়, খামোখা ঐ নবীর অনুসারীদের মধ্যে তার নাম লিখাতে কে তাকে বাধ্য করেছে যিনি বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন? তরজমানুল কুরআন, মুহররম-সফর ১৩৬৩ হিঃ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ইং। (রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ম খন্ড)।

জামায়াত বিহীন ইসলাম

প্রশ্ন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি আপনার জামায়াতের আদর্শ নীতিমালা অনুযায়ী

নিজ স্থানে একাকী যথাসাধ্য সঠিক ইসলামী জীবন যাপন করে এবং কোনো কারণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামায়াতে শরীক না হয়, তবে তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

জবাব : তার সম্পর্কে আমার ধারণা তাই, যা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো, জামায়াত ছাড়া সঠিক ইসলামী যিন্দেগী হতে পারেনা। কোনো ব্যক্তির যিন্দেগী সঠিক ইসলামী যিন্দেগী হওয়ার জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের (অর্থাৎ ইকামতে দীনের) সাথে তার জীবনের সম্পর্ক থাকতে হবে। এ সম্পর্কের দাবি হচ্ছে, মানুষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে চেষ্টা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। আর একথা পরিষ্কার যে, সংঘবদ্ধ শক্তি ছাড়া এ চেষ্টা সংগ্রাম চলতে পারেনা। সুতরাং জামায়াতবদ্ধ জীবন ছাড়া কোনো যিন্দেগীকে সঠিক ইসলামী যিন্দেগী বলা সম্পূর্ণ ভুল। কোন্ জামায়াতের সংগে সম্পর্ক রেখে সে এ দায়িত্ব পালন করবে সেটা বিলকুল ভিন্নকথা। সে ইচ্ছা করলে আমাদের জামায়াতে যোগ দিয়েও একাজ করতে পারে, অথবা অন্য কোনো দলে যোগ দিয়েও তা করতে পারে, যে দল এ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এবং যার সাংগঠনিক কাঠামো ও আন্দোলনের পদ্ধতি ইসলামের সঠিক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনটি করলে কোনো ব্যক্তিকে আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে স্বীকার করে নিতে কোনো প্রকার দ্বিধা করবোনা। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি কেবল এমন কোনো পদ্ধতির অনুসরণকেই যথেষ্ট মনে করে, যাকে শরীয়ত শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনের সংগে সম্পর্কিত

করেছে এবং ইকামতে দ্বীনের চেষ্টা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কোনো জামায়াতের সাথে শরীক না হয়, তবে আমাদের মতে এটা সঠিক ইসলামী যিন্দেগী নয়। এ ধরনের যিন্দেগীকে আমরা অন্তত অর্ধ জাহিলী যিন্দেগী মনে করি। আমাদের জানা মতে ইসলামের মিনিমাম দাবী হলো, কোনো ব্যক্তি যদি তার আশেপাশে এমন কোনো জামায়াতের অস্তিত্ব না দেখে, যে জামায়াত ইসালামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামী পন্থার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে তার উচিত এমন একটি জামায়াত প্রতিষ্ঠার জন্যে হক ও খালিস দিলে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আর যখনই এ ধরনের কোনো জামায়াত তার নযরে পড়বে, সংগে সংগে নিজ আমিত্ব ত্যাগ করে সঠিক সাংগঠনিক মনমানসিকতা নিয়ে সে দলে শামিল হবার জন্য প্রস্তুত থাকা। তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল উলা ১৩৬৫ হিঃ, এপ্রিল ১৯৪৬ ইং। (রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ ১ খন্ড)।

ইসলামী আন্দোলন করে লাভ কি?

প্রশ্ন ঃ বাহ্য দৃষ্টিতে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়না, তবে আর ইসলামী আন্দোলন করে লাভ কি?

জবাব ঃ মুসলমানের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে দায়িত্ব পালন করে যাওয়াটাই তার জন্যে সফলতা। ইসলামকে বিজয়ী করে দিতে হবে এটা তার দায়িত্ব নয়। তার দায়িত্ব হলো এজন্যে আপ্রাণ চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আপ্রাণ চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অবশ্যি লাভ করবে। আর এটাইতো প্রকৃত বিজয় ও সাফল্য। প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার হাতে ইসলাম বিজয়ী না হয়, তবে এর জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়না বলে ঘরে বসে পড়া সম্পূর্ণ কাপুরুষতা এবং ঈমানের দাবির খেলাফ।

যেকোনো মূল্যে ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে, এমন দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রসূলুল্লাহর সা. প্রতিও অর্পণ করেননি। বরঞ্চ বার বার তাঁকে বলেছেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালন করাটাই আপনার দায়িত্ব। বলা হয়েছে 'বাল্লিগ' তুমি পৌঁছে দাও। তারা যদি না মানে, তবে তাতে তোমার কোনো দোষ নেই। 'ওয়ামা আলাইকা আন্‌লা ইয়ায্‌যাক্‌কা' - তারা পরিশুদ্ধ না হলে, তাতে তোমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব - ১ খন্ড)

ইসলাম ও রাজনীতি

প্রশ্ন ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে চলেছে। সাথে সাথে আমাদের সকল তৎপরতাও রাজনৈতিক হয়ে যাচ্ছে। কোনো সময় এমন মনে হয়, যেনো আমরা আমাদের মূল দাওয়াত থেকে দূরে সরে গেছি। আমাদের এ অনুভূতি কি ঠিক? যদি না হয়, তবে আমাদের মনের শান্তির জন্য কি করা উচিত?

জবাব ঃ এ প্রশ্নের জবাব হলো, আপনি আপনার মূল দাওয়াতকে বুঝার চেষ্টা করুন। রাজনৈতিক রূপ লাভ করার এক অর্থ এই হতে পারে যে, মানুষ তার দীন ও ঈমান ছেড়ে দিয়ে সকল বৈধ ও অবৈধ পন্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভে উদ্যোগী হয়ে উঠে। আল্লাহ না করুন, আপনার মধ্যে এ অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তওবা করুন। জামায়তে ইসলামী ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকুন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চিন্তা নিজের অন্তর থেকে বাদ দিন। কিন্তু যদি রাজনীতি দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য

এই হয় যে, এদেশে ইসলামী বিধান প্রচলিত হোক, তবে এটাই জামায়াতের দাওয়াত এবং তার মূল উদ্দেশ্য।

আপনি যদি সত্যি সত্যি নিজের জন্য নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা করে থাকেন, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং এই বিকৃত চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। কিন্তু আপনার দৃষ্টিভংগি যদি এমন হয় যে, সৎ লোকদের নেতৃত্বের আসনে বসাবেন এবং এ দেশে একটি আদর্শ সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালাবেন, তবে এটাই প্রকৃত দীনের কাজ। আবার আপনার মধ্যে যদি এ কাজে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাহলে এর সঠিক কারণ চিহ্নিত করা দরকার। আপনি যেখানেই অবস্থান করুন, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী হোন কিংবা মানুষের সংস্পর্শে আসুন, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হবেননা। নিয়মিতভাবে নামায আদায় করুন। কুরআন যতোটুকু পড়তে পারেন, নিয়মিত পড়তে থাকুন। কিন্তু একথা বুঝে নিন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা এবং ঘরে বসে থাকার অবস্থা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের লক্ষ্য হয় বিরোধিদল যেনো বিজয়ী হতে না পারে। এ অবস্থায় তারা তাদের পুরো শক্তি শত্রুকে পরাজিত করতে ব্যয় করে। তেমনিভাবে ঘরে বসে যিক্‌র ও চিন্তা-গবেষণা যতোটা নিয়মিতভাবে করা সম্ভভ হয়, তা যুদ্ধক্ষেত্রে সম্ভব হয়না।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা খেয়াল রাখাবেন, কোনো কোনো সময় মানুষ দেখতে পায়, আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে দূরে সরে আছেন। এতে তার নফস ধোঁকায় পড়ে যায়। এটা একটা শয়তানি কুমন্ত্রণা। এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। আর যদি আপনার প্রচেষ্টায় কোনো সফলতা অর্জিত হয়, তবে মনে রাখবেন এতে আপনার চেষ্টা-সাধনার কৃতিত্বের চাইতে আল্লাহর অনুগ্রহের অবদান অনেক বেশি। এ সফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে মাথা নতো করুন ও তাঁর শোকর আদায় করুন। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব : ২য় খন্ড)

●

১৫

নৈতিকতা

নফ্স ও শয়তান

প্রশ্ন ঃ শয়তান বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এটা কি মানুষের নফ্স, নাকি কোনো বহিঃশক্তি যা মানুষের প্ররোচিত করে?

জবাব ঃ শয়তান নিঃসন্দেহে একটি বহিঃশক্তি, যে মানুষের নফ্সের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তাকে প্ররোচিত করে এবং বিপথে পরিচালিত করে। অবশ্য মানুষের নফ্স শয়তান থেকে কম নয়।

কবীরা এবং সগীরা গুনাহ্

প্রশ্ন ঃ কবীরা এবং সগীরা গুনাহর পরিচয় কি?

জবাব ঃ সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নিন যে, কবীরা হচ্ছে সেই গুনাহ্, কুরআন সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যেগুলোর কোনোটির দায়ে কেউ অপরাধি হলে দুনিয়াতে তার শাস্তি বিধানের নির্দেশ রয়েছে, কিংবা পরকালে শাস্তি প্রদানের দুঃসংবাদ শুনানো হয়েছে। অবশিষ্ট সকল নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজই সগীরা গুনাহের সংজ্ঞায় পড়ে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

শাস্তি ও পুরস্কার

প্রশ্ন ঃ কোনো জাতিকে তার অপরাধের শাস্তি সামষ্টিকভাবে দেয়া হবে? নাকি প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথকভাবে হিসাব হবে?

জবাব ঃ জী হ্যাঁ। পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে পৃথক পৃথক ফায়সালা হবে এবং তাকে তার নিজস্ব আমলের ভিত্তিতে পুরস্কৃত কিংবা দন্ডিত করা হবে। পৃথিবীতে যতো জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল রয়েছে, সেগুলোর কার্যকারিতা পৃথিবীর ব্যবস্থা পরিচালনা পর্যন্তই সীমিত। পরকালে সকল জোটবদ্ধতা খতম হয়ে যাবে এবং সেখানে মানুষ কেবল দু'টি দলে বিভক্ত হবে। একটি হবে হকপন্থীদের দল আর অপরটি বাতিলপন্থীদের। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে হকপন্থীদের বেছে বেছে পৃথক করা হবে।

ঠিক নয়। পৃথিবীতে কো... ... শাস্তি কিংবা পুরস্কার যথাযথভাবে প্রদান করা কোনো ... ...ব নয়। একটি উদাহরণ থেকে কথাটি বুঝে নিন। যেমন, এক ব্যক্তি কোনো জাতির বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলো এবং সেই যুদ্ধে নিহত হলো লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ। এখন এই আসল অপরাধিকে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে - এর চাইতে অধিক কোনো শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা এখানে নেই। কিন্তু সেই দন্ড ঐ লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের জীবনের বিনিময় তো হতে পারেনা। তার শাস্তিতো তার অপরাধ অনুযায়ী হওয়া উচিত। আপনারা দেখেছেন, অনেক সময় বড় বড় অপরাধি এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরও পৃথিবীতে কোনো শাস্তি হয়না। খাটের উপর শোয়া অবস্থায় আরামের সাথে তার মৃত্যু হয়ে যায়। যেমন, রাশিয়ায় স্ট্যালিন লক্ষ লক্ষ কৃষককে হত্যা করেছে এবং এর কোনো শাস্তি সে পৃথিবীতে ভোগ করেনি। হিটলার অজার্মান জাতিসমূহের উপর চরম যুলুমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে অজ্ঞাত মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলার ইনসাফের দাবি হচ্ছে এইযে, এসব অপরাধিকে তাদের অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে। কিন্তু সে শাস্তি কেবল আখিরাতেই প্রদান করা সম্ভব, পৃথিবীতে সে ব্যবস্থা নেই।

একইভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নবী করীমের সা. বদৌলতে এই পৃথিবীতে কতো সীমাহীন নেকী ও কল্যাণ প্রসার লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রসার লাভ করতে থাকবে। তিনি এই মহান সৎকর্মের পুরস্কার পৃথিবীতে পেয়েছেন কি? নিঃসন্দেহে এই পুরস্কার ভোগ করার জন্যে প্রয়োজন একটি চিরন্তন জীবনের। যেখানে তিনি তাঁর রবের পুরস্কারসমূহ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবেন এবং তার নিয়ামতসমূহের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন, যা তাকে এই পৃথিবীতে সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে চরম কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহতা'আলা প্রদান করবেন। নিঃসন্দেহে পরকাল অনুষ্ঠিত হওয়া ব্যতিত সেই সুযোগ আসা সম্ভব নয়। সকল মানুষের ব্যাপারে এই একই কথা প্রযোজ্য। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

দোযখের শাস্তির অনুভূতি

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি দোযখে যাবে তার তো ধীরে ধীরে সেখানকার পরিবেশ

বেশি হবার অনুভূতি তো ... নয়।

জবাব ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ... ক্ষম নন যে, তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইবেন অথচ তা দেয়া সম্বব হবেনা। দোযখে অপরাধিদের শাস্তির পরিকল্পনাই সেভাবে করা হবে যে, সেখানে তারা কেবল শাস্তিই ভোগ করবে। আপনারা কুরআনে দেখেছেন যে, দোযখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ হবে এবং সেখানকার অগ্নিশিখা আকাশের সাথে কথা বলবে। এগুলো তো কেবল দোযখের শাস্তির ধারণা দেবার জন্যেই বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, শাস্তির ধরন কেবল এতোটুকুই হবে। প্রকৃতপক্ষে দোযখে পাপিষ্ঠদের যে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে পৃথিবীরে মানুষের পক্ষে তা কল্পনা করাই সম্ভব নয়।

বেহেশতের ব্যাপারে একই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, লোকেরা ওখানে থাকতে থাকতে সেখানকার পরিবেশ তাদের কাছে একঘেঁয়ে হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানকার সুখের অনুভবই আর তাদের থাকবেনা। কিন্তু এসবই ভ্রান্ত ধারণা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কুদরাত না শাস্তি দেবার ব্যাপারে সীমিত আর না নিয়ামত উপভোগ করানোর ব্যাপারে সীমিত। বেহেশতবাসীদের তিনি এমনসব সুযোগ সুবিধা দেবেন যে, প্রতিটি মুহূর্তেই তারা একটি নতুন স্বাদ এবং সুখ অনুভব করবে।[১] (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)

সুদখোর এবং ঘুষখোরের ঘরে খানা খাওয়া

প্রশ্ন ঃ সুদখোর এবং ঘুষখোরের ঘরে খানা খাওয়া যেতে পারে কি?

জবাব ঃ যারা ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তারা এই ধরনের লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য। তারা যদি এদের সাথে মেলামেশা না করেন, তবে কেমন করে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবেন? ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া লোকদের জন্যেই তো ইসলামের দাওয়াত। আপনারা যদি এসব বিপথগামী লোকদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাকেন, তবে তাদের নিকট দীনের দাওয়াত কিভাবে পৌঁছানো যাবে? সাক্ষাতের সময় কোনো সুদখোর বা ঘুষখোর যদি আপনার সামনে চা হাজির করে, তবে আপনি তা গ্রহণ করতে কিভাবে অস্বীকার করবেন? সাধারণ অবস্থায় এসব লোকদের খাবার গ্রহণ করা থেকে অবশ্যই বিরত

১. এশিয়া লাহোর, ১৮ জুলাই ১৯৬৯ ইং।

থাকা উচিত। কিন্তু যতোদিন আপনি তাকে দীনের পথে আনার প্রচেষ্টায় রত থাকবেন ততোদিন এধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে তার ওখানে পানাহার করতে অস্বীকার করা উচিত নয়।[১] (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

কি পরিমাণ খরচ করতে হবে?

প্রশ্ন ঃ "হে নবী তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তারা কি ব্যয় করবে? তাদের বলো তাই ব্যয় করবে যা উদ্বৃত্ত থাকে।" কেউ কেউ কুরআনের এই আয়াতকে রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা জাতীয়করণের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করে। তারা বলে, যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত (Surplus) সেটা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রদান করা উচিত। তাদের এই যুক্তি কতোটা সঠিক?

জবাব ঃ কিছু কিছু লোক বাইরের মতবাদ গ্রহণ করে সেটাকে চালু করার জন্যে কুরআন থেকে সেটার পক্ষে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করে। তারা তাদের গৃহীত মতবাদের পক্ষে কুরআনের স্বীকৃতি অন্বেষণ করে। তাদের এই ধরনের আচরণের একটি উদাহরণ হচ্ছে, আপনার উদ্ধৃত আয়াতটি। প্রশ্ন হলো, যা কিছু উদ্ধৃত্ত থাকবে তা জাতীয় মালিকানায় প্রদান করার কথা এ আয়াত থেকে কেমন করে বের করা যায়? অথচ এ আয়াত এর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তি মালিকানার কথাই প্রমাণ করে। কারণ ব্যক্তি মালিকানাই যদি অস্বীকার করা হলো, তবে "কি পরিমাণ ব্যয় করবে?" কথাটির কোনো অর্থই হয়না। ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ থাকলেইতো এ প্রশ্নের সৃষ্টি হবে, সে কি পরিমাণ ব্যয় করবে?

দেখুন, ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি জিনিস খরচ করবে তা সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ব্যক্তির উপরই ছেড়ে দেয়া হবে। প্রয়োজন কোনো নির্দিষ্ট জিনিস নয়। একটি ইসলামী সমাজে ব্যক্তিই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তার প্রকৃত প্রয়োজন কি? ইসলাম মানুষকে এই পৃথিবীতে তার আমলনামা সংকলনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। এজন্যে সে কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তিকে এ ক্ষমতা প্রদান করেনি যে, ব্যক্তি কি ব্যয় করবে তা নির্ধারণ করে দেবে। কিংবা এ ক্ষমতাও প্রদান করেনি যে, ব্যক্তির প্রকৃত প্রয়োজন কি তা ফায়সালা করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, নির্দেশ প্রদান করা হয়নি। বরঞ্চ যারা ব্যয় করার জযবা রাখেন তাদেরকে একটি হিদায়াত দান করা হয়েছে। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

দান এবং আত্মসম্মান

প্রশ্ন ঃ যাকাত, সদাকা এবং দান সম্পর্কে একটা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়।

---

১. এশিয়া লাহোর, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৬ ইং।

তা হলো এ গুলোর অর্থ যারা গ্রহণ করে তাদের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। দীনি এবং নৈতিক দিক থেকে সমাজ যতোই উন্নত হোকনা কেন তারপরও দান সদাকা গ্রহণকারীদের অনুভূতির মধ্যে দুর্বলতা থেকেই যাবে। আরো বলা হয়, দান সদাকা সভ্য ও বিবেকবান মানব সমাজের জন্যে আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হতে পারেনা।

জবাব ঃ তা হলে আপনার দৃষ্টিতে কি সেটাই কি আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যাতে কেউ কারো উপকারে আসবেনা? না কি আপনি ঐটাকেই আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মনে করেন, যাতে মানুষকে কলকজার মতো ব্যবহার করা হয়? তাদের যাবতীয় প্রয়োজনও কলকজার মতোই পূরণ করা হয় এবং মানুষ মানুষের উপকারে আসার সকল দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়? অর্থাৎ মানুষের জন্যে মানুষের কোনো গুরুত্বই থাকেনা? হয়তো কেউ এটাকে আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মনে করতে পারে। অথচ এ হচ্ছে একটা মানবতা বিধ্বংসী ব্যবস্থা। এখানে মানুষের প্রতি মানুষের কোনো আকর্ষণ এবং সহানুভূতিই থাকেনা। এখানে মানুষ থেকে মানবতা শেষ হতে থাকে এবং তদস্থলে মেশিনধর্মীতা প্রবেশ করতে থাকে। এরূপ রাষ্ট্র মানবত্বকে এভাবে ধব্বংস করার অশুভ পরিণতি তখন স্বচক্ষে দেখতে পায়, যখন রাষ্ট্রের এই মেশিনারি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জাতির ঘাড়ে কোনো সাধারণ বিপদ চেপে বসে।

যেকোনো মানব সমাজে যেকোনো সময়ে এধরনের বিপদ আসতে পারে। মানুষ অনাহারে মরতে থাকতে পারে এবং রাষ্ট্রের হাতে রেশন পৌঁছাবার কোনো ব্যবস্থা না থাকতে পারে। কিংবা কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনায় ব্যাপকভাবে মানুষ আহত হলো বা চরম দুর্ভোগে নিমজ্জিত হলো এবং তাদের জন্যে কোনো রিলিফ কাজ করা সরকারের জন্যে সম্ভব হলোনা। তখন অবশ্যি একজন মানুষ আরেক জন মানুষের উপকারে এগিয়ে আসা জরুরি হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, তখন কি বিপদগ্রস্ত লোকদের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়না? নিসন্দেহে মানুষ এ ধরনের প্রয়োজন থেকে কখনো মুখাপেক্ষিহীন হতে পারেনা। কিন্তু আপনি যদি বছরের পর বছর সমাজের লোকদের এই শিক্ষা দিতে থাকেন যে, মানুষ মানুষের উপকারে আসাটা একটা মন্দ কাজ এবং এতে মানুষের আত্মসম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তবে এ ধরনের কোনো বিপদকালে আপনি তাদের থেকে শিক্ষার বিপরিত কোনো কাজ কেমন করে আশা করতে পারেন?

আজকাল কিছু লোক বলে বেড়ায় ঃ "আরে এটা একটা সমাজ হলো নাকি, যেখানে কিছু লোক খয়রাত দেয় আর কিছু লোক খয়রাত নেয়?" এ কথার

অর্থ হলো, এমনটি করা যেনো বিরাট অন্যায় কাজ। অথচ কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে যদি মানুষের অন্তরে একাজ সম্পর্কে এতোটা খারাপ ধারণা বসিয়ে দেন তবে যখন কোনো সর্বগ্রাসী বিপদ আসবে তখন মানুষের মধ্যে এমন কোনো চরিত্রই থাকবেনা যার ভিত্তিতে একে অপরের উপকারে আসতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময় অপরের সাহায্য করা যে একটা নেক কাজ গোড়া থেকেই এ ধরনের কোনো শিক্ষা মানুষের দেয়া হয়নি। সেকারণে একজন লোক স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করবে, যেহেতু আমার রেশনের উদ্বৃত্ত রুটি আমার নিকট রয়েছে সুতরাং সেটা কেবল আমারই। কেউ যদি না খেয়ে মরতে থাকে তবে তার নিকট রেশন পৌঁছানোর দায়িত্ব সরকারের। আমি কেনো তার ব্যাপারে চিন্তা করবো?

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পৃথিবীতে মেশিনের মানুষ বানানোর চেষ্টা করার চাইতে বড় কোনো বোকামি হতে পারেনা। আর যারা এরূপ কথাবার্তা বলছে তারা মানবতাকে বুঝার চেষ্টা করেনি। তারা মানুষকে মানুষ মনে করে কথা বলেনা, বরঞ্চ এটাকে ভেড়ার পালের জন্যে খাদ্যের যোগান দেয়া মনে করে।

একজন লোক যখন আরেকজন লোককে সাহায্য করে তখন সাহায্য গ্রহণকারী এতে নিজেকে কিছুটা হালকা বোধ করে। এ জিনিসটাকেই হাদীসে বলা হয়েছে, 'গ্রহণকারী হাতের চাইতে দানকারী হাত উত্তম।' তাই একজন লোকের উচিত ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি দান গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন যতোক্ষণনা তিনি একান্ত বাধ্য হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়ত, কিছু দান পেয়ে তিনি সরে যাবেননা, বরঞ্চ তিনি তৎপর হয়ে উঠবেন এবং নিজেকে এতোটা যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন যাতে করে যেভাবে তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন সেভাবে দান করতেও পারেন। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব - ১ম খন্ড)।

সৎ পিতামাতার সংগে সন্তানরাও কি জান্নাতে যাবে?

প্রশ্ন ঃ পরকালে বাপ মা যদি জান্নাতের অধিকারি হন, তাহলে তাদের সন্তানরাও কি জান্নাতে তাদের সংগি হবে? তাদের সন্তানরা যদি মুশরিক এবং বিদআতপন্থী হয় - তবু? বর্তমানে এমন অসংখ্য মুসলমান পরিবার আছে, যেখানে বাপ মা এবং সন্তানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাগত মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

জবাব ঃ জান্নাত তো সেসব লোকদের জন্যে, যারা এক আল্লাহ এবং তার রসূলদের স্বীকার করেন এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ প্রদত্ত

শরীয়তকে কার্যকর করেন। সুতরাং নেক বাপ মার সাথে তাদের ঐসব সন্তানরাই জান্নাতে যাবে, যারা হয়তো নাবালেগ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে কিংবা বালেগ হবার পর সিরাতুল মুস্তাকীম অবলম্বন করেছে এবং এর উপর অটল অবিচল থেকে ওফাত লাভ করেছে।

কুরআনে করীম থেকে একথা জানা যায় যে, পিতা মাতা যদি জান্নাতে উঁচু দরজা লাভ করনে, তবে তাদের যেসব সন্তান জান্নাতে নিম্ন দরজা লাভ করবে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানীতে পিতামাতার সাথে উঁচু দরজায় একত্র করে দিবেন। কিন্তু কোনো দোযখবাসীকে বেহেশতবাসীর খাতিরে বেহেশতে প্রবেশ করানোর সম্ভাবনা নেই। (যুগ জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ১ম খন্ড)।

সমাপ্ত